॥ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ॥

মেদিনীপুর

তরুণদেব ভট্টাচার্য



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * * ১৯৭৯

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড,
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯, কলিকাতা

মূল্য : ৩০.০০ টাকা

মুদ্রক :
প্রিন্ট উইং,
২০৯ সি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার চিন্তা চেতনা
ও অস্তিত্বের উৎস
আমার সবচেয়ে পরিচিত
নারী চরিত্র, মাকে—

॥ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন ও মেদিনীপুর ॥

॥ ১ ॥

পশ্চিমবাংলার পরিচয় ছড়িয়ে আছে গ্রামাঞ্চলে। মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশের বসবাস গ্রামে। বাইরে থেকে গ্রামগুলিকে শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে হয়। প্রকৃত অবস্থাও এ থেকে আলাদা নয়। তবু এরাই গড়ে তুলেছে বাংলার কাঠামো। এদের ওপর ভিত্তি করে রঙচঙে জৌলুসভরা সহরগুলি বিন্যস্ত।

কখনও রাজস্ব আদায়, কখনও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এই গ্রামাঞ্চল নানা সময়ে নানা রকম চৌহদ্দিতে বিভক্ত হয়েছে। এদের নামও ছিল এক এক সময় এক এক রকম। কখনও পরগণা, কখনও চাকলা, কখনও জেলা। জেলাই সর্বাধুনিক রূপ। জেলার ভেতরে যে সহর নেই তা নয়, তবে শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে, বেশীরভাগ সহরের চেহারা গ্রামেরই ঐশ্বর্যশালী ও সংস্কৃত রূপ। পশ্চিমবাংলায় এখন জেলার সংখ্যা পনেরটি। এ ছাড়া প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য কলকাতাকেও একটি জেলা বলে ধরা হয়।

স্বাধীনতার সময় যখন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়, জেলা সীমানারও অদলবদল হয় অনেক। পরবর্তীকালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আমলেও জেলা চৌহদ্দির রকমফের হয়েছিল। জেলাগুলির সামগ্রিক পরিচয় সহ বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত কোন গ্রন্থমালা রচিত হয়নি। ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু কিছু জেলায় যা হয়েছে, তা প্রধানত রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস। 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন' গ্রন্থমালা এদিক থেকে প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

পলাশী যুদ্ধের আট বছর পরে ইংরেজরা দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভ করেছিল। দেওয়ানী যেমন নতুন ছিল, এর মূল ভূখণ্ড, নদনদী, বন, ঐশ্বর্য ও অভাব, জনজীবন ও জনচরিত্র কোন কিছুই তাদের কাছে তেমন পরিচিত ছিল না। অথচ নতুন পাওয়া রাজ্য ভালভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলে এসব তথ্য খুবই দরকারী। ফলে সুরু হল খুঁটিনাটি বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ। এ ধরনের তথ্য সম্বলিত প্রথম গ্রন্থমালা ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টারের 'এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট অব বেঙ্গল'। রচিত হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে।

কুড়িটি খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থমালার মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের যথাযথ

উৎসগুলি খুঁজে বের করা এবং কিভাবে তা বাড়ান যায় তার উপায় নির্ধারণ। খুঁজতে গিয়ে বাংলা সুবার মোটামুটি হদিস ও বসবাসকারী মানুষদের কিছুটা পরিচয়ও এদের ভেতর এসে পড়েছে। পরবর্তীকালে এল. এস. এস. ও'ম্যালী, কাপল্যাণ্ড, গ্যারেট প্রমুখ রাজকর্মচারীরা জেলা গেজেটীয়ার রচনা করেছেন। এতে তথ্য আরো বিস্তৃত হলেও, জেলাগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুপস্থিত। তাছাড়া প্রায় সমস্ত কিছুই শাসকের চোখ দিয়ে দেখা। এই গেজেটীয়ারগুলি বিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিকে রচিত। ফলে বিশ শতকের তিনদশক ও পরে দেশবিভাগ ও তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বাংলার বুকের ওপর দিয়ে যে বিপুল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতার পরে প্রথম সেনসাস বা জনগণণা অনুষ্ঠিত হয় উনিশ শো একান্ন সালে। এই সেনসাসের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ভিত্তিক যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তৎকালীন সেনসাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস. তাদেব নাম দেন জেলা হ্যাণ্ডবুক। হ্যাণ্ডবুকগুলি মূলত প্রশাসকদের জেলা বিষয়ে নির্দেশিকা। উনিশ শো একষট্টি সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রচিত জেলা সেনসাস হ্যাণ্ডবুকও তাই। পরিসংখ্যানে সংগৃহীত নতুন তথ্য সন্নিবেশ ছাড়া বইগুলি গেজেটীয়ারেরই পুনর্মুদ্রণ বলা চলে। এদিক থেকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. জেলা গেজেটীয়ারের সম্পাদনা করেছিলেন। তবে সবগুলি জেলা গেজেটীয়ার তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়নি। তাছাডা গ্রন্থগুলি ইংরাজী ভাষায় রচিত ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন-ধর্মী তথ্যে ভারাক্রান্ত। দামের দিক থেকেও সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

অথচ পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের ভেতর বাংলার গ্রাম ও সেই সাথে জেলা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বাংলার মানুষের ধর্ম, লোকাচার, গৌরব-অগৌরব—এক কথায় বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিপূর্ণ পরিচয় ও চরিত্র বিধৃত হয়ে আছে গ্রামগুলি তথা জেলাগুলির ভেতর। এদের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় না পেলে পশ্চিমবাংলার পরিচয়ই অজানা থেকে যায়। এই অভাব পূরণ করতে ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড ও তার অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বিদগ্ধ এই মানুষটির বুদ্ধি ও চিন্তা যেমন স্বচ্ছ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণাও তেমনি

সুস্পষ্ট। অভাবটি তিনি যথাযথভাবে নির্ণয় করেছেন ও তা মেটাতে উদ্যোগ নিয়েছেন।

কিন্তু যে অপাত্রে এই গুরু-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় সীমিত। সম্বলের ভেতর শুধু নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কঠিন পরিশ্রম করার সংকল্প। জীবিকার তাগিদ ও ঘোরার নেশা তাকে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলার সাথে পরিচিত করেছে। এ পরিচয় গত পনের বছর ধরে চলে আসছে। নানা উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহ তখন থেকেই স্বরু হয়েছিল। বিক্ষিপ্তভাবে যেসব তথ্য ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল ও বিধৃত ছিল নানা বই ও পত্র পত্রিকায় তাদেরই একসাথে গেঁথে এই গ্রন্থমালায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু তথ্য যা এখনও কোন বইপত্রে ঠাঁই পায়নি, নানা দিক দিয়ে যাচাই করে তাদেরও ঠাঁই দেয়া হয়েছে। কেজো তথ্য ও সংবাদ যাতে সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটায় অথচ দরকারে হাতের কাছে পাওয়া যায়, সেজন্য পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে।

জনসম্পদই দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অতীত ও বর্তমান, সমৃদ্ধি ও অবক্ষয় এবং রূপান্তরের যে ধারাটি গোচরে ও অগোচরে প্রবহমান, তাকে ধরে রাখতে যথাসম্ভব নজর দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থমালা থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থমালা যদি রাজস্ব-ভিত্তিক হয়, এটি জন-ভিত্তিক।

একালের অগ্রগণ্য কবি শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থমালার নামকরণ করেছেন 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন'। নামটিতে আপাদ বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' ছোঁয়া থাকায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। শক্তিদাকে এজন্য ধন্যবাদ।

॥ ২ ॥

পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলা মেদিনীপুর। বাংলার পশ্চিম দুয়ার। আয়তন ও লোকসংখ্যায় রাজ্যের ভেতর দ্বিতীয় বৃহত্তম। পশ্চিমবাংলার একমাত্র এই জেলাটির মধ্যেই পাহাড় ও সমুদ্র একত্র সন্নিবেশিত। নানা দিক থেকে জেলাটি বিশিষ্টও। বাংলার সবচেয়ে পুরনো রাজ্য এই জেলার ভেতরেই অবস্থিত ছিল। সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে যত দিগ্বিজয় ও সামরিক অভিযান বাংলার দিকে পরিচালিত হয়েছে তাদের চোট বেশী করে পড়েছে এখানে। ফলে এখানকার জনবসতি নানা জাতি ও গোষ্ঠীর

সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই সমন্বয়ের প্রভাব এ জেলার সাংস্কৃতিক জীবনও প্রভাবান্বিত করেছে। হুগলী ও হাওড়া ঘেঁষে যে অঞ্চল সেখানে রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রভাব সব থেকে বেশী করে ছাপ ফেলেছে। বাড়ি তৈরির ছাঁদ থেকে সুরু করে প্রতিদিনকার জীবনের খুঁটিনাটি, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান সবই রাঢ় সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসারী। অধিবাসীদের পেশাও গঙ্গা ও তার শাখাপ্রশাখাবিধৌত অববাহিকার অধিবাসীদের থেকে আলাদা নয়। মাটিও পলিগঠিত, উর্বর ও কৃষিযোগ্য।

পশ্চিমের মাটি ও মানুষ পূর্বদিকের মাটি ও মানুষ থেকে একেবারেই আলাদা। জমি উঁচুনিচু, ঢেউখেলানো। মাটির রঙ লাল, প্রকৃতি শক্ত ও পাথুরে। তাতে কৃষির কাজ চলে না। মানুষও বেশীরভাগ আদিবাসী ও তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়। এ অঞ্চলের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ নাম দিয়েছেন 'নিষাদ সংস্কৃতি'। জীবন এখানে কঠিন, জীবিকা দুর্লভ। এক সময় অরণ্য ছিল এদের আশ্রয়, জীবিকা ও জীবন। ইংরেজরা সে অরণ্য এদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। পরিবর্তে পাওয়ার দিকটা ছিল শূন্য। সে ধারা এখনও অব্যাহত। ফলে দারিদ্র্য এদের জীবনে চেপে বসেছে। দিনে দিনে তার চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ানক। বর্ষার মরশুমে বা ধান কাটার সময় এদের এখন দল বেঁধে ছুটতে হয় পলিগঠিত সমতলভূমিতে। যাকে এরা বলে নামাল। দিনমজুরিই তখন একমাত্র লক্ষ্য। অথচ এক সময় এরাই ছিল সীমান্ত অঞ্চলের অতন্দ্র প্রহরী—সাহসী ও অহংকারী যোদ্ধা। সাহস ও বীরত্বের প্রাচীন রেশটুকু এখনও এদের কোন কোন সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে কোনমতে লেগে আছে। এই সব আচার অনুষ্ঠানের ভেতর বাঙ্গালীর পূর্ব-পুরুষদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের অনেক টুকিটাকি হদিস পাওয়া যায়।

এ জেলার উত্তর দিকে বাঁকুড়া। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বিষ্ণুপুর মহকুমা। বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের সুদীর্ঘ শাসন একসময় যে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, তার প্রভাব এদিকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঝাপসা স্মৃতির মত এখনও তার ছিঁটেফোঁটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে প্রভাব পড়েছে উড়িষ্যার। ভাষা, দৈনন্দিন জীবন, আচার অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। এক সময় প্রায় সমস্ত জেলাটিই ছিল উড়িষ্যার অন্তর্গত। এখানকার জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী ও ওড়িয়া এই দুই জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। দুই তরফই

কিছু কিছু হারিয়ে কিছু কিছু জড়িয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক বিন্যাস গড়ে তুলেছেন।

চারপাশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা ও উপধারার সংমিশ্রণে মধ্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভাগ্য গড়তে যেসব অসমসাহসী মানুষেরা হঠাৎ এখানে এসে পড়েছিলেন ও গুছিয়েগাছিয়ে রাজা বা জমিদার হয়ে বসে গিয়েছিলেন, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাছাকাছি অঞ্চলে তাদের প্রভাবও কম ছিল না। নৃতাত্ত্বিক বিভাগ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে জেলাটি তাই গবেষকদের কাছে রীতিমত চমকপ্রদ।

জেলাটি মূলত কৃষিপ্রধান। দারিদ্র্য এখানে গায়ের চামড়ার মত। অনাবৃষ্টি, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ আগে প্রায়ই এ জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যেত। দুর্ভোগের অন্ত থাকত না তখন। দুর্ভিক্ষ এখন প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু খরা ও বন্যা ফি বছরেই দেখা দেয়। শিল্পে অনগ্রসর এ জেলার নবরূপায়ণ হলদিয়ায়। আধুনিক শিল্প নগরী কলকাতার সহায়ক বন্দর। আরো কয়েকটি ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষত বিয়াল্লিশের আন্দোলনে এ জেলার ওপর দিয়ে যে তাণ্ডব বয়ে গিয়েছিল, তাতে বাংলা তথা ভারতেও এটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। নানা দিক থেকে জেলার সামগ্রিক চেহারাটি ফুটিয়ে তোলাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, স্বল্প পরিসরে তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি যথাসম্ভব উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। জেলার অধিবাসী ও সাধারণ পাঠকদের যদি এ গ্রন্থটি কাজে লাগে তবেই শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

॥ ৩ ॥

বইটি লেখা ও ছাপা হবার পর এক ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগ পশ্চিমবাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কলকাতা নিয়ে ষোলটি জেলার ভেতর বারোটি জেলাই দুর্যোগের আওতায় পড়েছিল। এ জেলাও বাদ যায়নি। বরং সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ও বিধ্বংসের কিছুটা পরিচয় না দিলে এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (ইং ১৭৭০ সাল) বাংলার তিনভাগের এক ভাগ

মানুষ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীর সে এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি। স্যার জন শোর স্বচক্ষে দেখেছিলেন সে মন্বন্তর। লিখেছিলেন :

In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, ámidst the glare of day
They riot unmolested on their prey ;

সাম্প্রতিক বন্যা ব্যাপকতার দিক থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাথে তুলনীয়। ক্ষয়ক্ষতি বেশী হলেও এতে জীবনহানি ঘটেছে অনেক কম। আঠারোশো ছিয়াশি সালে এ জেলায় যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তাতেও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি।

উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন মেদিনীপুরকে ভারতের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। আন্দোলনকে দমন করতে তখনকার ইংরেজ সরকার যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন, ইতিহাসে তেমন নজির মেলা শক্ত। অত্যাচারের ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই ভয়াবহ ঘূর্ণিবাত বয়ে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর। বাংলা তখন ভাগ হয়নি। মেদিনী-পুর, চব্বিশ পরগনা, বরিশাল ও পশ্চিম দিনাজপুরের, কিছু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ঘূর্ণবাতের আট মাস পরেই মেদিনীপুরে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। প্রাকৃতিক উপপ্লবের পরে দুর্ভিক্ষ ছিল তখন অনিবার্য ঘটনা। পরাধীন দেশে শাসকের কাছে শাসিতের জীবন ছিল মূল্যহীন। ঘটনাগুলি উল্লেখ করার প্রয়োজন এইজন্যেই যে এদের পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটনাটি মনে রাখলে জনসাধারণ ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেকখানি উপলব্ধি করা যাবে।

উনিশশো আটাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি সুরু হয় এ জেলার সবদিকে। নদীগুলি ফুলেফেঁপে ওঠে। বাঁকুড়ার মুকুট-মণিপুরে কংসাবতী নদীর জলাধার তখনই টইটুম্বুর। নদীর সংগ্রহ এলাকার জল হুড়হুড় করে এসে তারপরেও ঢুকতে থাকে। বাঁধ ভাঙো ভাঙো অবস্থা। ফলে বাঁধ রাখতে জল ছাড়তে হয়। শিলাবতী নদীর অবস্থা ছিল আরো খারাপ। দুই নদীরই খাত উপচে জল ক্ষেত ও গ্রামাঞ্চলে ঢুকতে সুরু করে। প্রথম দফায় বন্যা এইভাবেই সুরু হয়ে যায়। এর জের চলেছিল এক নাগাড়ে নয়দিন।

জেলায় মোট ব্লক বা উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা বাহান্নটি। তাদের ভেতর উনত্রিশটি বন্যার আওতায় পড়ে। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘাটাল, দাসপুর ১ ও ২, চন্দ্রকোণা ১ ও ২, ডেবরা, পিংলা, কেশপুর, খড়্গপুর ১ ও ২, মেদিনীপুর সদর, সবং ও ময়না ব্লক। মানভূমে প্রবল বৃষ্টির জন্য সুবর্ণরেখার তীরঘেঁষা ব্লকগুলিতেও বন্যার মৃদু প্রকোপ পড়ে।

উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ শেষ করে যখন পুনর্গঠনের কাজ নিয়ে সবাই চিন্তিত, সে সময় সেপ্টেম্বর মাসেরই শেষ দিকে আবার মুষলধাবে বৃষ্টি নামে। একই সাথে দামোদর, কংসাবতী, ময়ুরাক্ষী সব নদীগুলির জলাধার থেকে জল ছাড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। জেলার অধিকাংশ এলাকা মহা সমুদ্রের আকার ধারণ করে। প্লাবিত এলাকার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে চার হাজার বর্গ কিলোমিটারের ওপর।

যে সব এলাকা প্রথম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দ্বিতীয় দফায় সে সব ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর সদর থানার কিছু অংশ, ময়না, পাঁশকুড়া ও তমলুক ২নং উন্নয়ন সংস্থা। সব থেকে করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছিল দাসপুর ও ময়না থানার। দুটি এলাকাই নিচু। জল বেরিয়ে যাবার পথ ছিল না। ফলে মাসের পর মাস জমা জল পচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগ বাড়িঘর মাটির। মাটির মোটা দেওয়াল, ওপরে টালি, টিন বা খড়। পাকাবাড়ি বলতে দু'একটা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। দুই দফা বন্যায় পাকাবাড়ি ছাড়া কাঁচা বাড়িগুলির চিহ্নমাত্র ছিল না। জেলায় মোট বাড়ি বিধ্বংসের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষের ওপর। যেগুলি দুর্যোগের প্রকোপে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে সংখ্যাও এক লক্ষের বেশী। টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির পরিমাণ সাড়ে ছত্রিশ কোটির কাছাকাছি।

বাংলার লিখিত ইতিহাসে এতবড় বন্যার নজির খুঁজে পাওয়া যায়না। সারা জেলায় সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের জন্য উদ্ধার ও ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই উদ্ধার ও ত্রাণকাজে জেলার মানুষ যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিলেন, গৌরবের সাথে তা স্মরণ করার মত। সরকারের ভূমিকাও এদিক দিয়ে প্রশংসার দাবী রাখে।

ইংরেজ আমল হলে এতবড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে যে দুর্ভোগ অনিবার্য-ভাবে জনজীবনকে আরও পঙ্গু করে দিত তা মহামারী। সরকার অত্যন্ত

দক্ষতার সাথে সে পথ রুদ্ধ করেছেন। জেলায় মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে একশোর কাছাকাছি। গরু মোষ মরেছে সাড়ে তেইশ হাজারের মত। বিয়াল্লিশের ঘূর্ণিবাতে জীবনহানি ঘটেছিল সাড়ে চোদ্দ হাজার মানুষের। গরু মোষ মরেছিল একলক্ষ নব্বই হাজার।

আমন এ জেলার প্রধান ফসল। বন্যার ফলে আমন ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৩,১৭,৬৫৭, একর এলাকায়। এ নিয়ে অন্যান্য যে কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সব মিলিয়ে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ষাট কোটি টাকার মত। সময়টা ছিল আমন ধানের গর্ভবতী হবার সময়। প্লাবিত এলাকার সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এ ছাড়া রাস্তা, বাঁধ, স্লুইস গেট, সেচের পাম্প, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, হাসপাতাল, পানীয় জলের উৎস ইত্যাদির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে টাকার মূল্যে আনলে তা প্রায় পঞ্চাশ কোটির কাছাকাছি দাঁড়াবে। তবু জন শোর মন্বন্তরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, পশ্চিমবাংলার এতবড় বিপর্যয়ে সে অবস্থা দেখা দেয়নি।

সরকার ও জনসাধারণের সামনে এখন যে কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা করে আছে তা বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা নতুন করে গড়ে তোলার কাজ। রবি মরশুমে চাষের ব্যবস্থা করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব জমি বন্যার জলে টেনে আনা বালিতে কর্ষণের অযোগ্য হয়েছে তাদের কর্ষণযোগ্য করে তোলাও বড় সমস্যা।

দুর্যোগের মধ্যেই যেন বাঙালীর জীবনীশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এর প্রমাণ সাম্প্রতিককালে সে বহুবার হাজির করেছে। দেশভাগ, চীন ও পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে পশ্চিমবাংলার মানুষের ভূমিকা এত সহজে স্মৃতি থেকে মুছে যাবার নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই অতি সাম্প্রতিক আঘাতও সে অচিরেই কাটিয়ে উঠবে।

॥ ৪ ॥

এই গ্রন্থ রচনা ও রূপায়ণে যাঁরা নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের ভেতর প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা। প্রয়োজনীয় বইপত্র ছাড়াও, তিনি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এটি পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন। প্রশাসনিক কাজের নানা ঝামেলার ভেতর থেকেও তমলুকের অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীকল্যাণ কুমার বাগচী, আই. এ. এস. বইপত্র ও অনেক

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ ও মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের কাছেও ঋণ কম নয়। মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শ্রীআজাহারউদ্দিন খান বইপত্র দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ভেতর অধ্যাপক সত্যেন ষড়ংগী, অধ্যাপক প্রণব রায়, শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী ও শ্রীহরিসাধন চক্রবর্তী ও বন্ধুবর শ্রীমাণিক সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও তা মুদ্রণের কাজটি করেছেন ভ্রাতৃ-প্রতিম শ্রীতপন ধরচৌধুরী ও শ্রীবিক্রম লাহিড়ী। তাঁদের ও বন্ধুবর শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। লোডশেডিংয়ের অন্ধকার থেকে উঠিয়ে এনে বইটি যিনি জনসমক্ষে হাজির করেছেন, দীর্ঘদেহী সেই শ্রীপতি প্রসাদ ঘোষ মহাশয়কেও ধন্যবাদ।

এই পুস্তকে যে সমস্ত ছবি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ছবি এবং কলেজের অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর সাঁতরা মহাশয়ের 'Temples of Midnapur' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এজন্য ঋণ স্বীকার করে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। বিশেষত ফুট নোটে বইয়ের নাম, লেখকদের নাম ও তথ্যে। এ জন্যে ক্ষমা প্রার্থনীয়। ভ্রান্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জিতে বই ও লেখকদের যে নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে তাকেই সঠিক বলে ধরতে হবে। পাঁচ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে বছরে গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ মিলিমিটারের জায়গায় ৬৯'৪ ইঞ্চি পড়তে হবে। ষাট পৃষ্ঠার ৩নং ফুটনোটে বইটি হবে এল. এস. এস. ও'ম্যালির জেলা গেজেটিয়ার।

বাংলা ভাষায় রচিত এ ধরনের বই এই প্রথম। তথ্য, ঘটনা বা এমন কোন সংবাদ যদি বাদ পড়ে থাকে যা বইটির ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল বা কোন ভুলচুক যদি দৃষ্টিগোচর হয়, পাঠক সাধারণের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন প্রকাশক বা লেখকের ঠিকানায় তা জানিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতার সাথে তা সাদরে গৃহীত হবে।

তরুণদেব ভট্টাচার্য

মুর এভেনিউ হাউসিং এস্টেট
ব্লক-এল, ফ্ল্যাট-২
কলকাতা-৭০০০৪০।

হলদিয়ার ভবিষ্যত রূপরেখা

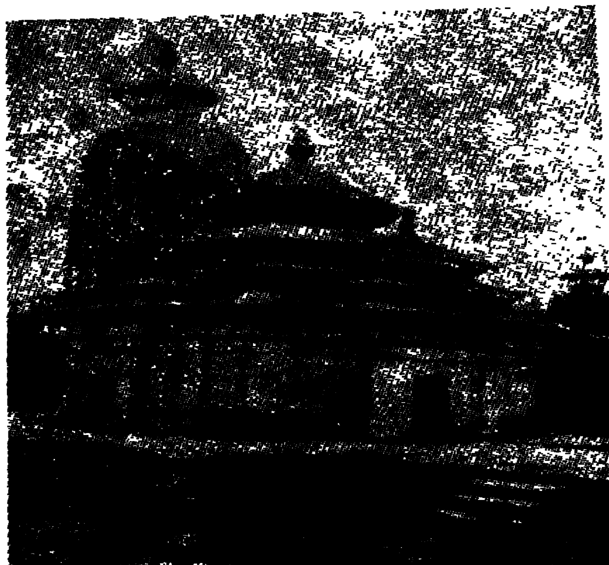
ইছাপুরে প্রাপ্ত সীল।
—তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও গবেষণা-
কেন্দ্রের সৌজন্যে।



লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাজবল্লভ, পিঙ্গলা



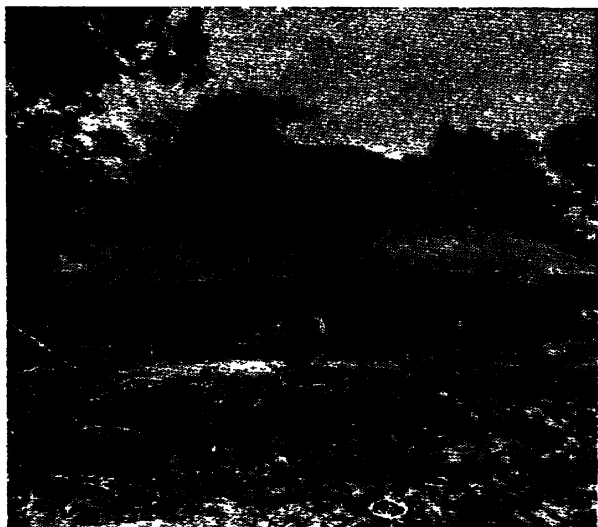
সাবিত্রী, ঝাড়গ্রাম।



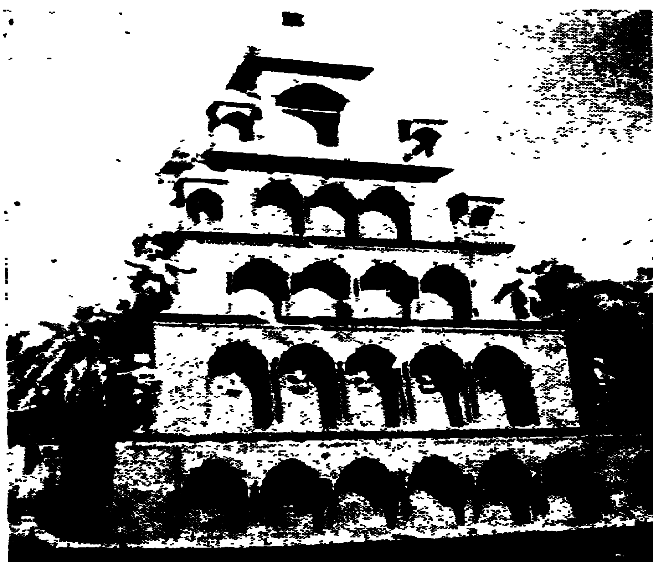
চপলেশ্বর, কর্ণগড় ।



বটেশ্বর ঝড়েশ্বর, কানাশোল, কেশপুর



চালাঘর।



দেব-রথ, রামগড়।



ঝুলন উৎসব।



রঘুনাথ, রামচন্দ্রপুর, ময়না।



তেরাকোট্টা ভাস্কর্য্য, রাধাকান্ত, কালীতলা।



জানকীবল্লভের তেরাকোট্টা ভাস্কর্য্য, তিলস্তপাড়া



রাধাগোবিন্দ, লোয়াদা, ডেবরা



বুড়া-শিব, পিঙ্গলা পূর্ব।



বড় আস্থালা, নয়াগঞ্জ, চন্দ্রকোণা।



শীতলা, দেপালশাসনভার, রামনগর।



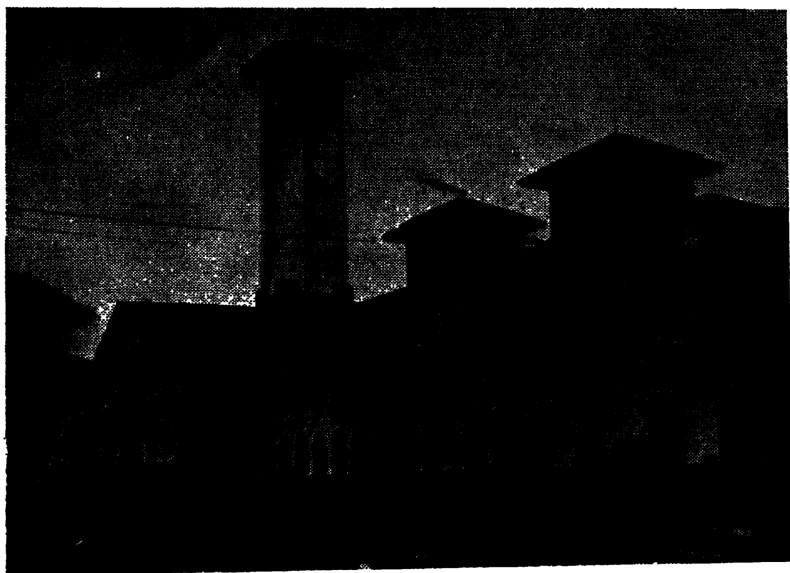
বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন, মেদিনীপুর।

আলোকচিত্র - গ্রন্থকার।

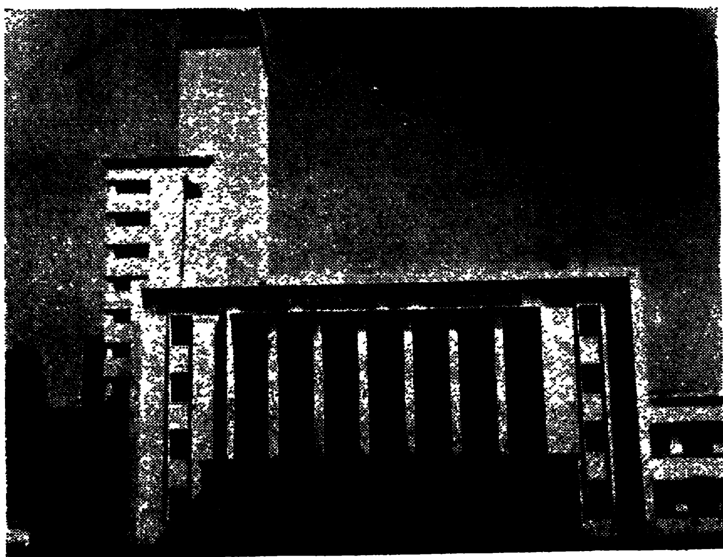


সড়ক যোগাযোগের মূলকেন্দ্র, মেদিনীপুর।

আলোকচিত্র—গ্রন্থকার।



একদা হিজলী বন্দীশিবির, বর্তমানে খড়্গপুর আই, আই, টির একাংশ
আলোকচিত্র—অশোকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।



ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়্গপুর।
আলোকচিত্র—গ্রন্থকার



মোষের শিংয়ের কাজ, বৈষ্ণবচক
আলোকচিত্র—গ্রন্থকার।



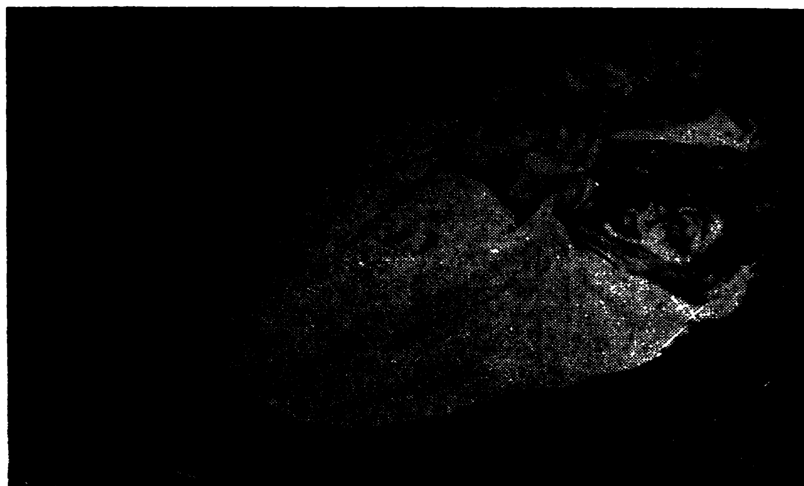
যক্ষিণী, সময় অনির্ণীত—তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও গবেষণা কেন্দ্রের সৌজন্যে।



অপ্সরা বা যক্ষিণী, শুঙ্গ-কুষাণযুগ। —তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও গবেষণা কেন্দ্রের সৌজন্যে।



বর্গভীমা, তমলুক



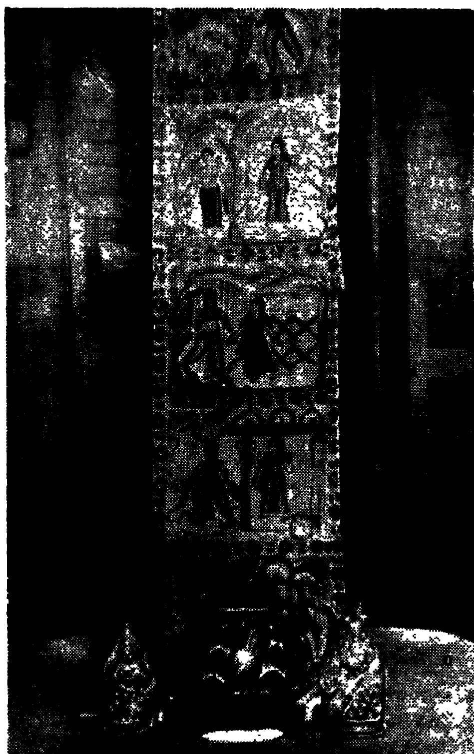
পুলিশের গুলিতে নিহত মাতঙ্গিনী হাজরা, তমলুক।



শীতলা, শ্রীরামপুর, ময়না

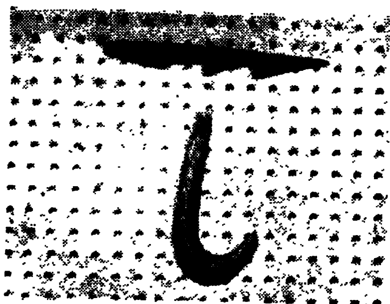


চড়ক উৎসব

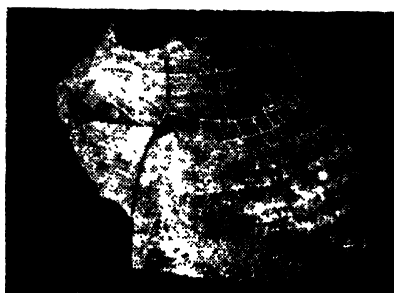


পটচিত্র, নাড়াজোল

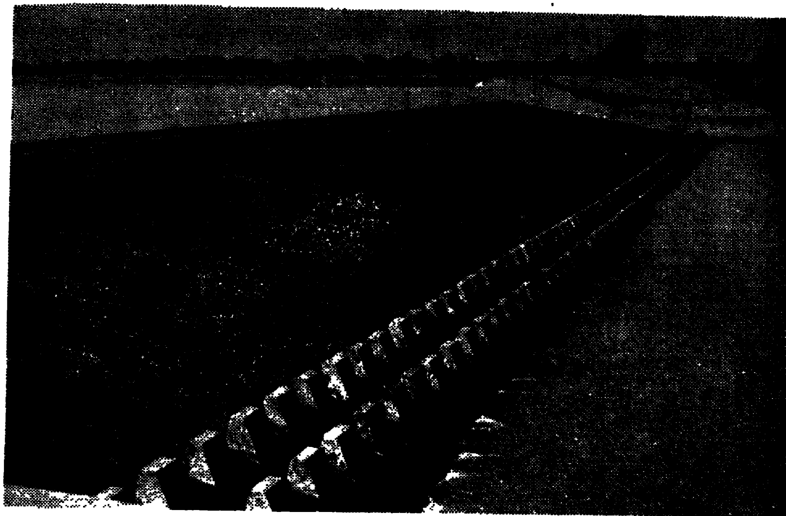
আলোকচিত্র—গ্রন্থকার।



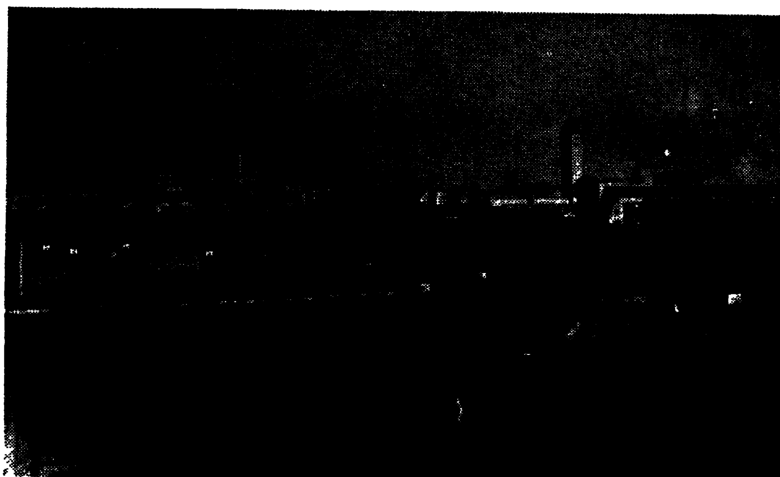
হাড়ের বড়শি ও হারপুন, ইতিহাস পূর্ব-যুগ।—তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও গবেষণা-কেন্দ্রের সৌজন্যে।



ইছাপুরে প্রাপ্ত মাটির পাত্র। গায়ে আঁকা গাছের মত নৌকা বা জাহাজের মাস্তুল।—তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও গবেষণা কেন্দ্রের সৌজন্যে।

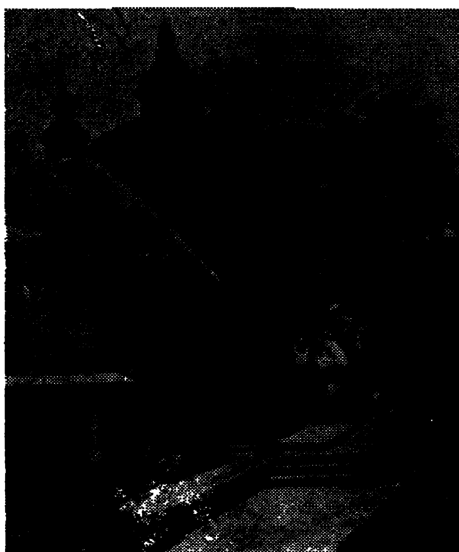


ডি. পি. এ. পি. প্রকল্পের অন্তর্গত জলাধার। ঝাড়গ্রাম মহাকুমা।



রূপায়ণের পথে হলদিয়া।

অালোকচিত্র—বরুণ বকসীর সৌজন্যে



বর্গভীমা, কাঞ্চনপুর, তমলুক।



পাইক বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল, কর্ণগড়। আলোকচিত্র—গ্রন্থকার



জানকিবল্লভী রাণীর হাতী।



অগ্নি পরীক্ষা।

মেদিনীপুর

জেলা

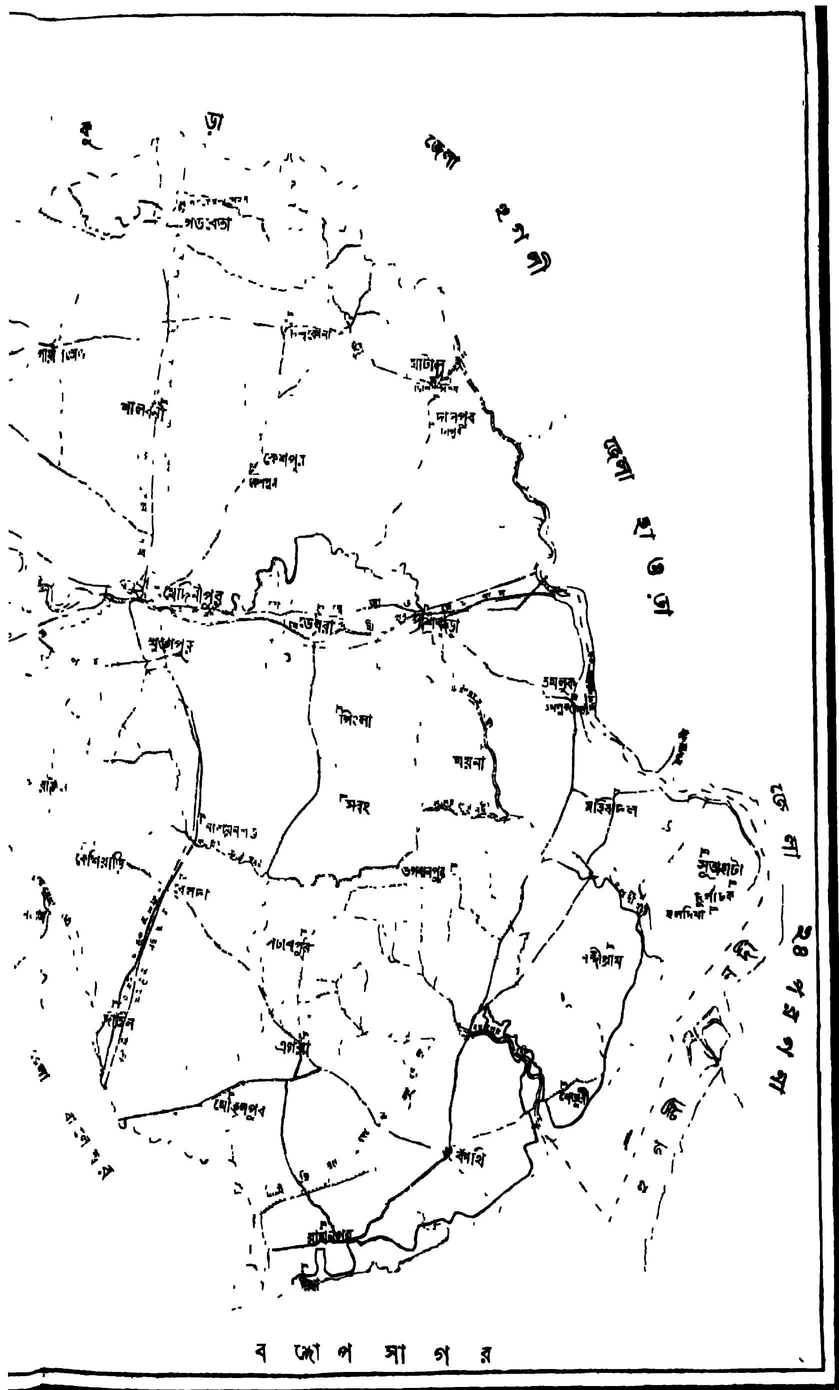
জেলা পুরুলিয়া

বিনপুর

জামবনি

ঝাড়গ্রাম

সাংকেতিক


জেলা হুগলী
জেলা হাওড়া
গড়বেতা
শালবনী
কেশপুর
ঘাটাল
দাসপুর
মেদিনীপুর
খড়্গপুর
ডেবরা
পাঁশকুড়া
তমলুক
পিংলা
ময়না
সবং
মহিষাদল
সুতাহাটা
দুর্গাচক
হলদিয়া
নন্দীগ্রাম
নারায়ণগড়
কেশিয়াড়ি
বেলদা
ভগবানপুর
পটাশপুর
দাঁতন
এগরা
মোহনপুর
কাঁথি
খেজুরী
রামনগর
দীঘা
বঙ্গোপসাগর



শিশির ভাদুড়ী।

মেদিনীপুর

Tamluk.........it is only place in Midnapur District concerning which we have any ancient history.

—W. W. Hunter

বারোই জুলাই, উনিশশো সাতাত্তর। কলকাতার ইংরেজী দৈনিক স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় একটি খবর বের হয়।[১] খবরটি ছোট কিন্তু চমকপ্রদ। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে ঝাড়গ্রাম মহকুমা। পশ্চিমবাংলারও শেষ সীমা। এখানেই একটি গ্রামে তাম্রপ্রস্তর যুগের একখানি কুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। কুঠারটির দুইদিকে ধার, তামা দিয়ে তৈরি। বয়স হিসেব করলে প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। কিছুদিন আগে ঠিক এই ধরনের কুঠার ও কিছু তামার জিনিসপত্র উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় পাওয়া গিয়েছিল। ময়ূরভঞ্জ পশ্চিমবাংলারই গা ঘেঁষে উড়িষ্যার সীমানা।

এ জাতীয় আবিষ্কার এই প্রথম নয়। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে উনিশ শতকে এ ধরণের আরো অনেকগুলি ঘটনার হদিস পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রাম মহকুমার ভেতর তামাজুড়ী ছোট গ্রাম। বেলপাহাড়ীর কাছাকাছি। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। উনিশ শতকের শেষদিকে সেখানে একখানি কুঠারফলক পাওয়া গিয়েছিল।[২] প্রাচীনত্ব বিচার করলে আর্যপ্রভাব বিস্তারের আগেই তার তারিখ পড়ে। এরই বছরখানেক আগে তখনকার মানভূম জেলার বরাহভূম পরগনায় দেওঘা গ্রামে এমনি একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৩] আর একখানি কুঠার ফলক পাওয়া গিয়েছিল সিংভূম জেলার ধলভূম পরগনায়।[৪]

১ Indian News in Brief: The Statesman, July 12, 1977.

২ ১৮৮৩ সাল। Catalogue and Handbook of the Archaeological collections in the Indian Museum, part II.

৩ ১৮৮২ সাল। Catalogue Raisonne of the Prehistoric Antiquities in the Indian Museum.

৪ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1875.

আর্য বিজয়ের সময় অথবা ঠিক তার পরেই লোহার ব্যবহার সুরু হয়েছিল। তখন থেকে তামার ব্যবহার ধীরে ধীরে উঠে যায়।[৫] আঠারো শতকের প্রথম দিকে জঙ্গলমহাল[৬] নামে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ চিহ্নিত করা হয়, তার ভেতরে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলাকীর্ণ ও পার্বত্য অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে কেটে নিয়ে এই যে নতুন মহালের সৃষ্টি হল, তার প্রশাসনিক বন্দোবস্তও হল নতুন করে। একজন আলাদা ম্যাজিস্ট্রেট এজন্যে নিয়োজিত হলেন।

সম্ভবত এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক সময় অতি প্রাচীন জনপদ ও সভ্যতা বিরাজ করত। আর্যপূর্ব এই সভ্যতা মাটির তলায় কোথায় যে লুকিয়ে আছে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা আজও সে সন্ধান পাননি। কিন্তু এই বিস্তৃত অঞ্চলে আদিবাসী ও উপজাতি এখনও যারা বসবাস করেন, তাদের রক্তধারায় সেই বিলুপ্ত সভ্যতার সামান্য ঐতিহ্য শত শত শতাব্দীর লাঞ্ছনা, অপমান, অবিচার ও অত্যাচারের পরে আজও একেবারে ধুয়েমুছে যায়নি।

ব্যক্তিজীবনে এরা ছিলেন সৎ, সাহসী ও অনুগত। এমন কি ইংরেজ আমলেও এই বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হয়নি। মেদিনীপুরের কালেক্টার[৭] এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "এরা অল্পে তুষ্ট, পরিশ্রমী, সাহসী, সত্যবাদী, বিশ্বাসপরায়ণ ও প্রভুর প্রতি অনুগত। কিন্তু কোন ব্যাপারে এতটুকু উৎপীড়িত হলে, গোটা গ্রাম বাস উঠিয়ে যে জমিদার সহৃদয় ব্যবহার করবেন বলে মনে করে, তার এলাকায় চলে যায়। পিতৃভূমির পরে আধা সংস্কারগত, আধা অভ্যাসগত মায়া এদের নেই যা সমতলের চতুর ও বেশী সভ্য মানুষদের ভেতরে দেখা যায়। এদের মধ্যে যারা আমাদের আদালতের চারপাশে দালালদের ছলাকলায় পোক্ত হয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলে যায়, তারাও যখন মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে বলে ধরা পড়ে খুবই লজ্জিত হয়।"

আর্য সভ্যতার কালে আর এক প্রাগৈতিহাসিক রাজ্য এই জেলার বুকে জেগে উঠেছিল। নাম তাম্রলিপ্তি। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্য কোন দিক দিয়েই কম ছিল না, তবু আর্যেরা উপেক্ষা করে একে বলতেন তমোলিপ্ত।

---

৫ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ Regulation XVIII of 1805.

৭ H. V. Bayley, Collector of Midnapore : 1852

কারণ বহুদিন পর্যন্ত আর্যপ্রভাবের বাইরে ছিল এই রাজ্য ও তার রাজধানী। সরস্বতী তখন বিশাল নদী। তারই তীরে[৮] তাম্রলিপ্তি ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট বন্দর। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সবখানি জুড়ে ছিল এই রাজ্য। এখনকার তমলুক রাজধানী।

শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও বাণিজ্যে তাম্রলিপ্তির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। সম্রাট অশোক নিজে এসে এখানে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখান থেকেই বিখ্যাত বোধিদ্রুম সিংহলে পাঠান হয়েছিল। চৈনিক পথযাত্রিক হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন, "এখানকার অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ।[৯]

সুদূর অতীতের এই দুই ঐতিহ্যে যেন অধিস্নাত মেদিনীপুরের জনজীবন ও জনচরিত্র। প্রাচীন ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত, স্বাধীনতায় অনুরক্ত এ জেলার মানুষ, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে শৌর্য ও সংগ্রামে বাংলা তথা ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চুয়াড় বিদ্রোহ থেকে সুরু করে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এ জেলার ইতিহাস ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস। এই জেলারই এক অবিস্মরণীয় সন্তান উনিশ শতকের জনচিত্তে যে তুমুল ও বৈপ্লবিক আলোড়ন তুলেছিলেন আজও প্রতিটি বাঙ্গালী তা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

৮ History of Ancient Bengal—R. C. Majumdar — G. Bharadwaj & Co. 1974.

৯ বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ: —রমেশ চন্দ্র মজুমদার: জেনারেল: ষষ্ঠ সং: ১৯৭৪.

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী

বর্ধমান ভুক্তি বা ডিভিশনের দক্ষিণ দিকে শেষ জেলা মেদিনীপুর। পশ্চিমবাংলার জেলাগুলির ভেতর আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম। জনসংখ্যার দিক থেকেও তাই। জেলা শহরের নামে জেলার নাম। খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে সামন্তরাজা প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকর এই সহর প্রতিষ্ঠা করেন বলে জনশ্রুতি। বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান 'মেদিনীকোষ' তারই রচনা।[১]

জেলার চেহারা অনেকটা আয়তক্ষেত্রের মত। উত্তর দক্ষিণে লম্বা, গড়বেতা থেকে রামনগর থানার দক্ষিণসীমা পর্যন্ত ৯০ মাইল বা ১৪০ কিলোমিটার। পূবে পশ্চিমে একটু কম। তবু পূবের শেষ সীমা হলদিয়া থেকে পশ্চিমে গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণের মতই লম্বা। মানচিত্রের ওপর চেহারাটা দেখায় মাথা কাটা বরাহ শিশুর মত।

চতুঃসীমার উত্তরে বাঁকুড়া। পূবে হুগলী নদী ও তার শাখা নদ রূপনারায়ণ যেন দাগ টেনে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী থেকে একে আলাদা করে দিয়েছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি, পশ্চিমে উড়িষ্যার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ এবং বিহারের মানভূম ও সিংভূম জেলার সীমানা।

মাটির গঠন, জলহাওয়া ও ভূপ্রকৃতির দিক থেকে জেলার উত্তরের সাথে দক্ষিণের এবং পূবের সাথে পশ্চিমের মিল অতি সামান্য। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে মাটির রঙ লাল। প্রকৃতি শক্ত ও পাথুরে। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন ল্যাটারাইট সয়েল। বয়সের দিক থেকে অত্যন্ত প্রাচীন। এমন শক্ত আর পাথুরে যে চাষ চলে না। শাল, পিয়াশাল, সেগুন ও মহুয়ার নেড়া জঙ্গল। আবহাওয়াও

১ প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্গাণ্ডদেশস্য শাসক :
মেদিনীকোষকারশ্চ যস্য পুত্র মহানভূৎ
বিহায় গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ ॥ ৭৫৪

[পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শিখরভূমির রাজা রামচন্দ্রকৃত এক প্রাচীন পুঁথি থেকে এই শ্লোক পান। অনুঃ—উড়িষ্যার শাসক প্রাণকর নামে নৃপতি, যার মহানপুত্র মেদিনীকর 'মেদিনীকোষ' নামে গ্রন্থ প্রণেতা, উড়িষ্যা ছেড়ে মেদিনীপুরে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন।]

"অপর মত অনুসারে মেদিনীমল্ল রায় নামক উড়িষ্যার এক প্রতাপশালী নৃপতি ১৫২৪ খ্রীঃ বিস্তীর্ণ অংশ জয় করে 'মেদিনী' বংশের শাসন কায়েম করেন।"

এখানে পৃথক। শীতের সময় বেশী শীত। গরমের সময় বেশী গরম। বাতাস শুকনো, জলের ভাগ কম। গ্রীষ্মের সময় তাপমাত্রা ওঠানামা করে ১০০.৪ থেকে ১১৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে; শীতের সময় ৫৫ থেকে ৮৪ ডিগ্রির ভেতর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১.১৫ মিলিমিটার। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ভেতর বৃষ্টি বেশী হয়। সব থেকে বেশী হয় জুলাই-আগষ্ট মাসে। ২

পূবের মাটি গড়ে উঠেছে হুগলী নদী ও তার একাধিক উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলি দিয়ে। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার মাটির মতই এ মাটির প্রকৃতি। উর্বর, সমতল, ও কৃষিযোগ্য। এখানকার মাটিকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এঁটেল, দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ। এদের ভেতরেও ছোট ছোট ভাগ আছে। যেমন ঘরা এঁটেল, এ মাটির রঙ কালচে থেকে হলুদাভ। প্রকৃতি শক্ত, উর্বরা শক্তি কম। সাধারণত ঘরের দেওয়াল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। নোনা এঁটেল বা কুশ মাটি; নদী, সমুদ্র ও খালের কাছাকাছি পাওয়া যায়। বর্ষার সময় আঠাআঠা ও পিচ্ছল, গ্রীষ্মে খুবই শক্ত। লবণাক্ত এই মাটি চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। গরমের সময় এর ওপরে সাদাটে এক ধরণের আবরণ পড়ে। লবণের প্রাচুর্য থেকেই এই আবরণের সৃষ্টি হয়। বান মাটি বা পশু মাটির লালচে রঙ, নরম এই মাটি ধান চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। দুধে মাটি, শক্ত সাদাটে, ঘরে কাদার দেয়াল গাঁথার কাজে লাগে। কালা এঁটেল, কালো রঙের মাটি, সাধারণত হাঁড়ি কলসি তৈরি করতে কাজে লাগে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে জমিকে বলে পলি মাটি। পলি মাটি নদীতে টেনে আনা পলি। পাঁক মাটি ও খাল মাটি যথাক্রমে বাসিন্দাদের ঘরের মুখে, রাস্তার পাশে নয়নজুলির ভেতরকার থিকথিকে মাটি যা গোবর, ছাই ও আবর্জনা পচে তৈরি হয়।[২]

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলরাশি ও তটভূমি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি উড়িষ্যার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় গ্রীষ্ম দীর্ঘস্থায়ী। শীত কম ও ক্ষণস্থায়ী। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলগুলি বর্ষার পরেও অনেকদিন জলে ডুবে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এখানে বেশী। বছরে গড়ে বৃষ্টিপাত ২.০৩ মিলিমিটার।[৩]

২ Distrtct Hand Books, Midnapur 1951 : Ed. A. Mitra I. C. S. 1953

৩ মেদিনীপুর জেলা : ইতিহাস ও সংস্কৃতি। দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৭৪

সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে ছোট ছোট বালির পাহাড় দেখা যায়। এই পাহাড়গুলি দুটি শ্রেণীতে আছে। একটিকে বলা হয় দীঘা দোন (Digha Dune) অপরটি কণ্টাই দোন। দীঘা দোন রসুলপুর নদী থেকে সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত প্রায় ৭ মাইল লম্বা, বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে আছে।[৪]

প্রকৃতপক্ষে রানীগঞ্জ-বাঁকুড়া হয়ে যে পাকা সড়কটি মেদিনীপুর রেলস্টেশন ছুঁয়ে, উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি জেলার ভেতর দিয়ে বালেশ্বর ও কটক পর্যন্ত চলে গেছে, ভূপ্রকৃতি অনুসারে সেটিই জেলাটিকে দুটি মোটা দাগে ভাগ করেছে। এই সড়কের পূর্বদিকের ভূভাগ সমতল ও পলিমাতৃক, জমি উর্বর ও কৃষিযোগ্য। চাষ আবাদের পক্ষে নির্ভরশীল। পশ্চিমদিকের ভূভাগ উঁচুনিচু, ঢেউ খেলান। ছোটনাগপুরের মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের সম্প্রসারণ। উঁচু পাহাড়ী জমি ধাপে ধাপে নামতে নামতে এই শক্ত, লাল, পাথুরে মাটির সৃষ্টি করেছে।[৫]

উত্তরপশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া, এ জেলার আরও নানা জায়গায় বনাঞ্চল ছড়ান আছে। মোট, বনএলাকা ৬৫১ বর্গমাইল, মেদিনীপুর পূর্ব ও মেদিনীপুর পশ্চিম এই দুটি ডিভিশনে বিভক্ত। এই দুই ডিভিশন থেকে মোট বাৎসরিক আয় হয় চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। সাধারণতঃ শালের খুঁটি, জ্বালানি কাঠ, বিড়ির পাতা, কাজুবাদাম ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যই এই আয়ের উৎস।[৬]

১৭৬৫ ও ১৭৯৯ সালে যখন জঙ্গলমহাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চলে যায় তখন ক্রমাগত বন উৎসাদন চলতে থাকে। ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে ওপরের ডাঙা জমিতেও জল জমার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাঠের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আরেক দফা বন-সংহার চলতে থাকে। তখন বেশীর ভাগ বনাঞ্চলই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়। স্বাধীনতার আগেই আইন[৭] করে বন-উৎসাদন নিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবং এই আইনের আওতায় প্রায় ২,৭৬,৫২১ একর বনএলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী কালে পুনরায়

৪ Ibid—৩
৫ District Hand Books, Midnapore 1951
Ed. A. Mitra I. C. S. 1953.
৬ Midnapur : Progress & Problems : D. M. Midnapur 1972 : p-4
৭ Private Forests Act, 1945.

আইন[৮] করে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রিত করা হয় ও বনএলাকা সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে একই সাথে বন-পত্তন ও বন কেটে আবাদ তৈরির কাজ সুরু হয়।

খনিজ সম্পদ বলতে এ জেলায় তেমন কিছু নেই। তবে এখানকার শক্ত পাথুরে ল্যাটারাইট সয়েল বাড়ি তৈরির পাথর হিসেবে কাজে লাগে। অসংখ্য পুরনো দেউল, মন্দির. মসজিদ, গড যা এখানকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তা এই পাথুরে চাঙ বা বিল্ডিং ষ্টোন দিয়ে তৈরি। কিছু কিছু চুনাপাথর ও ম্যাগনেসিয়াম মেশান পাথরও এখানে পাওয়া যায়। বেল পাহাড়ী ও ঠাকুরানী পাহাড়ী অঞ্চলে কেওলিন ও ল্যাটারিটাইজড্ ম্যাঙ্গানিজ আকর পাওয়া গিয়েছিল। তবে এ ম্যাঙ্গানিজ উন্নত ধরনের নয়। এ ছাড়া এ জেলার পশ্চিমদিকে শেয়ারবিন্দা, চাকাডোবা ও ধেনকিয়াতে নিচু মানের অভ্র পাওয়া যায়।[৯]

৮ West Bengal Forest Act, 1948 ওয়ার্কিং প্লানের মাধ্যমে রিজিওনাল যথেষ্ট অফিসার বনাঞ্চল নিয়ন্ত্রিত করতেন

West Bengal Estate Acquisition, Act, 1956.

৯ মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি—২য় সংকলন, ১৯৭৪

॥ নদনদী ॥

সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এ জেলায় নদী নালার সংখ্যা বেশী। বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। এদের ভেতর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হুগলী নদী। হুগলী পয়েণ্টের উল্টোদিকে যেখানে রূপনারায়ণ এই নদীতে এসে পড়েছে সেখান থেকে পূব সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। যদিও জেলার ভেতর এর অনুপ্রবেশ ঘটেনি তবু এরই উপনদী ও শাখা প্রশাখা দ্বারা জেলার বহুলাংশ বিধৌত। নিচের তালিকা থেকে এ সম্বন্ধে মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে।

মেদিনীপুরের নদী বিন্যাস[1]

- হুগলী — পশ্চিম দিক থেকে এসে পড়েছে:
  - রূপনারায়ণ — এসে পড়েছে:
    - শিলাই বা শিলাবতী পশ্চিমতীরে — এসে পড়েছে:
      - বুড়ি, পশ্চিমতীরে
      - গোপা, পূর্বতীরে
      - পুরন্দর, পূর্বতীরে
  - হলদী — এসে পড়েছে:
    - কাঁসাই উত্তর তীরে
    - কালিঘাই বা কেলেঘাই উত্তর তীরে — এসে পড়েছে:
      - কালিকুণ্ড, উত্তরতীরে
  - রসুলপুর

হুগলী নদীর তীরে একসময় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল খেজরি। বড় বড় বাণিজ্যপোত এখানে এসে নোঙর করত (১৮৬১-৬২) পর্যন্ত। সাগরদ্বীপের পশ্চিমাংশ ঘেঁষে হুগলীর সাগর অভিমুখে যাত্রা। মোহনামুখে সমুদ্রের মতই এর বিশাল বিস্তার। পলি জমে ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে উঠেছে

[1] A Statistical Account of Bengal : Vol-III. W. W. Hunter D. K. Publishing House : Delhi, 1973.

সেখানে। খেজরি ছাড়া আর যেসব স্থান এ জেলার ভেতর হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত তাদের ভেতর কাউখালির বাতিঘর, হিজলী ফ্ল্যাট ও হিজলী মন্দির উল্লেখযোগ্য।[২]

হুগলীর অন্যতম উপনদী রূপনারায়ণ। ঊর্ধাংশের নাম ধলকিশোর ও দ্বারকেশ্বর, মেদিনীপুর ছুঁয়ে নাম হয়েছে রূপনারায়ণ। ঘাটালের কয়েক মাইল উত্তরপূর্ব দিয়ে এই নদী জেলায় ভেতর অনুপ্রবেশ করেছে ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে তমলুক পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে হুগলী পয়েন্টের উল্টোদিকে গেঁয়োখালিতে হুগলী নদীতে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে রূপনারায়ণ হুগলী ও হাওড়ার জেলার সাথে কিছুটা অংশ জুড়ে এ জেলার পূর্ব সীমা। মোহনার কাছে এটি বেশ চওড়া। মাঝে মাঝে চর ও ছোট ছোট দ্বীপ থাকলেও নদীটি নাব্য ও প্রায় সারা বছর ধরেই নৌকা ও স্টীমার চলাচল করে। কোলাঘাটে এর ওপর দিয়েই দক্ষিণপূর্ব রেলপথের সেতুটি।

শিলাই বা শিলাবতী রূপনারায়ণের প্রধান উপনদী। উত্তরে বিহারের মানভূম জেলা থেকে আঁকাবাঁকা পথে এসে মেদিনীপুরে ঢুকেছে। মেদিনীপুর সদর মহকুমার উত্তরদিকে প্রবাহ পূবমুখী। ঘাটাল মহকুমায় গিয়ে দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত। নাড়াজোলের কাছে উত্তরমুখী সোজা বাঁক নিয়ে বান্দার নামক জায়গায় রূপনারায়ণে গিয়ে পড়েছে। বাঁকুড়া থেকে ছোট ছোট দুটি উপনদী পুরন্দর ও গোপা মেদিনীপুরে এসে যথাক্রমে চান্দুর ও কুবাই নামক জায়গায় শিলাবতীতে পড়েছে। বড় উপনদী বলতে বুড়ি। নাড়াজোলের কাছে এটি শিলাইতে পড়েছে।[৩]

তমলুক মহকুমার পশ্চিমপ্রান্তে, ট্যাংরাখালির উল্টোদিকে, কাঁসাই ও কেলেঘাই নদীর মিলিত স্রোত হলদী নদীর সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে নদীটি সাগরে গিয়ে পড়েছে। এরই তীরে গড়ে উঠছে বন্দর নগরী হলদিয়া। মোহনার কাছে হলদীর আকার বিশাল। মাঝে মাঝে বালির চর থাকায় জলযানের পক্ষে বিপজ্জনক। তবু সারা বছর নাব্য। বেগবান স্রোত।[৪]

---

২ District Census Hand Book, Midnapore 1961 : Ed, B Roy, W.B.C S. (1968)

৩ District Hand Books. Minapore Ed, A. Mitra I. C S. (1953).

৪ Ibid ৩

হলদী নদীর প্রধান উপনদী কাঁসাই বা কংসাবতী। বাঁকুড়া থেকে উৎসারিত এর স্রোত এ জেলার উত্তরপশ্চিম অঞ্চল ছুঁয়ে এই জেলায় ঢুকেছে। গতিপথ আঁকাবাঁকা, প্রবাহ প্রথমে দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম মুখী, পরে পূব মুখী। মেদিনীপুর জেলা সহরটি এরই উত্তর তীরে অবস্থিত। কংসাবতী সেচ-প্রকল্প এ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ-আবাদের উন্নতি সূচিত করেছে।

হলদী নদীর দ্বিতীয় উপনদী কেলেঘাই। জেলার পশ্চিমদিকে উদ্ভূত এই নদীটি নারায়ণগড ও সবং থানার ভেতর দিয়ে গিয়ে ট্যাংরাখালিতে কাঁসাই নদীতে পড়ে পরে হলদীর রূপ ধারণ করেছে।

এ জেলায় হুগলী নদীর সর্বশেষ উপনদী রসুলপুর। দক্ষিণ পশ্চিমে বাগদা নামে উদ্ভূত, পূবমুখী প্রবাহে কালিনগর পর্যন্ত এসে নাম হয়েছে রসুলপুর। কাউখালি বাতিঘরের নিচে গিয়ে মিশেছে হুগলী নদীতে। বাগদা নদী অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত। এদের ভেতর বালিঘাই সব থেকে বড।

সুবর্ণরেখা নদী বিহারের ধলভূম থেকে এসে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ঢুকেছে এ জেলায়। মেদিনীপুর সদর মহকুমার দক্ষিণপশ্চিম বরাবর প্রবাহিত হয়ে, গোপীবল্লভপুর থানার ভেতর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণাঞ্চল ছুঁয়েছে। অনুপ্রবেশ করেছে বালেশ্বর জেলায়। যাত্রা শেষ সাগরে। বঙ্গোপসাগর এর মিলনক্ষেত্র। সুবর্ণরেখার গতিপথ সুনির্দিষ্ট। স্রোত বেগবান, বালুকাময় খাত। বৃষ্টি বেশী হলে পূবদিকের খাত ছাপিয়ে প্লাবনের সৃষ্টি হয় [৫]

নদনদী ছাড়াও ছোট বড অনেকগুলি খাল এ জেলার ভেতর দিয়ে শিরা উপশিরার মত প্রবাহিত। পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলে এদের সংখ্যা বেশী। সেচ ও জল নিকাশের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম খালগুলি এ জেলার মানুষের কৃষি ও জীবিকার সহায়ক।

৫ Ibid ১

ইতিহাস

সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়েনা সেথা
—তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।[১]

ক. প্রাচীন যুগ

স্তানিস্লা জুলিয়েন, নামকরা ফরাসী পণ্ডিত। হিউয়েন সাঙ নামে একজন চৈনিক তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে ভারতে এসেছিলেন বলে তিনি শুনেছিলেন। সময়টা সপ্তম শতক। তখনকার ভারতের রাজ্য, রাজধানী, রাজা ও জনজীবনের বিশদ বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। জুলিয়েন চীনাভাষা আয়ত্ত করলেন। মূল থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করলেন সেই বৃত্তান্ত।[২] বারোশো বছর আগে প্রাচীন ভারতবর্ষের রূপ কি ছিল, তারই মোটামুটি বিশ্বস্ত ছবি ফুটে উঠল এই বিবরণে। হদিস পাওয়া গেল তাম্রলিপ্তের। উত্তরপূর্ব ভারতে তখনকার প্রধান ও বিশিষ্ট বন্দর। সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান।

হিউয়েন সাঙের ভাষায়, 'এদেশের পরিধি ছিল ১৪০০ লি. প্রায় ২৫০ মাইল[৩], রাজধানী ১০ লি.। অবস্থিতি সমুদ্রবাহুর কাছাকাছি। জমি নিচু ও আর্দ্র, চাষ আবাদ ভাল হয়। ফুলফল অপর্যাপ্ত। জলবায়ু উষ্ণ। জনসাধারণের আচরণ রূঢ়, তারা সাহসী, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাস করেন। এখানে দেবমন্দির পঞ্চাশটি, অ-বৌদ্ধেরা সকলের সাথে মিলেমিশে বাস করেন। বৌদ্ধ বিহার দশটির বেশী। তাতে শ্রমন থাকেন একহাজার এ দেশের উপকূলভাগে জল ও স্থল এক রেখায় গিয়ে মিশেছে। ফলে এখানে মহামূল্য ও বিরল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। স্বভাবতই অধিবাসীরা ঐশ্বর্যশালী। রাজধানীর পাশেই একটি অশোকস্তূপ ছিল। তারই কাছে চারজন তথাগতের অনুশীলন ক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ।[৪]

১ প্রেমেন্দ্র মিত্র।

২ Historise de la vie de Hiouenthsang et de ses voyages 1 dans, Inde Paris, 1853—S. Jullen.

৩ মতান্তরে ১৫০০ ল

৪ On yuan Chwang's Travells in India—T. Watters : London 1905.

কোথায় এই তাম্রলিপ্ত এ নিয়ে বহুদিন ধরে বাদানুবাদ চলল। শেষ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত সংশয়ের অবসান ঘটালেন। সারা মেদিনীপুর জেলাই ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত। বর্তমান তমলুকের ওপর বা কাছাকাছিই ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই মত মেনে নিলেন। নিশ্চিত হল এখানেই চৈনিক-তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকেরা অবতরণ করতেন।[৫]

শতাব্দীর ব্যবধানে, প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় ভূপ্রকৃতির হেরফের ঘটেছে। তবু আজও তমলুকের এখানে সেখানে খুঁড়তে গেলে সেই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসে।[৬]

হিউয়েন সাঙের প্রায় দুশো বছর আগে এসেছিলেন ফা-হিয়ান।[৭] তিনিও চৈনিক পরিব্রাজক। সে সময় মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। দুবছর তাম্রলিপ্তিতে থেকে ফা-হিয়ান কয়েকখানা বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের অনুলিপি করেছিলেন। ছবিও এঁকেছিলেন কিছু। এখান থেকেই বাণিজ্য জাহাজে চড়ে গিয়েছিলেন সিংহল।

হিউয়েন সাঙের কয়েক বছর পরে এসেছিলেন ইৎসিঙ। তখন এখানে ছিল এক বিখ্যাত 'বরাহ' মন্দির। এই মন্দিরে বসেই তিনি নাগার্জুনের চিঠিপত্র অনূদিত করেছিলেন। এসব চিঠিপত্র রাজা সাতবাহনকে লিখেছিলেন নাগার্জুন। তীর্থযাত্রীরা এখানে এলে কিছুদিন থাকতেন। সংস্কৃত শিখতেন। ইৎসিঙও ছিলেন তিন বছর।[৮]

এরপর একে একে আসেন মহাযান শাখার তাঙ। বারো বছর ছিলেন তিনি, হুইলান ও হিউয়েন তা। তা এখানে থেকে সংস্কৃত ও শব্দশাস্ত্র শিখেছিলেন।[৯]

অবশ্য চীনা পথযাত্রিকদের আগেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত, পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ এবং গ্রীক বিবরণে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

৫ Ibid ৪

৬ বর্তমানে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে কিছু মূর্তি ও ফাইওস্।

৭ A Reord of the Buddhist Kingdoms — J. A. Legge, Oxford 1886

৮ The Life of Hiuen - Tsiang — S. Beal Academica Asiatica, (Indroduction) India 1973

৯ Ibid.

সভায় ভারতের নানা জায়গার রাজা মহারাজা উপস্থিত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তার ছেলে শল্যের সাথে তাম্রলিপ্তের রাজাও হাজির ছিলেন স্বয়ংবর সভায়।[১০] ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও কচ্ছবাসী মনৌজাকে পরাজিত করে ভীম বঙ্গ-রাজ্যের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তারপর সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত ও কর্বটাধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন[১১] এ ছাড়া মহাভারতের আরও নানা জায়গায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। এ সময় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ছাড়াও তাম্রলিপ্ত যে একটি আলাদা রাজ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মনে হয় আর্যপ্রভাব পড়ার আগে থেকেই তাম্রলিপ্তের খুব জাঁকজমক ছিল। আর্যপ্রভাব মুক্ত এই জায়গার নাম তারা অবজ্ঞা করে বলতেন তমোলিপ্ত। নানা নামে চিহ্নিত হত এই দেশ। যথা তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্ত, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ,[১২] বেলাকুঃ[১৩] ইত্যাদি

জৈন কল্পসূত্র থেকে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুনড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন।[১৪] মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস যে গোদাসগণ প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তাই চার শাখায় ভাগ হয়। এদের ভেতর একটি ছিল তাম্রলিপ্তিক।[১৫] এই জেলার বরভূমে ঋষভনাথের যে মূর্তি পাওয়া গেছে তার মাঝখানে মূল মূর্তি ও দুপাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর

১০ কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্য সহপুত্রো মহারথঃ॥ মহাভারত। আদিপর্ব।

১১ সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ মহাভারত। সভাপর্ব

১২ কল্কিরূপধারী বিষ্ণুর সাথে অসুরদের যে যুদ্ধ হয় তাতে বিষ্ণুর দেহ থেকে স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ায় এই স্থান নাকি পবিত্র হয়ে ওঠে। ফলে এর নাম হয় বিষ্ণুগৃহ।
—A Statistical Account of Bengal III —W. W. Hunter

১৩ 'বেলাকূলং (ক্লীং) তাম্রলিপ্তো দেশঃ।' — শব্দকল্পদ্রুম্।

১৪ বাংলা দেশের ইতিহাস — প্রাচীন যুগ। — ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার — ষষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল, ১৯৭৪

১৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব— ডঃ নীহার রঞ্জন রায় — বুক এম্পোরিয়াম, মাঘ ১৩৫৬

আছেন। সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান। মূর্তিটি অষ্টম শতকের পরবর্তী বলে অনুমান।[১৬]

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে বলা হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল। পবিত্র বোধিদ্রুম এখান থেকেই সিংহলে পাঠান হয়েছিল। বৌদ্ধভারতের তৎকালীন প্রধান সংঘারামও অবস্থিত ছিল এখানে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তখন ভারতে দুটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। একটি প্রাশিয়র, রাজধানী পাটলিপুত্র। অপরটি গঙ্গারিডি ও গঙ্গারিডই, রাজধানী গঙ্গাবন্দর। এই দুই রাজ্যের ভেতর কি সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই মনে করেন এই দুই জাতি গঙ্গারিডই রাজার অধীন ছিল। শিশুনাগবংশের রাজা মহানন্দের শুদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র, মহানন্দপদ্ম ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করে একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন।[১৭] ইনিই নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাটলিপুত্র তাঁর রাজধানী ছিল। যে পরাক্রান্ত গঙ্গারিডই রাজের জন্য আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হতে ভরসা পাননি, তাকে ও পাটলিপুত্রের নন্দরাজকে যদি অভিন্ন বলে ধরা যায়, তাহলে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ।[১৮] তাম্রলিপ্ত ও মেদিনীপুরের সমগ্র অংশ নিশ্চয়ই তার অধিকারভুক্ত ছিল।

নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। এই সময় আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরেই আর একজন পরাক্রান্ত রাজার আবির্ভাব ঘটে। চাণক্য বা কৌটিল্যের সহায়তায়[১৯] ধননন্দকে সরিয়ে তিনি উত্তরভারতে রাজশক্তির কর্ণধার হন। ইনিই বিখ্যাত মৌর্যবংশের পত্তন করেন। তার রাজ্য আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলে, মনে হতে পারে তাম্রলিপ্তের মত বন্দর সম্ভবত তার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সংশয় আছে।

১৬ বাঙ্গালার কাছে হবে ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১

১৭ Political History of India H. J. Filliozat, Tr. Philip Spratt : Ind. Ed 1957.

১৮ বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

১৯ J Filliozat, ibid.

বিশ্ববিশ্রুত দেবপ্রিয় সম্রাট অশোক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র। তিনি কলিঙ্গ জয় করেন খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ অব্দে। তাম্রলিপ্ত তথা মেদিনীপুর নিঃসন্দেহে তার রাজ্যভুক্ত ছিল। কথিত আছে, অশোক নিজে এখানে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিংহল রাজার ভাগিনেয় যখন বোধিদ্রুম নিয়ে সিংহল যাবার জন্যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে ওঠেন, অশোক স্বয়ং বিরাট বাহিনী নিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।[২০]

মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথ। সেনাপতি পুষ্যমিত্র তাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। সেইসময় কলিঙ্গ রাজ্যও পুনরায় স্বাধীন হয়। এবং সম্ভবত মেদিনীপুরের কিছু অংশ কলিঙ্গ রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে আসে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর তৃতীয় শতক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ছ'শো বছরের বাংলার ইতিহাস অবলুপ্ত। উদ্ধার ও যোগসূত্র স্থাপনের অপেক্ষা রাখে।

আনুমানিক ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত তৃতীয় শতকের শেষে বা চতুর্থ শতকের সুরুতে কোন একটি ছোট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অনেকে মনে করেন শ্রীগুপ্ত বাঙালী ছিলেন। কিন্তু এই মত এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিক সমর্থন লাভ করেনি।[২১]

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। সম্রাট ও দিগ্বিজয়ী। আর্যাবর্তের বহু রাজাকে পরাজিত করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বাঙলায় অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সমতট ও উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি সেই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যথাক্রমে করদ ও অঙ্গ রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার কাছাকাছি পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করেছিলেন।[২২] খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে সমস্ত বাংলাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেই ফা-হিয়ান ভারতে আসেন।

২০ Census Hand Books, Midnapore 1951. Ed. A. Mitra I. C. S. 1953.

২১ বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

২২ The History of Bengal. Ed. Dr R. C. Majumdar: The University of Dacca: Second Impression 1963.

ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় বাংলায় এক স্বাধীন রাজার অভ্যুদয় ঘটে। নাম গোপচন্দ্র। তিনি প্রায় তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকখানিই তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে তিন ও চোদ্দ বছর রাজত্ব করেন।[২৩]

ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তখন সমস্ত পশ্চিমবাংলা গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। এই শতকের শেষদিকে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন।

এই সময়ে গৌড়ে এক পরাক্রান্ত নরপতির অভ্যুদয় ঘটে। তিনি বাংলার গৌরব শশাঙ্ক। খ্রীষ্টীয় ৬০৬ অব্দের আগেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার কানাসোনা।

সপ্তম শতকের আগে থেকেই মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে সম্ভবতঃ একটি স্বতন্ত্র বা সামন্তরাজ্য ছিল। নাম দণ্ডভুক্তি। সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত ও মহাপ্রতীহার শুভকীর্তি ছিলেন এর শাসনকর্তা।[২৪] শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। শৈলোদ্ভব বংশীয় রাজগণ তাঁর অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে কোঙ্গোদ রাজ্য শাসন করতেন।[২৫]

অষ্টম শতকের পর থেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পতন ঘটতে থাকে। বোধহয় এর আগে, সপ্তম শতক থেকেই দণ্ডভুক্তি জনপদের নামেই তাম্রলিপ্ত জনপদের পরিচয় সূচিত হয়। উৎকলদেশ তখন এই রাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত। দশম শতকের ইর্দা লিপিতে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত।[২৬]

একাদশ শতকের প্রথমদিকে দক্ষিণভারতের পরাক্রান্ত চোলরাজা রাজেন্দ্রচোল যখন মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণরাঢ ও বঙ্গালদেশে যথাক্রমে ধর্মপাল, রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব

২৩ বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
২৪ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।
২৫ বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
২৬ বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব।

করতেন। উত্তররাড় মহীপালের অধীন ছিল।[২৭] স্বভাবতই মনে হয় এই সময় মেদিনীপুরের কিছু অংশ দণ্ডভুক্তি ও কিছু অংশ দক্ষিণরাড়ের অন্তর্গত ছিল। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি আবার দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তির ভেতরে যায়।[২৮] দণ্ডভুক্তির সামন্ত রাজা জয়সিংহ রামপালের বন্ধু ছিলেন। রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে যোগ দেবার আগেই তিনি উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করেছিলেন।

২৭ বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ।

২৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।

খ. মধ্যযুগ

ছোট বড গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভয়ে সব পলাইল॥
—গঙ্গারাম।[১]

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন কলিঙ্গরাজ্য এখনকার তমলুক সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত ছড়ান ছিল।[২] তখন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্বভাগের অধিকাংশ ছিল সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত। পরে এই রাজ্যসীমার অনেক হেরফের হয়।

উৎকল ও উড্র বা ওড্র নামে আরও দুটি রাজ্যের নাম আমরা পরবর্তী সাহিত্যে পাই। রঘুবংশে কালিদাস কপিশা নদীর তীর থেকে উৎকলের সীমানা নির্দেশ করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কাঁসাই বা কংসাবতী, কপিশা নদীর নামান্তর। কালিদাসের বর্ণনা অনুযায়ী উৎকলের দক্ষিণেই কলিঙ্গরাজ্য।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা নিয়ে গঠিত ছিল উৎকল দেশ[৩] ছোটনাগপুর প্রদেশ, ময়ূরভঞ্জ, কেয়ঞ্জর প্রভৃতি গডজাত মহাল ও এ জেলার পশ্চিমাংশ এবং বাঁকুড়ার দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত ছিল উড্র। পরবর্তীকালে উৎকল ও উড্র একই রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। স্বভাবতই এর সীমানারও পরিবর্তন ঘটে। উৎকলের অন্য নাম উড়িষ্যা।[৪]

প্রাচীনকালে উড়িষ্যা একত্রিশটি দণ্ডপাঠ ও একশত দশটি বিশিতে বিভক্ত ছিল। এদের ভেতর ছটি দণ্ডপাঠ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়: যথা, টানিয়া, জৌলিতি, নারায়ণপুর, নইগাঁ, মালঝিটা ও ভঞ্জভূম বারিপাদা। টানিয়া দণ্ডপাঠের ভেতরে কাঁকরাচোর, জলেশ্বরচোর, দাঁতুনিয়াচোর নারাঙ্গাচোর, বিনিসারা বা বালিসারাচোর ও বোড়োইচোর নামে ছটি বিশি ছিল। এখনও এই নামে কয়েকটি পরগণা বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলার রেকর্ডে থেকে প্রাচীন বিশিগুলির পরিচয় বহন করছে। জলেশ্বর এখনও টুনিয়া

১ মহারাষ্ট্র পুরাণ
২ মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু (২য় সং)।
৩ Journal of the Asiatic Society, Vol.—LXVI, Part-1, No. 2.
৪ ibid ২।

জলেশ্বর নামে পরিচিত। বর্তমান কাঁথি মহকুমার অনেকখানিই মালঝিটা দণ্ডপাঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশপুর, শালবনী, খড়্গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার অনেকখানি নিয়ে ভঞ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল।[৫]

দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে উৎকলের রাজা অনন্তবর্মা চোডগঙ্গ দেব মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ভিতর দিয়ে গিয়ে গঙ্গার কাছাকাছি মন্দার প্রদেশ জয় করেন। মেদিনীপুর (মিধুনপুর) ও আরম্য (আরামবাগ) দুর্গ তিনি অধিকার করেছিলেন। এই সময় থেকে মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান উৎকল রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তরাইয়ের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হন মুহম্মদ ঘোরী। ফলে আর্যাবর্তে মুসলমান রাজত্বের ভিত গড়ে ওঠে। এর কয়েকবছর পরে (১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ খ্রীঃ) গর্মসীরের অধিবাসী ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী হঠাৎ আক্রমণ করে প্রথমেই নোদীয়হ বা নদীয়া, পরে লখনৌতি, লক্ষণাবতী বা গোড় জয় করেন। সেনরাজা লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন।

তেরো শতকের প্রায় মাঝামাঝি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন তুঘ্রল খান। এই সময় জাজনগর বা উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব গোড় আক্রমণ করেন। এখনকার মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার অনেকাংশ জাজনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।[৬] তুঘ্রল পাল্টা আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালান ও প্রচুর ধনরত্ন এবং হাতি নিয়ে ফিরে আসেন।

পনের শতকের শেষদিকে গোড়ের সিংহাসনে বসেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্। রাজত্বের প্রথম বছরেই উড়িষ্যার সাথে তার সংঘর্ষ বাধে। পুরুষোত্তম দেব তখন উড়িষ্যার রাজা। ১৪৯৭ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয় এবং পুত্র প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে বসেন। হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করে রাজধানী কটক ও পুরী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করে নেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রায় সব দেবমূর্তি বিনষ্ট হয়। শুধু জগন্নাথ মূর্তিকে তার আগে দোলায় চড়িয়ে চিল্কা হ্রদের ভিতর চড়াইগুহা পর্বতে রাখা হয়েছিল। প্রতাপরুদ্র তখন উড়িষ্যায়

৫ ibid ২।

৬ বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার : জেনারেল, ২য় সংস্করণ ১৩৮০।

ছিলেন না। দক্ষিণদিকে অভিযানে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে দ্রুত রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হোসেন শাহকে তাড়া করে গঙ্গার তীর পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর বহুদিন ধরে দুজনের ভেতরে যুদ্ধ চলেছিল। এই সময় চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত ঘুরে নীলাচলে ফিরে আসেন। কিছুদিনের জন্য তখন স্থগিত ছিল যুদ্ধ। পরে হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যায় অভিযান চালিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি আফগান বংশীয় সুলেমান কররাণী বাংলার অধিপতি হন। উড়িষ্যা তখন অন্তঃকলহে দুর্বল। সুলেমান, পুত্র বায়াজিদ ও সিকন্দর উজবকের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যায় পাঠান। উড়িষ্যার রাজা তখন হরিচন্দন মুকুন্দদেব। এর আগেই তিনি আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন (১৫৬৫ খ্রীঃ)'। নিজেও অভিযান পরিচালনা করে পশ্চিম বঙ্গের সাতগাঁও পর্যন্ত এসেছিলেন। গঙ্গার কূলে ঘাটও তৈরি করিয়েছিলেন একটি।

বায়াজিদকে প্রতিরোধ করতে সেনাবাহিনী পাঠালেন মুকুন্দদেব। নেতা ছোটরায় ও রঘুভঞ্জ। দুজনেই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। ফলে এদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হল তাকে। সেই যুদ্ধে মুকুন্দদেব ও ছোটরায় নিহত হলেন। উড়িষ্যার রাজা হলেন রামভঞ্জ বা দুর্গাভঞ্জ। সুলেমান প্রতারণা করে তাকে বন্দী ও বধ করলেন। এই সময় জাজপুর অঞ্চল থেকে সুলেমানের আর এক সেনাপতি, কালাপাহাড আফগান সৈন্য নিয়ে দ্রুত গতিতে পুরীর দিকে রওনা হলেন। বিনা বাধায় পুরীতে প্রবেশ করলেন তিনি। জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠিত হল। বিধ্বস্তও হল আংশিকভাবে। মন্দিরে সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন সুলেমানের অধিকারে গেল। কিছুদিনের ভেতর উড়িষ্যা হল তার রাজ্য-সীমার অন্তর্গত। এই প্রথম মুসলমানের অধীনস্থ হল উড়িষ্যা।

বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ কররাণী। সুলেমান কররাণীর দ্বিতীয় পুত্র। মসনদে বসেই আকবরের অধীনতা অস্বীকার করলেন। আকবর গুজরাট নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন। বাংলা ও বিহারের দিকে নজর দেবার মত সময় ছিল না। বিহার অধিকার করতে তিনি খান-ই-খানান মুনিম খাঁকে পাঠালেন। দাউদ এই সময় বিহার অধিকার করতে নিজে বিহারে গিয়ে-ছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বহু কামান, রণহস্তী, নৌবহর ও বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আকবর বিহারে এসে মু'নিম খানের সাথে যোগ দিলেন। হাজীপুর দুর্গ অধিকার করে আগুন ধরিয়ে দিতেই দাউদ ভয় পেয়ে

বাংলায় পালালেন। পাটনা দখল করে দিল্লী ফিরে গেলেন আকবর। মুনিম এগুলেন বাংলার দিকে।

বাংলার রাজধানী তখন টাণ্ডা। বিনা বাধায় টাণ্ডায় ঢুকলেন মুনিম। সাতগাঁও হয়ে দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুনিম রাজা টোডরমল্ল ও মহম্মদ কুলিখান বরলাসকে ধাওয়া করতে নির্দেশ দিলেন। পলায়ন ও অনুসরণ চলল দুইপক্ষে। শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরে ছাউনি ফেললেন টোডরমল্ল। কুলিখান মারা গেলেন এখানে। মুনিমখান বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে টোডরমল্লের সাথে যোগ দিলেন। দাউদও চুপ করে থাকার পাত্র নন। দাঁতনের এগারো মাইল দক্ষিণপূর্বে হরিপুরে পরিখা খুঁড়লেন, তৈরী করলেন প্রাচীর, প্রতিরোধের সমস্ত আয়োজন একে একে সম্পূর্ণ হল। সুবর্ণরেখা নদীর কাছে তুকারোই গ্রামের প্রান্তরে দুই পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি হল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল সেখানে। মুঘলদের ক্ষয়ক্ষতি হল বিস্তর। সৈন্যও মারা পড়ল অগুনতি। তবু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না দাউদ। তাকে কটকে পালাতে হল।

মুনিম তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। বয়স বিরাশি। তবু প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত বৃদ্ধ নির্বিচারে যুদ্ধবন্দীদের মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। ছিন্নমুণ্ডের আটটি বড বড স্তম্ভ তৈরি হল। শেষ পর্যন্ত মুনিমের বশ্যতা স্বীকার করলেন দাউদ। তাঁকে উডিষ্যার জায়গীর দিয়ে টাণ্ডায় ফিরে গেলেন মুনিম খান।

মুনিমের মৃত্যুর পর আকবর হাসান কুলি বেগ ওরফে খান-ই-জাহানকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন। এই সময় দাউদ বিদ্রোহ করলেন আবার। মোগল-পাঠানে যুদ্ধ বাধল। সে যুদ্ধে পরাজিত দাউদের মাথা কেটে আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাংলার ইতিহাসে শেষ হয়ে গেল আফগান যুগ।

দাউদের মৃত্যুর পরে তার সেনাপতি কতলু লোহানী উডিষ্যায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার রাজ্যসীমা। পরে মোগলদের সাথে এক চুক্তিতে তিনি মেদিনীপুর সহ উডিষ্যার করদ-অধীশ্বর হিসাবে পরিগণিত হন। মানসিংহের সময় বিজিত হয় মেদিনীপুর ও সমগ্র উড়িষ্যা অন্তর্ভুক্ত হয় মোগল সাম্রাজ্যের।

আফগান আমলে বর্তমান মেদিনীপুর জেলা দু'টি সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকার জলেশ্বর ও সরকার মান্দারণ। জেলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভাগ ছিল মান্দারণের ভেতর। বাকি অংশ ছিল সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত।

মোগল বিজয়ের পর মেদিনীপুর সুবা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লী দরবার থেকে সরাসরি একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হতেন। তিনিই পরিচালনা করতেন উডিষ্যার শাসনকার্য। সম্রাট শাহজাহানের সময় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। উডিষ্যা তার অধীন ছিল। সুজার দ্বিতীয়বার শাসনকালে (১৬৪৬-৫৮ খ্রীঃ) উডিষ্যা ও বাংলার সীমানা পুনরায় নির্ধারিত হয়। উডিষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সাথে যুক্ত হয়েছিল সরকার জলেশ্বর।

সতেরো শতকের শেষদিকে এখনকার ঘাটাল মহকুমার চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন উডিষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খান। বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ইজারাদার তখন একজন পাঞ্জাবী। নাম রাজা কৃষ্ণরায়। শোভাসিংহ সেখানে লুঠতরাজ শুরু করলেন। বাধা দিতে গিয়ে মারা পডলেন কৃষ্ণরায়। হুগলীতেও চলল লুঠপাট, শেষে ওলন্দাজদের হস্তক্ষেপে শোভাসিংহ হুগলী ছেড়ে আবার ফিরে গেলেন বর্ধমানে। কৃষ্ণরায়ের মেয়ের ওপর বলাৎকার করতে গিয়ে তাঁরই হাতে নিহত হলেন।

১৭১০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি খান। এর তিন বছর আগেই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল। দিল্লীর সম্রাট তখন বাহাদুর শাহ এবং বাংলার সুবাদার আজিমুসসান।

দেওয়ান হলেও মুর্শিদকুলি খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাকে হত্যার জন্য ষডযন্ত্র করা হয় ঢাকায়। ফলে বাদশাহের অনুমতি নিয়ে ঢাকা থেকে বাসস্থান উঠিয়ে তিনি মকসুদাবাদে কায়েম করলেন। পরবর্তীকালে এই জায়গারই নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। সুবাদারি করেন দীর্ঘ দশ বছর। পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর সুবাদার হন জামাই সুজাউদ্দিন। সুজাউদ্দিনের দরবারে হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী নামে দুই ভাই খুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। সুজাউদ্দিনের শাসনকালেই (১৭৩৩) বিহার প্রদেশ বাংলা সুবার সাথে যুক্ত করা হয়। বাংলাও বিভক্ত হয় দুইভাগে। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার শাসন নিজের হাতে রাখলেন সুজাউদ্দিন। পূর্ব,

দক্ষিণ ও উত্তর বাংলায় বাকি অংশের জন্য ঢাকায় একজন নাজিম থাকলেন। বিহার ও উড়িষ্যার জন্যও থাকলেন একজন আলাদা নাজিম। এদের ভেতর আলিবর্দী ছিলেন বিহারে।

সুজাউদ্দিনের পর বাংলার নবাব হলেন সরফরাজ খান। ঠিক এক বছরের মাথায় আলিবর্দীর সাথে গিরিয়াতে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হল। তাতে পরাজিত ও নিহত হলেন সরফরাজ। আলিবর্দী অধিকার করলেন মুর্শিদাবাদ। বাংলা হস্তগত হলেও উড়িষ্যা অধীনতা মানল না। সেখানকার নায়েব নাজিম রুস্তম জঙ্গের স্ত্রী ছিলেন সুজাউদ্দিনের মেয়ে। ১৭৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিরাট বাহিনী নিয়ে আলিবর্দী উড়িষ্যা যাত্রা করলেন। পথে পড়ল মেদিনীপুর। সেখানকার জমিদারেরা বিজিত হলেন। কিন্তু তার সাথে সহযোগিতা করলেন না। ফুলওয়ারির যুদ্ধে হেরে গিয়ে রুস্তম জঙ্গ দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিলেন। উড়িষ্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আলিবর্দীকে সেখানে প্রায় একমাস থাকতে হল। কটক থেকে ফেরার পথে খবর পেলেন নাগপুর থেকে পাচেটের ভেতর দিয়ে গিয়ে মারাঠা সৈন্য ভাস্কর পণ্ডিতেব নেতৃত্বে বর্ধমানে লুঠপাট শুরু করেছে। দ্রুত বর্ধমানে হাজির হলেন আলিবর্দী। মারাঠারা তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। কোনমতে তাদের ব্যূহ ভেদ করে তিনি কাটোয়ায় গিয়ে পৌছুলেন। ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্তিরের ভেতর চল্লিশ মাইল পার হয়ে মুর্শিদাবাদে হাজির হলেন। শহরে লুঠতরাজ করলেন সারাদিন। আলিবর্দী যখন মুর্শিদাবাদে পৌছুলেন, মারাঠারা তখন হাজির হল কাটোয়ায়। রাজমহল থেকে শুরু করে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মারাঠাদের শাসনাধীন হল।

মারাঠা সৈন্যদের বলা হত 'বর্গী'। নিজেদেব ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যারা যুদ্ধ করত তাদের নাম ছিল শিলাদার। নিচু শ্রেণীর যে-সব সৈন্যদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র সরকার দিতেন তাদের নাম ছিল বার্গীর। 'বর্গী' এই বার্গীরেরই অপভ্রংশ।[৭]

দ্বিতীয়বার বর্গীর আক্রমণ হয় পরের বছর মার্চ মাসে। সেবার ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলাও এলেন লুণ্ঠন করতে। কাটোয়ায় পৌছুলেন তারা। ওদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের ভেতর দিয়ে বাংলার দিকে এগুলেন। খবর পেয়ে রঘুজী কাটোয়া ছেড়ে গেলেন

৭. History of Bengal, Vol-II; Jadunath Sarkar

বীরভূমে। বালাজী তাকে তাড়া করে বাংলার সীমানা পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। ঠিক হল আলিবর্দী মারাঠা রাজ সাহুকে চৌথ দেবেন এবং বালাজীকে দেবেন বাইশ লক্ষ টাকা। কলকাতা সুরক্ষিত করতে সেখানকার বণিকেরা সংঘবদ্ধ-ভাবে চাঁদা তুললেন। পরিমাণ দাঁড়াল পঁচিশ হাজার টাকা। 'মারাঠা ডিচ' খোঁড়া হল। কিছুদিনের জন্য বর্গীর উৎপাত থেকে রক্ষা পেল বাংলা।

পরের বছর ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে আবার এল মারাঠারা। আলিবর্দীর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল ও যে টাকা দিয়েছিলেন সব বরবাদ হয়ে গেল। চুক্তি যেখানে উপেক্ষিত, কৌশল ও চক্রান্ত ছাড়া সেখানে উপায় কি! আলিবর্দী তারই আশ্রয় নিলেন। বহরমপুর থেকে ছ মাইল দক্ষিণে মানকরায় বিরাট শিবির উঠেছিল। সেখানে ভাস্কর পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানালেন আলিবর্দী। একুশজন সেনাধ্যক্ষ নিয়ে শিবিরে এলেন মারাঠা নেতা। দিনটা ছিল ১৭৪৪ সালের ৩১শে মার্চ। অতর্কিতে আক্রমণ করে সবাইকে হত্যা করা হল। নেতৃত্ববিহীন, ছত্রভঙ্গ বর্গীরা বাংলা ছেড়ে পালিয়ে গেল। আলিবর্দী এবার মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে শিবির পাতলেন। কারণ উড়িষ্যা হয়ে বাংলায় ঢোকার প্রবেশপথ ছিল মেদিনীপুর।

১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল আশি বছর বয়সে আলিবর্দীর কর্মক্লান্ত জীবনের অবসান ঘটল। তার আগেই ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বাংলায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। কলকাতায় শক্ত ঘাঁটি গেড়েছিল ইংরেজ কোম্পানী। পরবর্তীকালে এই ঘাঁটি থেকেই বাংলা তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

গ. ইংরেজ আমল :

> Once two hundred years ago the trader week and tame,
> Where his timid foot just halted there he stayed
> Till mere trade
> Grew to Empire and he sent his armies forth,
> South and North :—Rudyard Kipling.

আষাঢ় মাস। বৃহস্পতিবার। ১৭৫৭ সালে দুই সৈন্য মুখোমুখি হল। একদিকে নবাবী সৈন্য, নবাবসিরাজউদ্দৌলা নিজেও উপস্থিত, অন্যদিকে অধিনায়ক কর্ণেল ক্লাইভ। তখন সকাল আটটা। পলাশীর প্রান্তরে প্রথম যে রক্তের দাগ পড়ল তা শ্বেতাঙ্গের রক্ত। নবাব বাহিনীর ফরাসী সৈন্যেরা কামান দেগে যুদ্ধের সূত্রপাত করল, তাতে নিহত হল ইংরেজ। সূর্যোদয়ের পরে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হল, সূর্যাস্তের আগেই তা শেষ হয়ে গেল। সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন ক্লাইভ। বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হল।[১]

পরদিন সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর দাউদপুরে ক্লাইভের সাথে দেখা করলেন। তাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে সংবর্ধনা করলেন ক্লাইভ। ২৯শে জুন মুর্শিদাবাদে তাঁর অভিষেক হল।

মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহ সিরাজের অনুগত ছিলেন। মীরজাফরের আনুগত্য স্বীকার করতে প্রথমে রাজী হলেন না। কিন্তু পরে তা করতে বাধ্য হলেন।[২] মসনদ যে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরী নয়, তার নীচে কাঁটাও থাকে, এ কথা বুঝতে মীরজাফরের দেরী হল না। কোম্পানীকে ও কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীকে যত টাকা ঘুষ দেবার কথা ছিল, দিতে গিয়ে দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নেই। সিপাইদের মাইনে বন্ধ। ওদিকে পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ বেঁকে বসলেন, তাকে বাগে আনতে নবাবকে সৈন্য নিয়ে বেরুতে হল। দুজনের ভেতরে থেকে ক্লাইভ বিপত্তির রফা করে দিলেন। বহাল তবিয়তে পাটনাতেই থাকলেন রামনারায়ণ। এদিকে মাইনে না পেয়ে সিপাইরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। জামাই মীরকাশিম নিজে কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে তখনকার মত গোলমাল মিটিয়ে দিলেন।

১. History of Bengal-II, Ed, Jadunath Sarkar.

২. বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।

১৭৬০ সালের প্রথমদিকে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বড একদল সৈন্য নিয়ে মেদিনীপুর অধিকার করলেন। আগেই কটক আক্রান্ত হয়েছিল। বীরভূমের জমিদারও যোগ দিলেন তার সাথে। অগত্যা ইংরেজ সৈন্যের শরণ নিতে হল। তারা আসতেই বিনা যুদ্ধে চলে গেল মারাঠারা।

এ বছরই জুলাই মাসে কলকাতায় এলেন ভ্যান্‌সিটার্ট। ইংরেজ কোম্পানীর কলকাতা প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর। মীরজাফরের অবস্থা তখন খুবই করুণ। চারিদিকে অসন্তোষ, রাজকোষে অর্থ নেই, সৈন্যদল বিদ্রোহী, পরম সুহৃদ ইংরেজরাও আস্থা হারিয়েছে। বাংলার মসনদে নতুন নবাব চাই। মীরকাশিমের সাথে গোপনে চুক্তি হল ভ্যান্‌সিটার্টের। দরকার হলে ইংরেজরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। বিনিময়ে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজদের দিতে হবে। তাতেই চলবে সেনাবাহিনীর খরচখরচা। নামে নবাব থাকবেন মীরজাফর, মীরকাশিম হবেন নায়েব সুবাদার। কিন্তু মীর-জাফর নবাবী ছাডতে রাজী হলেন না যদিও দুরবস্থা তখন চরমে। বিদ্রোহী সৈন্যেরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে, গালিগালাজ, অপমানের চূডান্ত। পাওনা টাকা না দিলে মেরে ফেলবে বলেও ভয় দেখাচ্ছে। পাটনাতেও একই অবস্থা। রাজবল্লভ বাডিতে বন্দী। সৈন্যদের হাতে বিপন্ন জীবন।

শেষ পর্যন্ত ২০শে অক্টোবর মীরকাশিম ও ক্লাইলোড একদল সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে নবাবের প্রাসাদে ঢুকে পডলেন। ভ্যান্‌সিটার্টের চিঠি দিলেন হাতে। তাতে মীরকাশিমের সাথে চুক্তির কথাই লেখা ছিল। মীরজাফর রাগে ফেটে পডলেন। কিন্তু উপায় ছিল না। অগত্যা বললেন, নবাবীর শখ মিটেছে। এখন জানটা বাঁচাতে চান। কলকাতায় গেলে বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে কেটে যাবে।

তাই হল। ইংরেজ সৈন্যরা তাকে ঘিরে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। বাংলা, বিহার ও উডিষ্যার নবাব হলেন মীরকাশিম। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর ইংরেজদের হাতে গেল।

মসনদ মীরকাশিমের কাছেও সুখের হল না। রাজকোষ প্রায় ফাঁকা। মসনদের দাম আর ঘুষের টাকা দিতে গিয়ে নিজের সঞ্চয়েও টান পডল। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম তৃতীয়বার বিহার আক্রমণ করলেন। মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করল জমিদারেরা। ইংরেজ সৈন্যের কাছে শাহ আলম পরাজিত হলেন। মেদিনীপুরের বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমিত হল।

কিন্তু গোলমাল বাধল খোদ ইংরেজদের সাথেই। তাদের ঔদ্ধত্য ও লাঞ্ছনা সীমা ছাড়িয়ে চলল। এমনকি শুল্ক নিয়েও মতান্তর দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন মীরকাশিম। যুদ্ধ হল গিরিয়ায়, তাতে পরাজিত মীরকাশিম পালিয়ে গেলেন। দারিদ্র্য ও বিস্মৃতি ঢেকে দিল তার বাকি জীবন।

আবার নবাব হলেন মীরজাফর। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম আবার ইংরেজ অধিকারে গেল। সৈন্যসংখ্যাও বেঁধে দেওয়া হল নবাবের।

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতে এলেন ১৭৬৫ সালে। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করল কোম্পানী। এর আগেই মেদিনীপুর অঞ্চলে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসন শুরু হয়েছিল। তখন জেলার দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই ছিল জঙ্গল। এর সাথে লাগোয়া বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে, যা পরবর্তী কালে জঙ্গলমহাল নামে পরিচিত হয়, ছোটবড় জমিদার ও ভূস্বামীরা রাজার মতই স্বাধীন আচরণ করতেন। ইংরেজদের অধীনতা মানতে তারা রাজী হলেন না। ফলে তাদের বশে আনতে বহুদিন ধরে এক সুদীর্ঘ অভিযান চলল।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমদিকে অরাজকতা ছিল চূড়ান্ত। ইংরেজ কর্মচারীরা যে যার নিজের মত ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে নানা জায়গায় ডাকাতদল গজিয়ে উঠল। বিদ্রোহ শুরু করলো জমিদারেরা। অত্যাচারে, দারিদ্র্যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠল। দুবছর পরে দেশে ফিরে গেলেন ক্লাইভ। পর পর কোম্পানীর গভর্ণর হলেন ভেরেলস্ট ও কার্টিয়ার। দুর্দশার উপশম হল না। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রী:) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হল। প্রায় এক কোটি মানুষ না খেয়ে ও অসুখে মারা গেল। চাষের জমিতে গজিয়ে উঠল জঙ্গল।

বাংলার পশ্চিম দুয়ার মেদিনীপুর। অভিযান, দিগ্বিজয়, লুঠ বাংলায় ঢুকে এসব করতে গেলে পশ্চিমের দরজাই সবচেয়ে সুবিধেজনক। ফলে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা মৌসুমি বায়ুর মত থেকে থেকে মেদিনীপুরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকল।

দুর্ভিক্ষের দুবছর পরে বাংলার গভর্ণর হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তখন সন্ন্যাসীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। উত্তরবাংলা ছিল তাদের লুঠতরাজের প্রধান ক্ষেত্র। নাগা গোঁসাই সম্প্রদায়ের এইসব যোদ্ধারা বেশীর ভাগ ছিল

উত্তর প্রদেশের ও মধ্যভারতের অধিবাসী। বেনারসের আখড়া ছিল তাদের মূল কেন্দ্র। তীর্থে তীর্থে ঘুরে তারা যখন লুঠতরাজ চালাত, স্থানীয় অধিবাসীরাও যোগ দিত দলে। ফলে ক্রমশ দল ভারী হয়ে উঠত। পুরী যাবার পথেই মেদিনীপুর। তাদের লুঠতরাজের সীমানা থেকে এ অঞ্চলও বাদ গেল না। ১৭৭৩ সালে ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস একদল সৈন্য নিয়ে এদের মুখোমুখি হলেন। সংঘর্ষে পরাজিত হলেন তিনি।

এ সময়কার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও স্মরণীয় ঘটনা চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ। নবাবী আমলের শেষ দিক থেকে মেদিনীপুর ও তার লাগোয়া অঞ্চলের জমিদারেরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। এই বিদ্রোহ স্থায়ী আকার নিল যখন জেলার অধিকার পাবার পর কোম্পানী তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। এদের ভেতরে উল্লেখযোগ্য ছিল ঝাড়গ্রাম, ফুলকুসমা, ঘাটশিলা, বগড়ী, বিষ্ণুপুর, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ, ধারিন্দা, কর্ণগড় ও আরো অনেক জায়গার জমিদার।

এইসব জমিদারদের পাইক ও বরকন্দাজেরা ছিল বেশীর ভাগই নানা উপজাতির লোক। যথা, ভঞ্জ, কুর্মালি, কোড়া, মুণ্ডারি, কুর্মী, বাগদী, মাঝি, লোধা, ইত্যাদি।[৩] যুদ্ধ ও লুঠই ছিল এদের জীবনধারণের প্রধান উপায়। বাঁধাধরা মাইনে ছিল না। জমিদার কিছু জমি দিতেন, সেই জমির আয় ও লুঠতরাজ থেকেই দিন আনা, দিন খাওয়া চলে যেত।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই অধিকারটুকুও কেড়ে নিল। অভ্যন্তরীণ শাসন ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব গেল কোম্পানীর হাতে। গ্রাম্য-পুলিশ ও পাইক রাখার অধিকার থাকল না জমিদারদের এবং গ্রাম্য পুলিশ ও পাইকদের জোতজমি কোম্পানীর অধিকারের অন্তর্গত হল। রাণী শিরোমণি তখন মেদিনী-পুরের জমিদার। বাসস্থান কর্ণগড়। তার জমিদারীর অনেকখানি কোম্পানীর খাসে চলে গেল। নাড়াজোল রাজপরিবারের চুনিলাল খান ও রাণী শিরোমণি নেতৃত্ব দিলেন। মেদিনীপুর ও তার চারি পাশে আগুন জ্বলে উঠল। বহু ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানির পর ১৮০০ সালে এই বিদ্রোহ দমিত হল। ইংরেজ অধীনতার বিরুদ্ধে পাইক বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

১৮০৬ সালে বগড়ী পরগণায় আর একবার বিদ্রোহ তুমুল হয়ে উঠল। অচল

৩. History of Midnapore Vol-II, Narendra Nath Das, Second Ed, 1972

সিংহ ও ছত্রসিংহ এই বিদ্রোহের নায়ক। প্রায় দশ বছর ইংরেজ শাসনের বাইরে থাকল এই অঞ্চল। ইতিহাসে নায়েক বিদ্রোহ নামে আখ্যাত হল এই অভ্যুত্থান।

মারাঠাদের কর্তৃত্ব ছিল পটাশপুরে। ইংরেজরা অনেকদিন চেষ্টা করেও সেখানে অনুপ্রবেশ করতে পারল না। মাঝে মাঝে উপদ্রব ও সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠত এই অঞ্চলে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যে দুটি ঘটনা বাংলাদেশের জনজীবনকে আলোড়িত করে তুলেছিল তার একটি সিপাহী বিদ্রোহ, অপরটি নীল বিদ্রোহ। প্রথমটির সর্বব্যাপী তরঙ্গ শুধু বাংলা নয়, ভারতে প্রধান শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। মেদিনীপুরেও বিস্তৃত হয়েছিল তার ঢেউ। তবে সে ঢেউ তত উত্তাল নয়। রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণে এ সময়কার যে ছবি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় মেদিনীপুরের জনজীবনের সাথে এই বিদ্রোহ তেমন ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পারে নি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন মিরাট ছেড়ে দিল্লী প্রবেশ করে সেই সময় এক ব্যাটালিয়ন রাজপুত সৈন্য ছিল মেদিনীপুরে। পল্টনের নাম শেখাওয়াত ব্যাটালিয়ান। একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করে। পরে সেই ব্রাহ্মণকে এখনকার কলেজিয়েট স্কুলের সামনের মাঠে ফাঁসি দেওয়া হয়।[৪]

নীলের চাষ মেদিনীপুরে হলেও নীলবিদ্রোহের প্রধান পটভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ। এইবিদ্রোহও যেন মেদিনীপুরে তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে নি।

উনিশ শতকে বেশ কিছুদিন এই জেলা শান্ত হয়ে থাকল। যেন শক্তিসঞ্চয় করে নিল পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হল প্রস্তুতি। প্রথম বছরেই জেলা শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বসল। স্থান পোড়া বাংলার মাঠ, অর্থাৎ এখন যেখানে বার্জটাউন।[৫] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে বহু প্রতিনিধি এলেন। সভাপতি এন. এন, ঘোষ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত : প্রবোধ চন্দ্র বসু

৫. মেদিনীপুরের বোমার মামলা : অতুলচন্দ্র বসু : বাংলা সন ১৩০৮ সাল ইংরাজী ১৯০১ সালে বসেছিল সম্মেলন।

থেকে শুরু করে নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তির সমাগমে মেদিনীপুরের জীবনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল।

পরের বছর বরোদা থেকে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে গঠন করলেন বিপ্লবী কেন্দ্র। বছর ঘুরতে এলেন নিবেদিতা। ধর্মালোচনা ছাড়াও মৌলভী আবদুল কাদেরের বাড়িতে একটি ব্যায়ামাগার উদ্বোধন করলেন। দেখতে দেখতে আরো অনেকগুলি ব্যায়ামাগার গড়ে উঠল শহরে। পরবর্তীকালে এগুলিই বিপ্লব পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে। পাক্কা সাহেব, উঁচু নাক, ইংরেজীতে যাকে বলে স্নব। শাসিত ভারতীয়দের মানুষ বলেই মনে করতেন না। তিনি আসার আগে থেকেই বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠছিল। রাজনীতিতে বাঙ্গালীর আধিপত্য খর্ব করতে মতলব আঁটলেন কার্জন। ঠিক হল, আসাম ও বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ নিয়ে ছোটলাট শাসিত একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। বাংলার প্রেসিডেন্সী বিভাগ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে হবে আর একটি প্রদেশ। দুই প্রদেশে স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর সংখ্যা হবে কম। ফলে তাদের আধিপত্যও কমে যাবে। কিন্তু ফল হল উল্‌টো।

এতদিন ছাড়া ছাড়া ভাবে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গড়ে উঠেছিল, আচমকা এই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। প্রবল হয়ে উঠল প্রতিরোধ। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় ধ্বণিত হল সরব ঘোষণা :

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান ...
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান।

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও অসন্তোষে সারা বাংলা ফেটে পড়ল। আপামর জনসাধারণের ভেতরে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হল ভারতের পরবর্তী ইতিহাসেও তার নজীর মেলা শক্ত। বিলেতে তখন ভারতীয় বিভাগের মন্ত্রী ব্রডরিক মতামত জানতে চাইলেন। কার্জন লিখলেন, 'বাঙ্গালীরা মনে করে তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। স্বপ্ন দেখে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একজন বাঙ্গালীবাবু কলকাতায় বড়লাটের বাড়িতে বসবাস করছে। বঙ্গভঙ্গ হলে এই সম্ভাবনা দূর হবে। এই জন্যে এদের এত প্রবল প্রতিরোধ। আজ

দুর্বল মুহূর্তে যদি এদের কথায় কান দিই, ভবিষ্যতে আর কখনও বাংলাদেশের কোন অংশ পৃথক করা যাবে না। সমস্ত বাঙালী জাতির সংহত শক্তি আমাদের রাজ্যের সমূহ বিপদ ডেকে আনবে।'[৬]

এত অসন্তোষ, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদেও ফল হল না। কার্জন অনমনীয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হল। সেদিন বাংলার অন্যান্য জায়গার মত অশৌচ পালিত হল মেদিনীপুরেও। এর আগে থেকেই ছোটখাট সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। ক্ষীরপাই, দাঁতন, পাঁচরোল, ঘাটাল, মহিষাদল, গড়বেতা, কণ্টাই, মিরগোদা প্রভৃতি জায়গা সভায় ও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরের পুরনো জেলের মাঠে 'কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর' দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হলেন রামচরণ সেন। তার সহকারী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ক্ষুদিরাম 'সোনার বাংলা' নামে কতকগুলি ইস্তাহার সেই প্রদর্শনীতে বিলি করলেন। পুলিশ তাকে ধরে ফেলল। সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে পড়ে ছাড়িয়ে দিলেন। তবু ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা উঠল আদালতে। সত্যেন্দ্রনাথকে সরকার পক্ষে সাক্ষী দিতে বলা হল। কারণ তিনি তখন মেদিনীপুর কালেক্টরীর একজন কেরাণী। সত্যেন্দ্রনাথ ঘটনা অস্বীকার করলেন। ফলে তার চাকরিটি গেল। ক্ষুদিরামও মুক্তি পেলেন, কারণ বয়স কম।

শ্রী অরবিন্দ মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মধ্যমণি ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। এ বছরই এক হেমন্তের দিনে হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠান হল। উদ্দেশ্য, তিনি ফটোগ্রাফী বা চিত্রকলা বা কৃত্রিম পাথর তৈরির কাজ শিখে আসবেন। আসলে এই অভিযান ছিল বিস্ফোরক তৈরীর কাজ শেখার জন্য। সাভারকার বলেছেন, তিনরঙের যে নিশান পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় পতাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়, হেমচন্দ্রই ছিলেন তার উদ্ভাবক। ১৯০৬ সালের ১৮ই আগস্ট জার্মানীর স্টুটগার্ডে মাদাম কামা যে পতাকা উত্তোলন করেন, তা হেমচন্দ্রেরই ডিজাইন। তেরঙা এই নিশানের মাঝখানে হিন্দীতে লেখা ছিল 'বন্দেমারতম' কথাটি। প্যারিসের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ডিজাইনটি অনুমোদন করেছিলেন।

৬. ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ : কার্জনের লেখা চিঠি ব্রডরিককে। আধুনিক যুগ, (মুক্তি সংগ্রাম)

পরের বছর উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন বাংলার ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজার। ৬ই ডিসেম্বর তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। হঠাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড় রেলস্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ হয় প্রচণ্ড। কপালের জোরে বেঁচে যান ফ্রেজার। রেললাইন বেঁকে বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয় মাটিতে। কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ি অক্ষতই থেকে যায়।

এর পরদিন ছিল মেদিনীপুরে জেলা কংগ্রেসের অধিবেশন। তখন কংগ্রেস দল দুই শিবিরে বিভক্ত; নরমপন্থী ও গরমপন্থী। নরমপন্থীদের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ গরমপন্থীদের দলে যোগ দেন। হৈ হল্লা করে সত্যেন্দ্রনাথ অধিবেশন ভণ্ডুল করে দিলেন।

এই সময় কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিংস্‌ফোর্ড। স্বদেশীদের ওপর ছিল তার জাতক্রোধ। সামান্য ছুতো পেলেই গুরুতর শাস্তি কেউ এড়াতে পারত না। একবার সুশীল সেন নামে একটি ছেলেকে তুচ্ছ অপরাধের জন্য বেত মারার আদেশ দিলেন। ক্ষেপে উঠলেন বিপ্লবীরা। সিদ্ধান্ত হল কিংস্‌ফোর্ডকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে। এবং সে মূল্য তার জীবন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতা থেকে মজঃফরপুরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর (দীনেশচন্দ্র রায়) ওপর এ কাজের ভার পড়ল। ক্ষুদিরামের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। মজঃফরপুরে তারা কিংসফোর্ডের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখলেন।

সেদিন ছিল তিরিশে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। মজঃফরপুরের ইউরোপীয় ক্লাব থেকে ফিরছিলেন কিংস্‌ফোর্ড। ঘোড়ায় টানা গাড়ি, নাম ভিক্টোরিয়া। সামনে ঠিক তেমনি একখানা গাড়িতে ছিলেন কেনেডি সাহেবের বৌ আর মেয়ে। কেনেডি মজঃফরপুরে নামকরা উকিল। ভুল করে সামনের গাড়িতেই বোমা নিক্ষিপ্ত হল। দুজনেই মারা গেলেন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুজনেই ছুটে পালালেন। ট্রেনে চড়ে মোকামাঘাটে এসে পৌছলেন প্রফুল্ল। সহযাত্রী ছিলেন নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় বলে একজন দারোগা। পুরস্কার ও চাকরির লোভে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করলেন। ধরা পড়ার আগেই নিজের দেহে দুবার গুলি করে প্রফুল্ল লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু ছমাসও গেল না, কলকাতায় সার্পেন্‌টাইন্‌ লেনের কাছে বিপ্লবীর গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে দারোগা তার অতি উৎসাহের দাম ধরে দিলেন।

ক্ষুদিরাম অন্যপথ ধরেছিলেন। রেলপথ ধরে চব্বিশ মাইল হেঁটে তিনি

ওয়েন স্টেশনের কাছে এসে পৌছলেন। পেটে বাঘের মত খিদে, মুড়ি কিনতে গেলেন দোকানে। একজন পুলিশের সন্দেহ হল। আত্মহত্যা করার জন্য পকেট থেকে রিভলভার বের করতে যাচ্ছিলেন, সাথে সাথে পুলিশ তাঁর হাত চেপে ধরল। গ্রেপ্তার হলেন ক্ষুদিরাম। মজঃফরপুর আদালতে বিচার চলল। রায় হল ফাঁসির। মাথা উঁচু করে হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বাংলার মুক্তিমঞ্চে প্রথম শহীদ।

যেদিন মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষিপ্ত হল তার একদিন পরেই পুলিশ কলকাতায় মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ি ঘিরে ফেলল। এখানে একটি বোমা তৈরির কারখানা ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রায় সব প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। কলকাতার আরও নানা জায়গায় পাঁচটি বৈপ্লবিক কেন্দ্রেও খানাতল্লাসী চলল। গ্রেপ্তার হলেন বহু নেতা ও কর্মী। মামলা উঠল আদালতে। এই মামলাই আলিপুরের বোমার মামলা নামে বিখ্যাত। অভিযুক্ত অনেকে। তাঁদের ভেতর সতের জন মুক্তি পেলেন। ফাঁসির হুকুম হল বারীন্দ্র ও উল্লাসকর দত্তের। আজীবন দ্বীপান্তর হল কয়েকজনের। বাকি যাঁরা কারো সাত কারো দশ বছরের জেল হল।* পরবর্তীকালে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বহাল হয়।

এ বছরেই জুলাই মাসে মেদিনীপুরে হনুমানজীর মন্দির, প্যারীচরণ দাস,+ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগজীবন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র দাসের বাড়ি, বসন্ত মালতী আখড়া ও আরো অনেক জায়গায় পুলিশ তল্লাসী চালায়। প্যারীচরণ দাসের বাড়ি থেকে বের হল একটি গোলাকার বল। পুলিশ তাকে সনাক্ত করল বোমা বলে। খানাতল্লাসীর ফলে কিছু কাগজপত্র ও স্বদেশী পত্রপত্রিকারও হদিস মিলল। এ সব নিয়ে এক ব্যাপক মামলা ফেঁদে বসল পুলিশ। তাতে আসামী ১৫৪ জন।[৭] আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল পুরোপুরি সাজান। তবু মামলা উঠল মেদিনীপুরের অতিরিক্ত সেশান জজের আদালতে। কমতে কমতে অভিযুক্ত শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল সতের জন। সন্তোষচন্দ্র দাস,

* বিস্তারিত কলকাতা দ্রষ্টব্য।

+ শ্রীনবেন্দ্রনাথ দাস তাঁর History of Midnapore. Vol-II-তে লিখেছেন প্যারীচরণ দাস। অতুলচন্দ্র বসু মেদিনীপুরের বোমার মামলায় উল্লেখ করেছেন প্যারীমোহন দাস।

৭. মেদিনীপুরের বোমার মামলা : অতুলচন্দ্র বসু।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও যোগজীবন ঘোষ এঁদের মধ্যে প্রধান। বিচারে সন্তোষ ও যোগজীবন দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

আপীল হল হাইকোর্টে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেন্‌কিন্‌স্‌ ও অন্যতম বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সামনে শুনানী হল। সেসন আদালতের রায় ধোপে টিঁকল না। দণ্ডিতেরা মুক্তি পেলেন।

আলিপুরের বোমার মামলা, ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি জনজীবনে যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, কিছুদিনের জন্য তাতে ভাঁটা পড়ল।

ঘ. বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব :

"Your success justifies your revolt"—Gandhi

মেদিনীপুরে যে মিথ্যে বোমার মামলা সাজান হয়েছিল তার নেপথ্য নায়ক ছিলেন আবদুর রহমান। পুলিশের গুপ্তচর। ১৯১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মহরমের মিছিলে তাঁর ওপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হল। কিন্তু সেটি ফাটল না। দিন তিনেক পরে মাঝরাতে তাঁর বাড়িতেই বোমা ফাটল। কপাল ভাল, কারো জীবনহানি ঘটল না। শুধু দেওয়ালের খানিকটা অংশে ফাটল ধরল।

এ বছরই বিলেতে পার্লামেণ্ট এক নতুন আইন করলেন। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১২। তাতে ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগল। ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হল কলকাতা থেকে দিল্লীতে। অবশ্য ঘোষণাটি হয়েছিল আগেই। উনিশ শো এগার সালের দিল্লী দরবারে।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধের প্রভাব পড়ে ভারতের রাজনীতিতে। পরের বছর গান্ধীজী দক্ষিণ আফরিকা থেকে ফিরে আসেন। ভারতের অন্যতম দল কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশদের সাহায্য করা হবে যুদ্ধে। সাহায্যের পরিমাণ যে কি ছিল সে সম্বন্ধে তখনকার ভারতসচিব মণ্টেগু বলেছেন, সমগ্র যুদ্ধে ১১,৬১,৭৮৯ জন নতুন সৈন্য ভারত থেকে নেওয়া হয়েছিল। বিদেশে যুদ্ধ করেছিলেন ১২,১৫,৩২৮ জন। এঁদের ভেতর মারা যান ১,০১,৪৩৯। মাইনে, যাতায়াতের খরচ-খরচা—সব দিতে হয়েছিল ভারত সরকারকে অর্থাৎ ভারতের জনগণকে। এ ছাড়া নগদ দশকোটি পাউণ্ড দানও করেছিলেন ভারতীয়েরা। গান্ধীজী নিজে নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়াতেন।[৮] সাধারণ মানুষের ভেতর এই যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে নাম লেখানোয় ছিল প্রবল অনীহা। এজন্যে অবশ্য অত্যাচারও চলেছিল পঞ্জাবে।

তখনও বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বালগঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে 'হোম রুল' বা স্বায়ত্তশাসনের দাবী উঠল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অ্যানি বেসাণ্ট মেদিনীপুরে এলেন ১৯১৭ সালে। বাংলাদেশে হোম রুল আন্দোলন তেমন

৮. আধুনিক যুগ (মুক্তি সংগ্রাম)—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। স্বভাবতঃই মেদিনীপুরেও এর প্রভাব ছিল ক্ষীণ।

খিলাফৎ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন (১৯২০ সাল)। দুই ভারতীয় নেতা বিজয় রাঘবাচারী ও মতিলাল নেহরুর অনুরোধে 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে জুড়ে দেওয়া হল। মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নেতৃত্ব দিলেন। সারা জেলায় আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করল। শাসমল আন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে কর না দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আন্দোলন সব থেকে বেশী দানা বাঁধল কাঁথি সহরে। গান্ধীজীর অনুশাসন না মানলেও শাসমলের নেতৃত্বে আন্দোলন সফলতা লাভ করল। গান্ধ জী লিখে পাঠালেন, "Your success justifies your revolt". এই সময় তিনি নিজেই আসেন মেদিনীপুরে। সঙ্গে দেশবন্ধু ও মৌলানা আজাদ। কলেজ ময়দানে মিটিং হয়।

গান্ধীজী আবার আসেন ১৯২৫ সালে। খড়্গপুর, কাঁথি ও মেদিনীপুর সহরের নানা জায়গায় সভা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মেদিনীপুরে মেয়েদের আন্দোলন ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ।

৬. স্বাধীনতার আগে দুই দশক :

> "Let two hundred youngmen organise a secret band in each district. Let them rise in a preconcerted movement, chop the head of the English rogues."
>
> —A leaflet

বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স নামে একটি সংগঠন তৈরি করলেন সুভাষচন্দ্র। কলকাতায় মূল কেন্দ্র। মেদিনীপুরেও তার শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হল। স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ভেতর থেকে। পরবর্তীকালে এই জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তাতে বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স বা বি. ভি.-র অবদান কম নয়। সুভাষ নিজে এলেন মেদিনীপুরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। ছেলেরা সৈনিকের পোষাক পরে রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করল। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভেতর উচ্চারিত হল শপথ মন্ত্র :

সৈনিকের জীবন হোক আমার জীবন
সৈনিকের মৃত্যু হোক আমার মরণ।

উনিশশো তিরিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। এই আন্দোলনের কার্যক্রম ঠিক করার ভার পড়ল গান্ধীজীর ওপর। এ বছরই মার্চ মাসে তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে ডাণ্ডির দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ৭৯ জন অনুচর। পথ প্রায় দুশো মাইল।

সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। মেদিনীপুরেও আছড়ে পড়ল তার ঢেউ। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাঁকুড়া থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবক গেলেন কাঁথি। সমুদ্রের কাছে কাঁথির কুড়িটি গ্রামে আইন ভেঙে লবণ তৈরি সুরু হল। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আগেই এসেছিলেন। কাঁথি থেকে ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ও হাজার হাজার জনতা শোভাযাত্রা করে পিছাবনীতে হাজির হলেন। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। পুলিশও নিশ্চেষ্ট ছিল না লবণের পাত্র ভাঙল, গ্রেপ্তার করল নেতাদের। জরিমানা ও সশ্রম কারাবাস নির্দিষ্ট হল। মেদিনীপুর শহরে সব রকমের সভাসমিতি ও শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ হল।

তমলুকে গঠিত হল আইন অমান্ত আন্দোলন পরিচালনা সমিতি। নরঘাটে দুশো মহিলা সহ প্রায় আট হাজার মানুষের একটি বিরাট মিছিল বের হল। এরই সাথে চলল চৌকিদারী ট্যাকস বন্ধের ঘোষণা।

স্থানীয় প্রশাসন মরিয়া হয়ে উঠল। তখনকার বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেনটিস সাহেব বললেন, মেদিনীপুরে বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত। এরা সুরু করেছিল লবণ দিয়ে, পরে পুলিশের ওপর আক্রমণ, হত্যা, পুলিশের ঘর পোড়ান—এসবও চলছে। এর সাথে আছে চৌকিদার বর্জন ও ট্যাক্স্ বন্ধের প্রচার।

আসলে জনগণের স্বতঃফূর্ত যোগদানে আন্দোলন এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, পুলিশ ও প্রশাসন তার সাথে এঁটে উঠতে পারছিল না। ফলে তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে চলল।

ধানের গোলায় আগুন দেওয়া, মেয়েদের মারধোর, লাঠি ও গুলিচালান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পটাশপুরে গুলি চালনার ফলে মারা গেল দুজন। প্রতাপদীঘির কাছে একটি গ্রামে শাঁখা তৈরির কারখানা ভেঙে তছনছ করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। পিংলা থানার ভীম জানার বাড়ীতে চড়াও হল পুলিশ। তাঁর স্ত্রী তখন অন্তঃস্বত্তা। তবু রেহাই দিল না, মারধোর করল। শাঁখ বাজাতে জুটে গেল প্রায় হাজার খানেক লোক। পুলিশ ভয় পেয়ে লাঠি চালাল, শেষে গুলি। নিহত হল দশজন, আহতের সংখ্যা ছাব্বিশ।

আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করল দাসপুর থানার চেচুয়াহাটে। দারোগা ভোলানাথ ঘোষ, সহকারী অনিরুদ্ধ বীরবিক্রমে সত্যাগ্রহীদের ওপর নির্যাতন চালাতে সুরু করল। প্রথম দিকে মুখ বুঁজে সহ্য করল সত্যাগ্রহীরা। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ খসে পড়ল। সাতশো মানুষের এক বিরাট জনতা তাড়া করল তাদের। ছুটে গিয়ে দু'জন আশ্রয় নিল দোকানের ভেতরে। জনতা তখন ক্ষিপ্ত। দোকানের ভেতর থেকে তাদের বের করল টেনে। দারোগার ওপর যে ব্যাপক আক্রমণ হল তাতে সে সেখানেই মারা গেল। অনিরুদ্ধের আর হদিস পাওয়া গেল না।

এরপর প্রতিটি গ্রামে, গৃহস্থের বাড়ীতে যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চলল তা অবর্ণনীয়। সারা ভারত সে বিবরণ শুনে শিউরে উঠল। নেহরু বললেন, "Among the many places which have provided martyers for the cause of Indian freedom, Midnapore district occupies an honourable position." আরও বললেন, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেয়েরা উপস্থিত করেছেন আমরা তা ভুলতে পারি না। মেদিনীপুরে যা ঘটে গেছে তাও স্মৃতি থেকে মুছে যাবার নয়।

জেলাব্যাপী অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নায়ক ছিলেন জেমস্ পেডি—প্রাক্তন সৈনিক, সি. আই. ই, তৎকালীন জেলাশাসক। ইংরেজরা যে সব লৌহদৃঢ় সিভিলিয়ানদের জন্য গৌরব বোধ করত, তিনি তাঁদের অন্যতম। বি. ভি.-র মেদিনীপুর শাখা সিদ্ধান্ত নিল, পেডিকে রেহাই দাও। রামকৃষ্ণ রায় এগিয়ে এলেন। যুবক, বয়স মাত্র বাইশ। বললেন, আমি একাই ওকে শেষ করব। মরব দেশের জন্য।

খড়্গপুর থেকে ট্রেনে মেদিনীপুরে ফিরেছিলেন পেডি। ট্রেনের কামরা বন্ধ, সশস্ত্র পাহারা। রামকৃষ্ণ তবু মরিয়া। ফণি কুণ্ডু তাকে বাধা দিলেন। আশাভঙ্গের বেদনায় কেঁদে ভাসালেন রামকৃষ্ণ।

পেডির মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সে সিদ্ধান্তের নড়চড় নেই। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ এল সাতই এপ্রিল, ১৯৩১ সাল[৯]। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রদর্শনী হচ্ছিল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করার কথা ছিল পেডি সাহেবের। তিনি এলেন না। এদিকে গোছগাছ সারা, বিপ্লবীরা মর্মাহত। পেডি এলেন সাত তারিখে। তখন অন্ধকার। দুটি হ্যারিকেন মিটমিট করে জ্বলছে। ফণি কুণ্ডু খবর দিলেন। এলেন বিমল দাসগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ। পকেটে রিভলবার ও পটাসিয়াম সায়নাইড। ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন পেডি। এক নম্বর ঘর থেকে দু'নম্বর ঘরে এলেন। দেওয়ালে টাঙান ছবি দেখতে ঝুঁকে পড়লেন। হঠাৎ গুলি ছুটল, পর পর অনেক, দেহে, পরিচ্ছদে পাঁচটি গুলির সন্ধান মিলল। পেডি চীৎকার করে উঠলেন, এত বড় একটা মারাত্মক বিপ্লবী দল এখানে আছে! পুলিশ কোন খবরই রাখে না। পরদিন তাঁর মৃত্যু হল।

বিমল দাসগুপ্তের নাম ছড়িয়ে পড়ল সেদিনই। বিহারের মানুষ, রঘু গোপ নামে একজন গোয়ালা বিমলকে ঘাঘরা পরাল, পায়ে মোটা বালা, ঘোমটার আড়ালে ঢেকে নতুন বৌকে নিয়ে সে চলে গেল কলকাতায়।[১০] অবিরাম ধরপাকড় সুরু হল মেদিনীপুরে। মামলাও রুজু হল বিমল দাসগুপ্তের নামে।

৯. সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই, বাংলার ইতিহাস, আধুনিকযুগ ৪র্থ খণ্ডে (মুক্তিসংগ্রাম) তারিখটি উল্লেখিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল।

১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর : বঙ্কিম পাল।

দেবেন্দ্রলাল খাঁন অনেক আগেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁর চেষ্টায় ও প্রভাবে বিমলের প্রাণ বাঁচল। জ্যোতিজীবনের নাম জানাজানি না হওয়ায় রয়ে গেলেন নেপথ্যে।

এই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে হিজলীর বন্দী শিবিরে এক মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটল। খড়্গপুর স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয় হিজলী। সেখানেই ছিল বন্দী শিবির। সাধারণতঃ রাজনৈতিক বন্দীরাই থাকতেন এখানে। খাওয়া দাওয়া, অসদাচরণ ইত্যাদি নিয়ে অনেকদিন থেকেই বন্দীদের ভেতর অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। একজন বন্দীর স্থানান্তর যাওয়া নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটল।[১১] কথা কাটাকাটির অজুহাত তুলে প্রহরীরা লাঠি, ব্যাটন ও শেষ পর্যন্ত গুলি চালাল। সাথে সাথে মারা গেলেন দুজন—সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। আহত হলেন বাইশজন। নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর এই অমানুষিক আচরণে সারা বাংলাব্যাপী তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল মনুমেণ্ট ময়দানে। তাতে সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রচিত হল তাঁর বিখ্যাত কবিতা, যাতে বললেন,—

'আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট-রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে ;
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আজ এই মুহূর্তে একটিমাত্র কামনা বুক ছিঁড়ে উঠে আসছে, অজস্র শহীদের শোণিত সাক্ষ্যে তৈরি হোক স্বাধীনতার সৌধ'।

পক্ষকাল কাটল না, বিমলের আবির্ভাব ঘটল কলকাতায়। এবার লক্ষ্য ভিলিয়ার্স, ইউরোপীয় 'বণিক সমিতির' সভাপতি। স্থান গিলিণ্ডার্স হাউস, দুর্গের মত সুরক্ষিত বাড়ি। দুই হাতে রিভলবার নিয়ে বিমল ঘরে ঢুকলেন। আরো অনেক ইউরোপিয়ানের সাথে বসেছিলেন ভিলিয়ার্স। গুলি ছুটতেই চকিতে টেবিলের নিচে চলে গেলেন। যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের ভেতর একজন বিমলকে লক্ষ্য করে চেয়ার ছুঁড়ে মারলেন। বিমল পড়ে গেলেন। সাথে সাথে সবাই এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মামলা উঠল আদালতে। রায় হল দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

১১. স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম : গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য।

পেডির জায়গায় যিনি মেদিনীপুরের জেলা শাসক হয়ে এলেন, তাঁর নাম আর. ডগলাস্, আই. সি. এস.। সেদিন ছিল তিরিশে এপরিল। পেডি নিধনের ঠিক এক বছর পরে আর এক এপরিল। জেলা বোর্ডে মিটিং ডগলাস সে মিটিংয়ের সভাপতি। বেশ চলছিল সভা। তখন বিকেল পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বিকেলের রোদ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়েছিল। রক্তের মত লাল আভা। সহসা দু'জন বিপ্লবী এসে দাঁড়ালেন। ডগলাসের চেয়ারের একেবারে চার-পাঁচ ফুটের ভেতর। একজন কিশোর, মুখের ওপর সবে গোঁফের কালো রেখা দেখা দিয়েছে। নাম প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। অপরজন যুবক, বলিষ্ঠ শরীর, মুখে ফৌজী গোঁফ। দেখলেই বোঝা যায় আঠা দিয়ে লাগান। হাতে রিভলবার, নাম প্রভাংশু পাল। প্রদ্যোতের রিভলবারের বারুদ ছিল ভিজে। বার বার ট্রিগার চেপেও সেটা দিয়ে আগুন বেরুল না। প্রভাংশুর রিভলবার গর্জে চলল। সাতটি ক্ষত হল ডগলাসের দেহে। সেখানেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

কাজ শেষ করে পালালেন দুজনেই। কিছুদূরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলেন প্রদ্যোৎ। ধরা পড়ে গেলেন। পকেটে এক টুকরো চিরকুট পাওয়া গেল, তাতে লেখা—'হিজলী অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ; ইহাদের মরণেতে বৃটেন জানুক, আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক। বন্দে মাতরম।'

প্রভাংশু পাল ধরা পড়লেন কলকাতায়। কিন্তু পরে ছাড়া পেলেন, কারণ কেউ তাকে সনাক্ত করতে পারল না। মামলা রুজু করা হল। গ্রেপ্তার হলেন বাইশ জন। দেবেন্দ্রলাল খাঁ, কিশোরীপতি রায়, অতুলচন্দ্র বসু এবং প্রবোধনাথ দাসের ওপর নির্দেশ হল তাঁরা তাঁদের বসত বাড়ি খালি করে দেবেন। সেখানে চৌকি বসবে পুলিশের। মামলায় ফাঁসির হুকুম হল প্রদ্যোতের। তেত্রিশ সালের বারোই জানুয়ারী মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ভেতরে ফাঁসি হল।

ডগলাসের মৃত্যুর পর প্রশাসন বিদ্রোহীদের দমনে তৎপর হয়ে উঠল। বেড়ে চলল পুলিশের অত্যাচার। নির্দেশ দেওয়া হল ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালের ভেতর যে সব ছাত্র হিন্দু স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে তারা সরকারি চাকরি পাবে না।

মিঃ জে. ই. জে. বার্জ তখন জেলা শাসক। প্রদ্যোতের ফাঁসির সময় তিনি হাজির ছিলেন। মঞ্চে ওঠার আগে জিগ্যেস করলেন, 'প্রদ্যোৎ, তুমি প্রস্তুত?'

শান্তভাবে প্রদ্যোৎ বললেন, 'এক মিনিট, মিঃ বার্জ। কয়েকটা কথা বলব।'

'বেশ বলো', অনুমতি দিলেন বার্জ।

প্রদ্যোৎ বললেন, 'কোন ইউরোপীয়ানকে আমরা মেদিনীপুরে থাকতে দেব না, এই আমাদের সংকল্প। এবার তোমার পালা। তৈরি হও।' [১২]

আশ্চর্য। এই ভবিষ্যৎ বাণী বছর ঘুরতেই সত্য হল। তেত্রিশের এপরিলেই ধার্য ছিল দিন। কিন্তু ভয়ংকর এপরিল মেদিনীপুরের ইউরোপীয়ানদের কাছে হয়ে উঠেছিল বিভীষিকা। দুটি হত্যাকাণ্ড এই মাসেই ঘটে গিয়েছিল। ফলে এই মাসকে কেন্দ্র করে দেখা দিল সংস্কার। বার্জ বেরুতেন কম। বিপ্লবীদের একাধিক প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।

শেষে দোসরা সেপ্টেম্বর সুযোগ এল। পুলিশ গ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলা, একদিকে মহম্মদিয়া (মোহনবাগান) ক্লাব, অন্যদিকে টাউন ক্লাব। কয়েকজন অফিসারের সাথে বার্জও খেলবেন। প্রায় সওয়া পাঁচটার কাছাকাছি তাঁর গাড়ি এসে থামল মাঠে। কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিলেন অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত। অনাথ শান্ত, ধীর, স্বল্পবাক্, বয়স মাত্র বাইশ। মৃগেনের বয়স আরো কম, আঠারো তখনও পার হয়নি। দুজন দুদিকে, মাঝখানে বার্জ।[১৩] দুদিক থেকে পর পর গুলি চলল, ফলে প্রহরীরা প্রথমে কিছুই করতে পারল না। ধাতস্থ হয়ে তারাও গুলি ছুঁড়তে সুরু করল। তার আগেই বার্জ লুটিয়ে পড়েছিলেন। প্রহরীর গুলিতে অনাথও লুটিয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই মৃগেনও গুলিতে নিহত হলেন। সারা মাঠে নেমে এল মৃত্যুর স্তব্ধতা।

কলকাতায় সাহেবদের মূলকেন্দ্র ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশন খবর শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দাবী জানাল 'মেদিনীপুরকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ'। কিন্তু জেলার ভার নেবার জন্য লোক পাওয়া যায় না। শেষে গ্রিফিথ নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলেন জেলাশাসক হয়ে। প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল প্রশাসন। পুলিশে কুলোল না। সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল মেদিনীপুরকে জব্দ করার কাজ। সে কাজ এত সুষ্ঠুভাবে চলল যে কিছুদিনের ভেতরেই শহরটি চেহারা নিল শ্মশানের। মেয়েদের শালীনতা গেল, গৃহস্থের ঘুম ছুটল, কারফিউ জারী করে বেঁধে দেওয়া হ'ল অধিবাসীদের গতিবিধি। শহর

১২. স্বাধীনতার রক্তক্ষরী সংগ্রাম : গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য।

১৩ শহিদ রক্তে সিক্ত মেদিনীপুর : মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি।

ছেড়ে পালাতে সুরু করল মানুষ। এই দুর্বিষহ অত্যাচারের চাপে কিছুদিনের মত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ স্থগিত থাকল।

বার্জ-হত্যা কেন্দ্র করে যে মামলা রুজু হল তাতে ফাঁসিতে গেলেন ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষ। এঁদের সকলেরই বয়স আঠারো থেকে বাইশের ভেতর।

এর পর ন'টি বছর ধরে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা স্রোত বয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সুরু হল। ইংরেজ সরকারের সুমতির আশায় দিন গুনতে গুনতে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীও হতাশ হয়ে পড়লেন।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন বসল ১৪ই জুলাই ১৯৪২ সালে। দাবি উঠল, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন এই মুহূর্তে শেষ হোক।' গান্ধীজী বললেন, 'আপোষরফার আর কোন স্থান নেই। আর একবার সুযোগ দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। আন্দোলন যাতে সংযত থাকে সেজন্যে সব রকম চেষ্টা করব, কিন্তু তা যদি ব্রিটিশ সরকার বা মিলিত শক্তির ওপর কোন রেখাপাত না ঘটায় তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতেও আমি দ্বিধাবোধ করব না।'

বোম্বাইতেই সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল আগস্টে। প্রস্তাব নেওয়া হল, 'এর পর থেকে প্রতিটি নরনারী স্বাধীন বলে নিজেকে ভাবতে সুরু করবে। ...পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হবনা। ..সিদ্ধি অথবা মৃত্যু। হয় আমরা ভারত স্বাধীন করব অথবা এই প্রচেষ্টায় জীবন দান করব।'

আটই আগস্ট অধিবেশন শেষ হল। পরদিন সকালেই গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। কিন্তু নেতার অভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকল না।—জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে অহিংস ও সহিংস দুইভাবেই তা এত ব্যাপক আকার ধারণ করল যে বাংলাদেশে এতবড় আন্দোলন এর আগে আর কখনও হয়নি। মেদিনীপুরই হল বিশেষত এর প্রাণকেন্দ্র।

১৯৪১ সালে যেদিন জাপান বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল তখন থেকেই জেলার অধিবাসীদের ওপর নানা রকম জুলুম চলে আসছিল। সমস্ত জেলা বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে আপৎকালীন জরুরী অবস্থা চালু করা হয়েছিল। এ অঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নৌকা ও জলযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বেশীর ভাগ নৌকা নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া চলাচল করতে পারত না। চরম নিষ্ঠুরতার সাথে প্রতিপালিত হয়ে চলেছিল এই নির্দেশ। নির্দেশ

অমান্য করায় বহু মাঝি প্রহৃত হল, পুড়িয়ে দেওয়া হল বহু নৌকা ; এমনকি মাঝিদের ঘরবাড়িও নিষ্ঠুরতার কবল থেকে রেহাই পেল না। অভ্যন্তরীণ আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়তে সুরু করেছিল। মুখ বুজে ফুঁসছিল সাধারণ মানুষ।[১৪] এমনকি দু'চাকার সাইকেলও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল কয়েক হাজার। বাসের সংখ্যা কমিয়ে নামে মাত্র কয়েকখানা চলছিল শুধু রীতি রক্ষার জন্য।

এছাড়া ছিল ধানচালের রপ্তানী। তমলুক মহকুমার নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা ছিল সে বছর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে তারা ধানচাল চালানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। নিষ্ফল আবেদনও করেছিলেন জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে। এই ধানচাল চালানের ঘটনা কেন্দ্র করেই বিক্ষোভের প্রথম সূত্রপাত ঘটল। মহিষাদল থানায় দানীপুর গ্রাম। সেদিন ছিল সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখ (১৯৪২)। একজন পুলিশ অফিসার জনাকয়েক কনস্টেবল সাথে নিয়ে গেলেন দানীপুর রাইস মিলে। চালের চালান যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেটা দেখাই উদ্দেশ্য। খবর পেয়ে আড়াই হাজার লোক আচমকা সমবেত হলেন। বাধা দিলেন চাল পাচারের প্রচেষ্টায়। নেতা ছিলেন না, ছিলেন না স্বেচ্ছাসেবক। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ উপেক্ষা করা সহজ নয়। গুলি চালাল পুলিশ। তাতে নিহত হলেন তিনজন, আহতের সংখ্যাও কম নয়। মৃতদেহগুলি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

এরপরেই সাতাশে সেপ্টেম্বর এক সভায় ঠিক হল : একসাথে থানা, আদালত ও কয়েকটি সরকারি অফিস আক্রমণ করা হবে। বড় বড় গাছ কেটে বেরিকেড তোলা হল রাস্তায়,কালভার্টগুলো উড়িয়ে দেওয়া হল, টেলিগ্রাফ ওটেলিফোনের তার কাটা হল সাতাশটি, ১৯৪টি টেলিগ্রাফের থাম উপড়ে ফেলা হল। কুড়ি হাজার মানুষ একযোগে থানার দিকে শোভাযাত্রা করলেন। মিঃ সেখ, আই. সি. এস. তখন তমলুকের মহকুমা শাসক। লাঠি চার্জ করতে কনস্টেবলদের হুকুম দিলেন। কিন্তু কেউ এক পাও নড়ল না। অগত্যা দলবল নিয়ে মহিষাদল থানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন—থানার কর্তারা।

আন্দোলন তীব্রতর হল ঊনত্রিশে। প্রায় এক লক্ষ মানুষ যোগ দিলেন আন্দোলনে। হিন্দু, মুসলমান, নারী, শিশু সকলেই অংশীদার। তমলুক

১৪. **August Revolution : Two years National Government, Midnapore, Part I, Satish Chandra Samanta & Others,**

শহরের বিভিন্ন পথে পাঁচটি শোভাযাত্রা বের হল। পশ্চিমের পথে বিপ্লবী ছিলেন আট হাজার। থানার কাছাকাছি আসতে পুলিশ অফিসার লাঠিচার্জ করতে হুকুম দিলেন। মিছিল তা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল। তখন গুলি ছুটল। পাঁচজন পড়ে গেলেন মাটিতে, নিহত হলেন একজন। বিপ্লবীরা তবু থানার ভেতর ছুটে গেলেন। এরই ভেতর রামচন্দ্র জানা পুলিশের হাত ছাড়িয়ে কখন থানার বাইরের দরজায় এসে পড়েছিলেন। বুলেটের আঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত শরীর। তবু বিজয়ের আনন্দে মুখ উদ্ভাসিত। চীৎকার করে বলে উঠলেন, এই যে আমি থানা দখল করেছি। সাথে সাথে তাঁর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উত্তর দিক থেকে যে শোভাযাত্রা এসেছিল তার নেত্রী মাতঙ্গিনী হাজরা। বয়স ৭৩ বছর। তবু পদক্ষেপ দৃঢ়, সঙ্কল্প অটুট হৃদয়, হাতে জাতীয় পতাকা। পুলিশের মুখোমুখি হতেই তারা গুলি চালাল—দুই হাতে গুলি লাগল মাতঙ্গিনীর। জাতীয় পতাকা অবনমিত হল না। চীৎকার করে পুলিশকে বললেন, ছেড়ে দাও নোকরী। যোগ দাও এই আন্দোলনে। উত্তর এল বুলেট, বিদীর্ণ করে দিল ললাট। পড়ে গেলেন বৃদ্ধা, প্রাণহীন দেহ ধুলো-রক্তে মাখামাখি। তবু দৃঢ়মুষ্টিতে জাতীয় পতাকা তখনও উড়ছে অমলীন। একজন সৈনিক ছুটে এসে লাথি মেরে সেটা মাটিতে ফেলে দিল।[১৫]

মাতঙ্গিনী ছাড়াও আরও চারটি মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হল। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩) পুরীমাধব প্রামাণিক (১৪), নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরা।

দক্ষিণ দিক থেকে যে শোভাযাত্রা এসেছিল তাতে নিহত হলেন নিরঞ্জন জানা (১৭)। আহত পূর্ণচন্দ্র মাইতি (২২)—'তিনিও দুদিন পরে হাসপাতালে মারা গেলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থেকে যে শোভাযাত্রা এসেছিল, তাকে দেখে পুলিশ অফিসার বলে উঠল, তোমাদের ভেতর যাদের বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়াবার সাহস আছে, মরতে চাও, তারাই শুধু এগিয়ে এসো। গোটা মিছিল এগিয়ে গেল। গ্রেপ্তার হল অনেকে, লাঠি চলল; একজন নারী সহ সাতজন ছাড়া সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

মহিষাদলে তিনটি মিছিল তিন দিক থেকে থানার দিকে এগুলো। পরে তিনটিই একত্রিত হয়ে একসাথে চলল। পঁচিশ হাজার শোভাযাত্রী। মিছিলের পরিচালনা ছিল বিদ্যুৎবাহিনীর হাতে। তিনবার আক্রান্ত হল থানা। গুলি

১৫. August Revolution etc.—Samanta.

চলল একাধিকবার। তাতে নিহত হলেন তিনজন, আহত আঠারো। থানার মেজ দারোগার বাসস্থান পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানাতেও চলল অনুরূপ শোভাযাত্রা। সেখানেও গুলি ও লাঠি চলল। কাঁথি মহকুমায় সংগৃহীত হলেন আট হাজার সেচ্ছাসেবক। শিবির স্থাপিত হল প্রতিটি ইউনিয়নে। উদ্দেশ্য, আন্দোলনের তরঙ্গ প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দেওয়া। বিশে সেপ্টেম্বর পিছাবণীতে এগারো জন সেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হলেন। কাঁথির আন্দোলনও তমলুকের মত তীব্র আকার ধারণ করল। তমলুকে বিপ্লবীরা এক সর্বাঙ্গীন শাসনপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার মেয়াদ ছিল ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে ৮ই আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত। এই স্বাধীন সরকারের প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত।

দু'টি মহকুমাকেই ঠাণ্ডা করার ভার ছেড়ে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর ওপর। তাদের অত্যাচার সভ্যজগতের সমস্ত নিয়ম কানুন নস্যাৎ করে দিল। নেতাদের ঘর পোড়ান, স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর দৈহিক অত্যাচার, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণ, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া—সবই চলল নিষ্ঠুর ও ব্যাপকভাবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন।

এই বছরই ১৬ই অক্টোবর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যে ক্ষয়ক্ষতি হ'ল তা অবর্ণনীয়। সরকারি নিয়ম ঔদাসীন্য মানুষের জীবন ধারণের ন্যূনতম দাবীটুকুও উপেক্ষা করল।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার শাসন ব্যবস্থার যে সুষ্ঠু পদ্ধতি চালু করেছিলেন, তাতে শাসন পরিচালনার সব ক'টি শাখাই বিদ্যমান ছিল। দলকে সতর্ক করা বা আদেশ দেবার সংকেত (signal), শত্রুপক্ষকে ঘেরাও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করার কৌশল, আহতদের সেবা, ডাক্তার নার্স, সংবাদ প্রেরণ ও সংগ্রহ—সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। এ ছাড়া ছিল বিচার, শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও প্রচার, ডাক, কারা প্রভৃতি আলাদা আলাদা বিভাগ। এসব বিভাগের কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য মন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বিয়াল্লিশে মেদিনীপুরের আগস্ট আন্দোলনকে এক কথায় গণবিদ্রোহ বলা চলে। কারণ এতে জেলাব্যাপী সব শ্রেণীর নরনারীই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চ. নকশাল আন্দোলন[১৬] গোপীবল্লভপুর, ডেবরা :

স্বাধীনতার পরে মেদিনীপুর আর একবার ভারতের বড় বড় দৈনিকগুলির শিরোনাম অধিকার করে নিল। বিশেষত ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। দু'বছর আগে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল, পশ্চিমবাংলার অনেকগুলি জেলা ছাড়া ভারতের কয়েকটি প্রদেশেও তা দাবানলের সৃষ্টি করেছিল। ভারতে আর কোন রাজনৈতিক দল ইতিপূর্বে এত কম সময়ের ভেতর (মাত্র পাঁচ বছর) এত কৌতূহল, উত্তেজনা ও বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি।[১৭] এই আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলের (সি. পি. আই.-এম.এল.) প্রথম প্রবক্তা ও নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। মার্ক্স-লেনিন-মাও সে-তুঙ অনুসৃত পথে ভারতে এক সশস্ত্র গণবিদ্রোহ গড়ে তোলাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্র ও উৎস অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

পশ্চিমবাংলায় নকশালদের মতে শ্রেণীশত্রু নিধনের কাজ প্রথম শুরু হয় ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে, ধরমপুর গ্রামে। মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভপুর থানার ভেতর এই গ্রাম।[১৮] পরিকল্পিত ভাবে ডেবরা গোপীবল্লভপুরে 'বেস এরিয়া' বা ঘাঁটি এলাকা তৈরি করাই ছিল নিধনকার্যের লক্ষ্য। নকশালবাড়িতে ভূমি দখলের ভেতর দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এতদিনে তা আরও বৃহত্তর পটভূমি ও লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছিল। মজুমদার মনে করতেন শ্রেণীশত্রু নিধনের মধ্যে যে ত্রাসের সৃষ্টি হবে তাতে একদল সামিল হবেন আন্দোলনে, অবশিষ্টেরা এলাকা ছেড়ে পালাবেন। ফলে প্রস্তুত হবে ঘাঁটি এলাকার ক্ষেত্র। গোপীবল্লভপুরে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব ছিল পশ্চিমবাংলা-বিহার-উড়িষ্যার আঞ্চলিক সমিতির ওপর। এই সীমান্ত অঞ্চলে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সহজসাধ্য ছিল।

সীমান্ত আঞ্চলিক সমিতির সম্পাদক ছিলেন অসীম চ্যাটার্জী,—প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রনেতা। গোপীবল্লভপুরে তাঁর সহকারী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র সন্তোষ রাণা ও তাঁর ভাই মিহির রাণা। অসীম ও

১৬. নকশাল আন্দোলনের বিশদ বিবরণের জন্য 'দার্জিলিং' ও 'বীরভূম' দ্রষ্টব্য।

১৭. The Naxalite Movement : Sankar Ghosh ; Firma K L M Pvt. Ltd.

১৮. Ibid.

সন্তোষ উভয়কেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'অভিযুক্ত' বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং এঁদের প্রত্যেকের জন্য গ্রেপ্তারের মূল্য ধার্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা।

ডেবরায় সংগ্রাম পরিচালনার ভার ছিল গুণধর মুর্মুর ওপর। সি.পি.আই. (এম)-এর প্রাক্তন কর্মী মুর্মু গ্রেপ্তার হন ১৯৭০ সালে। গোপীবল্লভপুরে সংগ্রামের প্রথম উদ্যোগ নেন কলকাতার একদল ছাত্র। এই আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ ছিল কৃষকদের সাথে একাত্মতা ও তাদের কাছে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এ বিষয়ে মজুমদারের নির্দেশ ছিল: (১) গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের সাথে বসবাসের প্রচেষ্টা ; (২) তাদের মত খাওয়াদাওয়া ও স্বেচ্ছায় তাদের দেওয়া জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ না করা ; (৩) গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের শ্রমে অংশ নেওয়া ; (৪) যতদূর সম্ভব কাছাকাছি সহর, বড রাস্তা ও দোকানগুলি এড়িয়ে চলা। টাকাকড়ি সাথে থাকবে কম। থাকলেই চাষিদের ওপর নির্ভর করার বদলে নিজের অর্থের ওপর নির্ভর করার প্রবণতা বাড়বে।

প্রথম পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রচার ছিল মূল কাজ। গোপীবল্লভপুর এলাকায় সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের ঐতিহ্য আগেও ছিল। কিন্তু ডেবরা এপথে একেবারে নতুন। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ছিল গেরিলা যুদ্ধ ও শ্রেণীশত্রু নিধনের মাধ্যমে সংগঠন গড়ে তোলা। "দেশব্রতী"র (২৩ এপ্রিল, ১৯৭০) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে বাইশজন শ্রেণীশত্রু নিহত হয়েছিল ডেবরা ও গোপীবল্লভপুরে। এ বছরই ধানকাটার মরশুমে ধান বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়। ছোট, মাঝারি ও সহানুভূতিশীল বড জোতদারেরা এই অভিযানের আওতা থেকে বাইরে থাকেন। ৪০,০০০ কৃষক এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নকশালবাড়িতে সরকারী প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঢিলেঢালা ছিল। কিন্তু গোপীবল্লভপুর-ডেবরায় প্রথম থেকেই কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করার কাজ হাতে নেন সরকার। ইস্টার্ন ফ্রনটিয়ার রাইফেলস্‌এর একটি বিরাট শিবির গড়ে ওঠে খড়্গপুরে। উপদ্রুত এলাকার নানা জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বা চৌকি বসান হয়। কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমনের কাজ চলতে থাকে। চারু মজুমদারের সাথে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় অসীম চ্যাটার্জী ও সন্তোষ রাণার। তার ভেতর রাজনৈতিক প্রচারের চেয়ে শ্রেণীশত্রু নিধনের ওপর বেশী জোর দেওয়া অন্যতম। মজুমদার গোপীবল্লভপুর ঘুরে যাবার পর যে চার দফা কার্যসূচী নির্ধারণ করেন তাতে শ্রেণীশত্রু নিধন সব থেকে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল।

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই মজুমদার পূর্ব কলকাতার এক বাড়িতে ধরা পড়েন। এই মাসেরই শেষ দিকে কলকাতার একটি হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মারা যাবার আগেই নবগঠিত দলটিতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শুধু পশ্চিমবাংলাতেই প্রায় ১৬, ০০০ কর্মী গ্রেপ্তার হন, অন্তর্দলীয় সংঘাতে মারা যান কয়েকশত। নেতাদের বেশীরভাগই জেলে, কেউ কেউ পলাতক। নীতিগত মতান্তরের ফলে দলের ভেতরেও উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। অসীম চ্যাটার্জী ও সন্তোষ রাণাও ধরা পড়েন। সশস্ত্র গণবিদ্রোহের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ব্যাপক অভ্যুত্থানের একটি অধ্যায়ের এই ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

জনজীবন

কী ফুলে সেবা লায়া কী ফুলে সেবা
শালোই ফুলে লায়া পারুল লবা ॥[১]

ক. জনবিন্যাস

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে যেমন জেলাকে দুটি মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়, জনজীবনও তেমনি ভূ-প্রকৃতির সাথে তাল রেখে দু'টি মোটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমির ঢালু সানুদেশ ও উড়িষ্যার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের প্রান্তসীমা। ভূভাগ উঁচু-নিচু, বন্ধুর। অধিবাসীরা বেশীরভাগ উপজাতি ও তফসীল ভুক্ত সম্প্রদায়। ভড, ভূমিজ, গোণ্ড, খেড়িয়া, লোধা, খারওয়ার, কোল, নাট, পুরাও, শবর, সাঁওতাল এবং ধাঙড বা ওরাওঁ।[২] শারীরিক গঠন, আকৃতি, গায়ের রঙ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবন যাপনের ধারা, আচার, ধর্মীয় উৎসব—সবই পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের পলিগঠিত সমভূমির অধিবাসীদের থেকে এদের আলাদা। জনবসতিও ছাড়া ছাড়া।

পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের মাটি পলিগঠিত, উর্বর ও কৃষিযোগ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত। ঘন জনবসতি। চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, পাঁশকুড়া, তমলুক, ডেবরা, পটাশপুর, সবং থানাগুলি জনবহুল। বর্ণহিন্দু ও মুসলমান এখানে সংখ্যায় বেশী।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলায় লোকগণনা হয় ১৮৭২ সালে। তার আগেও ছাড়া ছাড়া ও আংশিকভাবে চেষ্টা হয় লোক গণনার। প্রথম চেষ্টা চালান এইচ স্ট্রেচী ; সময় ১৮০২ সাল। গণনা হয় আংশিক। তবু আঁচ করা যায় গড়পড়তা মোট জনসংখ্যা। তখন হিজলী ও দক্ষিণ দিকের কিছু অঞ্চল মেদিনীপুর জেলার বাইরে ছিল। সেসব বাদ দিলে লোকসংখ্যা ছিল পনের লক্ষ।[৩]

১. মেদিনীপুর জেলা : ইতিহাস ও সংস্কৃতি। মেদিনীপুরের লোকসংগীত—অধ্যাপক সত্যেন বড়ংগী—

কোন ফুলে পুজো করবেন লায়া (পুরোহিত) ?
লায়া শাল ফুলে পুজো করবেন।

২. A Statistical Account of Bengal—Vol. III—W. W. Hunter

৩. District Census Hand Book, 1961 : Midnapore

পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের জনবসতি ঘন হলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষত প্রকোপ বেশী করে পড়ে ঘাটাল, দাসপুর, ভগবানপুর ও পটাশপুর থানা এলাকায়। ব্যাপারটি এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় যে, তৎকালীন ব্রিটীশ সরকারেরও নজর পড়ে। জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সৃষ্টি হয় ড্রেনেজ কমিটি (১৮৮৯)। আগে রাজা ও জমিদারেরা এদিকটা দেখা-শুনা করতেন। প্রয়োজন অনুসারে বাঁধ তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তাঁরা করতেন। ইংরেজ আমলে বহুদিন এদিকটা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০৩) এই কমিটি আবার চালু হয়। ফলে একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি সেচের সুবিধাও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ম্যালেরিয়া ছাড়া কলেরার মড়কও জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ ছিল। পুরী যাতায়াতের পথে তীর্থযাত্রীরা বয়ে আনতেন জীবাণু। অসাবধানতায় ছড়িয়ে পড়ে তা মহামারীর আকার ধারণ করত। উজাড় হয়ে যেত গ্রামের পর গ্রাম।

নদী-নালায় আকীর্ণ সমুদ্রের কাছাকাছি নিচু জমি বর্ষাকালে দীর্ঘদিন জল-মগ্ন হয়ে থাকত। জ্বর ছিল এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। অধিবাসীদের চেহারা ছিল জ্বরাক্রান্ত, শীর্ণ। সহজেই চোখে পড়ার মত। এমনকি এখানকার শিশুরাও যেন চেঁচিয়ে কান্নার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল।[৪] ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত ও বন্যা দুর্দৈবের মত নেমে আসত কখনও কখনও—দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দিয়ে যেত।

প্রাকৃতিক উপপ্লবের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল ইংরেজদের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি। ব্রিটেনের কল কারখানায় যেসব দ্রব্য উৎপাদিত হত, তার বাজার সংরক্ষণের জন্য ইংরেজরা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশজ শিল্পগুলিকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু সহর এইভাবে ক্রমশঃ দীন হয়ে পড়েছিল। জীবিকার তাগিদে এইসব অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে বহু পরিবার অন্যত্র শুরু করেছিল বসবাস।

স্বাধীনতার পরে জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়েছেন সরকার। মহামারীর প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে। ফলে লোকসংখ্যা এখন বাড়তির দিকে।

৪. District Census Hand Book, Midnapore (1951) ; Ed, A. Mitra, I. C. S.'

১৮৭২ সালের লোকগণনায় এ জেলার জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজারের কিছু বেশী। কয়েক বছরের ভেতর মহামারী ও বর্ধমান জ্বরে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক মারা যায়। পরবর্তী লোকগণনায় অবস্থা সামলে উঠলেও আগের সংখ্যায় তখনও পৌছুতে পারেনি।[৫]

পশ্চিমবাংলায় মোট জনবৃদ্ধি হারের তুলনায় এ জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। পশ্চিমবাংলার অন্যত্র যখন জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে, এখানে তার গতি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

বর্তমানে মেদিনীপুর সদর ও তমলুক মহকুমায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত লয়ে। ঝাড়গ্রাম ও কাঁথি মহকুমায় অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি। ঘাটাল মহকুমায় লোকসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল এতদিন। পঞ্চাশ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে; প্রধানত কৃষিপ্রধান ও অনুন্নত হ'বার ফলে, এ জেলায় সহরের সংখ্যা ছিল কম।

স্বাধীনতার আগে যে কয়েকটি পৌর সহর ছিল তাদের বেশীরভাগই ছিল ঘাটাল মহকুমায়। এবং ঘাটালের প্রায় সব কটি সহর ছিল ক্ষয়িষ্ণু। জেলা সহর মেদিনীপুর ও ঘাটালের সহরগুলি ছাড়া, আর সব সহরগুলিই ছিল গ্রাম্য এলাকার সমৃদ্ধ অঞ্চল। খড়্গপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ গড়ে ওঠার পর খড়্গপুরেই প্রথম কসমোপলিটন জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপিত হবার পর খড়্গপুর আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে হলদিয়া ও কোলাঘাট এ জাতীয় আরও দুটি সহর হিসাবে এ জেলায় গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার ঘনত্বে রাজ্যের তুলনায় এ জেলা অনেকখানি পিছিয়ে আছে। গ্রাম্য এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে ৭৮৭ জন, এ জেলায় ৭৭২। সহর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গ মাইলে ১২,৯৭৮, এ জেলায় মাত্র ৫,১১৯।[৬]

৫. ১৮৭২ সালের লোকগণনায় জনসংখ্যা ছিল ২৫,৪৫,১৭৯। পরে ১৮৮১ সালের জনসংখ্যা ছিল ২৫,১৭,৮০২।

৬. District Census Hand Book, Midnapore (1961), Ed., B Roy, W. B C. S.

খ. জেলা ছেড়ে যাওয়া, জেলায় আসা :

Midnapore importing a large number of brides than it exports".[৭]

যেখানে রুজি রোজগারের সংস্থান বেশী সেখানেই মানুষ এসে ভিড করেন জীবিকার প্রয়োজনে। আগন্তুক মানুষদের প্রকৃতি নির্ভর করে কি ধরনের কর্ম-সংস্থান লভ্য তার ওপর। উনিশ শতকের শেষ দিকে যেসব আগন্তুক এসেছেন তাদের ভেতর সাঁওতালরাই সংখ্যায় বেশী।[৮] দিন মজুরি করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় ড্রেনেজ কমিটি যখন ব্যাপক কার্যক্রম চালু করেন, তাতে কাজ পাবার আশায় আসতেন অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের আধিবাসীরা। তখন অধিকাংশ বহিরাগতদের এখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল না। পটাশপুর ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয়রা যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তা এর অনেক পূর্ববর্তী ঘটনা। তারও আগে, জেলার অনেকখানি অঞ্চল যখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, তখন উড়িষ্যাবাসীরাও এখানে তাদের স্থানীয় আবাস গড়ে তুলেছিলেন। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে পিতৃভূমির বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে মুছে ফেলে তারা এখানেই নতুন আচার ও সংস্কৃতির পত্তন করেছিলেন—যা বাংলা ও উড়িষ্যার জীবনধারা ও সংস্কৃতির যৌথ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল।

হাল আমলে যেসব রাজ্য থেকে বেশী সংখ্যায় মানুষ এ জেলায় আসেন তার ভেতর বিহার প্রধান। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা এ জেলায় বহিরাগতদের সংখ্যা মোট চুরাশি হাজার। এর ভেতর বিহার থেকে আসা অধিবাসীর সংখ্যা তিরিশ হাজার। বিহারের পর উড়িষ্যা ২৯,৪১৫, অন্ধ্রপ্রদেশ ৬,৫৫৫, উত্তরপ্রদেশ ৫,০৭২, মাদ্রাজ ৪,৮৯২, মধ্য-প্রদেশ ৩,২১৮, পাঞ্জাব থেকে এক হাজারের কিছু বেশী।[৯] একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া প্রায় সব রাজ্য থেকেই পুরুষদের তুলনায় নারীরা এসেছেন সংখ্যায় বেশী। জেলাগুলির ক্ষেত্রেও নারীদের অধিক সংখ্যায় আগমন খুবই সুস্পষ্ট।

৭. District Hand Book, Midnapore (1951), Ed., A. Mitra, I.C.S.

৮. A Statistical Account of Bengal, Vol. III—W. W. Hunter (1876)

৯. District Census Hnd Book, Midnapore (1961), Ed., B. Roy, W.B.C.S.

রাজ্যের ভেতর গমনাগমনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এ জেলা থেকে জীবিকার প্রয়োজনে সব থেকে বেশী মানুষ যান চব্বিশ পরগনায়। তারপরেই যথাক্রমে কলকাতা, হুগলী, বাঁকুড়া, হাওড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম ও নদীয়া। যেসব জেলা থেকে অধিবাসীরা এখানে আসেন তাদের ভেতর অগ্রগণ্য হাওড়া, বাঁকুড়া ও হুগলী। এ ছাড়া চব্বিশ পরগনা, কলকাতা ও বর্ধমান সহ অন্য জেলা-গুলিও আছে। তবে সেসব জেলায় যাওয়ার সংখ্যা বেশী নয়। পশ্চিমবাংলার নানা জেলা থেকে আগত মানুষের সংখ্যা এখন সাতাশি হাজার। উল্লেখ্য, মহিলাদের সংখ্যা এখানেও বেশী। এদের বেশীর ভাগই আসেন বিবাহসূত্রে।

রাজ্য ও জেলা মিলিয়ে মোট বহিরাগতের সংখ্যা এ জেলায় ২,১৫,৫৯৩, এদের ভেতর পুরুষ ৮৫,৪৪৮, নারী ১,৩০,১৪৫। তুলনা করলে দেখা যায় জেলায় আসা থেকে ছেড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা বেশী। যোগ বিয়োগের পর যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাতে জেলায় আসার তুলনায় জেলা ছেড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ৭৫,৪৮৬ জন বেশী।[১০]

জনগোষ্ঠীর ভেতর এ জেলার সম্পদ মাহিষ্য সম্প্রদায়। তাঁরা কর্মঠ, উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। চাষ আবাদ থেকে সুরু করে জীবিকার নানা ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব ও কর্মদক্ষতা পরিব্যাপ্ত। বিশ শতকের গোড়ায় এঁদের বহু পরিবার এ জেলা থেকে বাস উঠিয়ে চব্বিশ পরগনা, কলকাতা ও হুগলীতে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। পরিবারের লোকজন নিয়ে তো বটেই অনেক সময় প্রায় একটি গোটা গ্রামও বাস উঠিয়ে স্থানান্তরে গমন করেছিলেন। বর্তমানে এই প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

১০. District Census Hand Book, Midnapore (1961), Ed., B. Roy, W.B. C.S., p. 9.

গ. গ্রাম ও সহরে জনবসতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা :

> "The Magistrate reports that there is not a single village in the district which has not its regularly constituted head-man."
> —W. W. Hunter
>
> (A Statistical Account of Bengal, Vol. III)

পশ্চিম বাংলায় তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা গ্রামীণ। মেদিনীপুর জেলায় এই হার আরও বেশী। এখানে শতকরা ৯২ জন বাস করেন গ্রামে। বেশীরভাগ গ্রামই পুরনো ধাঁচের, প্রাচীন রীতিনীতি ও জীবনধারা অনেকাংশে এখনও গ্রামগুলিতে অনুসৃত।

গ্রাম বলাতে সাধারণভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রেভেনিউ সার্ভেতে রাজস্ব আদায়ের জন্য যে একক ধরা হয়ে থাকে, তা প্রধানতই মৌজা। মৌজা বসতিহীন ও বসতিযুক্ত দুই রকমের। গ্রাম বলতে বসতিযুক্ত চৌহদ্দিকেই চিহ্নিত করা হয়। এ সম্বন্ধে ১৯০১ সালের সেনসাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ই. এ. গেইটের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'গ্রাম সচরাচর কতকগুলি বাস্তুর সমষ্টি, যার আলাদা নাম আছে। অথবা মৌজার নামে নামাঙ্কিত।...শেষোক্ত (মৌজা) বিষয়ে সুবিধা এই যে, এর চৌহদ্দি সুনির্দিষ্ট। গ্রাম এক বা একাধিক মৌজা নিয়ে ছড়িয়ে থাকতে পারে—যার কোনটি বসতিযুক্ত কোনটি বসতিবিহীন'।

মেদিনীপুরের গ্রামগুলি বেশীরভাগই ঘন সন্নিবিষ্ট। প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ২০৫টি করে গ্রাম। ডেবরা থানা এলাকায় এই সন্নিবেশ সব থেকে বেশী। এখানে প্রতি বর্গমাইলে তিনটির বেশী গ্রাম। এর পরেই কাঁথি, কেশপুর ও সদর মহকুমার থানা এলাকা। এখানে প্রতি দশ বর্গ মাইলে ২৮টি গ্রাম।

সাধারণত পশ্চিম বাংলায় প্রতি গ্রামে গড় জনবসতি ৬৮৬ জন। মেদিনীপুরে এই সংখ্যা ৩৭৭। এ জেলায় জনসংখ্যার দিক থেকে সব থেকে বড গ্রাম জোত ঘনশ্যামপুর। দাসপুর থানায়। লোকসংখ্যা ৮,৭৯০। তারপরেই ছানিপাট, এটিও দাসপুর থানায়। লোকসংখ্যা ৮,৫৪৩।[১]

হাণ্টার সাহেবের আমলে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (১৮৭৩) যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় প্রতি গ্রামেই বা দুটি কি তিনটি গ্রাম নিয়ে একজন গ্রামপতি

১৯৭১ সালের লোকগণনায় ছানিপাট সব থেকে বড় গ্রাম।

থাকতেন ; স্থানবিশেষে তাঁদের নানা নামে সনাক্ত করা হত। যেমন হিজলীর দিকে এঁদের বলা হত বড়ুয়া। গ্রামের বিষয়ে এঁরা ছিলেন মুখ্য ব্যক্তি। খবরাখবর, রীতিনীতি রক্ষণ, রাজস্ব ও আইন বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করা—এগুলি ছিল এঁদের কাজ। হিজলী সেটেলমেণ্টের সময় এঁরা গ্রামীণ খাজনার (জমাবন্দী) দেড় শতাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে পেতেন। জেলার অন্যান্য অংশে এঁদের বলা হত মুখিয়া। এঁদের কাজও ছিল বড়ুয়াদের মত। পশ্চিমের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে এঁদের নাম ছিল মণ্ডল। চাষবাস দেখা ছাড়াও মুখিয়াদের কাজগুলিও এঁরা এই অঞ্চলে দেখাশুনা করতেন।

জমিদারের অধীনে জমির মাপজোখ যাঁরা করতেন তাঁদের বলা হত আমিন। গ্রামে গোলমাল দেখা দিলে মুখিয়ার সাথে বসে যিনি তাঁর নিষ্পত্তি করতেন, তাঁকে বলা হত ভদ্র। ভদ্রের সামাজিক স্বীকৃতি খারাপ ছিল না। বিয়ে বা এ জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে পান-সুপুরি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হত। গুরু বা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টারা সাধারণত হতেন ব্রাহ্মণ। ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন গোপীবল্লভপুরের গোঁসাইরা। পুজোপার্বণ, পরবে, শ্রাদ্ধ এসব কাজে হোতা থাকতেন পুরোহিত। এঁরাও প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ। দক্ষিণা, ভোজ্যি (শ্রাদ্ধের জন্য) ও নৈবেদ্য ছিল এঁদের পারিশ্রমিক। জমিদারের স্থানীয় প্রতিনিধি থাকতেন নায়েবরা। উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের গোড়ায় বড় বড় জমিদারিতে এঁদের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বলা হত। যেমন সুজামুঠা, জালামুঠা ও মেদিনীপুর জমিদারী। নায়েবের অধীনে যেসব কর্মচারী রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত থাকতেন তাঁদের বলা হত গোমস্তা বা তহশিলদার। চাষীদের কাছে সরাসরি খাজনা আদায় করতেন চৈতাল নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী। ১৮১৭ সালে আইন করে গ্রামের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য এক ধরনের কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এঁদের নাম পাটওয়ারি। চৌকিদার গ্রামের শান্তিরক্ষক। জমিদার এঁদের নিযুক্ত করতেন। টাকা, শস্য বা জমি দেওয়া হত এঁদের কাজের দাম হিসেবে।

পাইকরা ছিলেন জমিদারের সশস্ত্র বাহিনী। জমিদারের ঘরবাড়ী পাহারা দেওয়া ও দাঙ্গা করা ছিল এঁদের কাজ। এঁদের প্রধানকে বলা হত সর্দার। পাইকান জমি ভোগ করতেন এঁরা। সীমানদার বা দিগওয়ার ছিল আর এক জাতীয় গ্রাম্য পুলিশ প্রধানের নাম। জমিদারী আমলে যাঁরা একেবারে নিম্ন-

১. Regulation XII of 1817

শ্রেণীর ও গায়ে খাটার কাজ করতেন। মেদিনীপুরে তাঁদের বলা হত নগদি বা নাগদি। অন্যান্য জেলায় এঁদের নাম ছিল পেয়াদা। হাট-বাজার বা ব্যবসা ক্ষেত্রে যাঁরা শস্য বা মালপত্র ওজন করতেন তাঁদের বলা হত কয়েল বা কয়াল। টাকাকড়ির বদলে এঁরা মজুরি পেতেন ওজনকরা দ্রব্যের অংশ। মুসলমান আমলে কাজীরা ছিলেন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারক। ইংরেজ আমলে তাঁদের অবস্থা দাঁড়ায় হিন্দু পুরোহিতের মত। মহাজনেরা আগের মত এখনও গ্রামে শক্তিশালী ব্যক্তি। গরীব চাষী ও মজুরদের টাকা ও শস্য চড়া সুদে আগাম দেওয়া ছিল এঁদের কাজ।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজগুলির জন্য ছিলেন ধোপা, নাপিত, পরামানিক, সূত্রধর, কামার, স্বর্ণকার, কংসারি, কুমার ও পটিদার। আনন্দ উৎসবে যাঁদের দরকার হত তাঁদের ভেতরে ছিলেন মালী বা মালাকার, বাজনদার, ঝাড়নদার, কীর্তনীয়া ইত্যাদি।

ইংরেজরা এদেশে রাজ্য কায়েম করার একশ বছর পরেও এই গ্রামীণ কাঠামো অনেকাংশে বজায় ছিল। যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমি সংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থায় এর মূল ধরে টান পড়েছিল। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রাম-বাংলার প্রাচীন জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে সুরু করে, যার চেহারা এখনও গ্রামগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্ন বাংলার অধিবাসীদের মতই। এঁদের চাহিদা সামান্য। শারীরিক প্রয়োজনটুকু মেটাবার মত সঙ্গতি হলেই নিজেদের বিত্তবান বলে মনে করেন। কাদামাটির দেওয়াল দেওয়া কুঁড়ে, গোটা কয়েক হাঁড়ি-কুড়ি ও বাসন, শরীর ঢাকার মত একখানা কাপড়, মাঝে মাঝে মাছ ও শব্জি দিয়ে দুমুঠো ভাত, সবার ওপরে একটি হুঁকো (এখন বিড়ি)—এই সামান্য চাহিদাটুকু মেটাতে পারলেই এঁদের পরিতুষ্টি।

শহরে মানুষ টাকা-কড়ির কদর বোঝেন। এঁদের জীবনধারাও আলাদা, পোষাক-পরিচ্ছদ খারাপ নয়। টাকা-পয়সা আছে এমন ব্যবসায়ীরা ধুতি পরেন, গায়ে জামা, কখনও কখনও চাদরও দেখা যায় (যদিও এখন শীতকাল ছাড়া প্রায় উঠে যেতে বসেছে)। সাধারণ মানুষের কাঁধের ওপর একখানা গামছাও থাকে। এখন ধনী-দরিদ্র সব ঘরের কম বয়সী যুবকেরা ট্রাউজার ও শার্ট পরেন।

গ্রামের দিকে যে সব কুঁড়ে দেখা যায় তার বেশীর ভাগ দেওয়াল লতা-পাতা, ঘাস ও আগাছা দিয়ে তৈরি। অবশ্য কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় মাটির দেওয়ালই বেশী। পিংলা, ময়না, দাসপুর ও বিনপুর থানা এলাকায় কাঠের বাড়িও কম নয়। আজকাল গাঁয়ের দিকে কিছু পোড়া ইটের বাড়িও উঠেছে। ১৯৬১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী গাঁয়ের দিকে এ ধরনের বাড়ি হাজারে ষোলটি। কাঁথি ও রামনগর থানা এলাকায় কাঁচা ইটের বাড়ি তৈরিরও প্রবণতা আছে।

১৯৬১ সালের সেনসাসে জেলায় শহর ছিল ১৪টি। তার ভেতর একটি-কেই শুধু সিটি বা নগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নাম খড়্গপুর। কলকাতা সহ পশ্চিম বাংলার পাঁচটি নগরের ভেতর এটি অন্যতম। এই শহরগুলির নয়টিতে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, পাঁচটিতে নেই।

পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রতি চারজন শহরবাসী। মেদিনীপুরে এই সংখ্যা খুবই নগণ্য। একশোর ভেতর মাত্র আটজন। ১৯০১ সালের পর থেকে এ জেলার শহরে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে ও ১৯৪১ সালে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সাল থেকে এই বৃদ্ধির হার খুবই দ্রুত। নিচের তালিকা থেকে এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সূচী

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
পশ্চিম বাংলা	১০০	১১৪	১২২	১৪০	২২৯	৩০৪	৪১৩
মেদিনীপুর	১০০	১১৩	১০৮	১৫৪	২০৯	২৮১	৩৭২

ঘ. নৃতাত্ত্বিক বিভাগ ও ধর্ম :

> "The people of Midnapore proper are generally composed of an amalgamated race, who can neither be called Bengalees nor Oriyas, but who are a mixture of both."
>
> —H. V. Bayley.
>
> (Memoranda of Midnapore, 1852)

বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী ভূভাগ এই জেলা। ফলে বাংলা ও উড়িষ্যা থেকে আগত জনগোষ্ঠী নিয়েই প্রধানত এর জনবসতি। দীর্ঘকাল কাছাকাছি বাস করার ফলে উভয় গোষ্ঠীই এঁদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নতুন জীবনধারা গড়ে তুলেছেন। উড়িষ্যার পারিবারিক উপাধিগুলি এখনও এখানকার বহুপরিবারের নামের শেষে উচ্চারিত। যেমন : বেহারা, গিরি, জানা, মহাপাত্র, মাহিকূপ (মইকাপ), মহান্তি, পণ্ডা, পট্টনায়েক ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে মারাঠা—পারিবারিক উপাধি খাসখৈল ও সাওয়ান্ত। মারাঠা রাজাদের দেহরক্ষী ছিলেন খাসখৈলরা। সাওয়ান্ত মারাঠাদের ভেতর সম্মানিত শ্রেণী। প্রকৃতপক্ষে মেদিনীপুরের বর্তমান জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী, বাঙ্গালী-ওড়িয়া ও আদিবাসী-উপজাতিদের নিয়ে গঠিত।[১]

কৈবর্তেরাই এ জেলায় সংখ্যায় সব থেকে বেশী। মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এছাড়া বাগদি ও উপজাতিদের ভেতর সাঁওতালরাও সংখ্যায় কম নয়। হান্টার সাহেব মেদিনীপুরে ১১০টি হিন্দু বর্ণ সম্প্রদায়ের হদিস দিয়েছেন।[২] যদিও এর অনেকগুলিই পরবর্তীকালে বৃহত্তর বর্ণ সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে গেছে। যেসব বৃহত্তর বর্ণসম্প্রদায় এখনও এ জেলায় সংখ্যার দিক থেকে বেশী, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

কৈবর্ত : স্থানীয় লোককথা অনুসারে কৈবর্তেরা প্রথম বসতি করেছিলেন অযোধ্যার সরযূ বা গোর্গী-নদীর তীরে। তাঁদের পাঁচজন সর্দার মেদিনীপুরে এসে এদেশ জয় করে নেন। তখন ময়নার রাজা ছিলেন শ্রীধর হুই। তাঁকে

১. Bengal District Gazetteers : Midnapore—L. S. S. O. Malley (1911)

২. A Statistical Account of Bengal, Vol. III—W. W. Hunter, Reprinted 1973.

হারিয়ে গোবর্ধন নন্দ এখানে তাঁর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ সর্দারের দখলে যায় পাঁচটি ভূভাগ। তাম্রলিপ্ত (তমলুক), বালিসীতা, তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতুবপুর।[৩] ডঃ গ্রিয়ারসনের মতানুসারে এঁদের আদি নিবাস ছিল উড়িষ্যা। গোড়ায় অনার্যভাষীদের প্রাধান্য দেখে এঁরা মেদিনীপুরের দিকে চলে আসেন। এঁদের ভাষা ছিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ওড়িয়া, যা এখনও এঁরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে থাকেন।

পরবর্তীকালে এই উভয় মতই আলোচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে ১৯৫৪ সালে স্টেট্‌স্ রি-অরগানাইজেশন কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি দাখিল করা হয়, তা প্রণিধানযোগ্য। "চাষী, কৈবর্ত বা মাহিষ্যেরা মেদিনীপুরে সংখ্যায় বেশী। এই বর্ণসম্প্রদায়ই এখানকার কেন্দ্রীয় জনগোষ্ঠী; হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনাতেও তাই। ভাগীরথীর পূর্বমুখে পোদ ও নমশূদ্রদের এবং পশ্চিমমুখে বাগদীদের পূর্বপুরুষ যে ক্রমোত্থিত ভূভাগগুলি দখল করে থাকতেন, সেখানেই ছিল এঁদের আদি নিবাস। যুক্তিপরম্পরার কোন দিক দিয়েই ওড়িয়াদের সাথে এঁদের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক অনুমিত হয় না।"[৪]

কৈবর্তেরা জনগোষ্ঠী হিসেবে খুবই প্রাচীন। বাজসনেয়ী সংহিতায় এঁরা কেবর্ত নামে চিহ্নিত, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতায় কৈবর্ত; অশোকের শিলালিপিতে কেবত। সম্ভবত এঁরাই ছিলেন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের শাসক।

মেদিনীপুরে কৈবর্তেরা দুটি উপশাখায় বিভক্ত। উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। দক্ষিণ রাঢ়াদের আবার চারটি প্রশাখা। লালচাটাই, একসিধে, দোসিধে ও মাকুন্দ। লালচাটাই এই চার প্রশাখার ভেতর উচ্চতম। সামাজিক সভা-সমিতিতে এঁদের সম্মানের জন্য লাল চাটাই পেতে বসতে দেওয়া হয়। একসিধে ও দোসিধে নাম হয়েছে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য। একসিধেরা বরযাত্রী গেলে কনে বাড়িতে খান না। সাথে সিধে নিয়ে যান ও কনের বাড়ির কাছে কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে রান্না করে খাওয়া দাওয়া হয়। দোসিধেরা বিয়ের রাত ও পরের রাতেও পরের বাড়িতে খান। মাকুন্দেরা চার শ্রেণীর ভেতর সব থেকে নিচে। এঁদের খাওয়াদাওয়া সবার সাথেই চলে।

---

৩. Statistical Account of Bengal, Vol. VIII—W. W. Hunter, Reprinted 1973, p. 2.

৪. Memorandum (supplementary) before States Reorganisation Commission—Government of West Bengal: p. 105

কৈবর্তেরা মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। জেলার বিশিষ্ট চাষী এঁরাই। এখানকার বেশীরভাগ জমিদার, তালুকদার ও রায়ত ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ধর্মের দিক থেকে এঁরা বেশীরভাগ বৈষ্ণব। এবং স্বভাবতই ব্রাহ্মণদের থেকে বৈষ্ণবদের প্রতি এঁদের সম্ভ্রম বেশী।

পেশার দিক থেকে কৈবর্তেরা দুটি মোটা ভাগে বিভক্ত। জালিয়া ও হালিয়া। রিসলে মনে করতেন এঁরা উপজাতি ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত।[৫] কিন্তু পোর্টারের মত আলাদা।[৬] মাহিষ্য, দাস, কৈবর্ত, ধীবর, জালো (জালিয়া), মালো ও পাটনি—এঁদের ভেতর শুধু জালিয়া কৈবর্তেরা ও পাটনিরাই মেদিনী-পুরে তফশীলভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃত। ১৯০১ সালের পরিসংখ্যানে চাষী কৈবর্তেরা সকলেই মাহিষ্য হিসাবে গণিত হয়েছেন। যে ছোট কৈবর্ত জনগোষ্ঠী মাছধরার কাজে এখনও লিপ্ত তাঁরাই কেবল জালিয়া কৈবর্ত ও পাটনি হিসাবে পরিগণিত। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান মাহিষ্য, একটি অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী।

১৮৬৩ সাল থেকে চাষী কৈবর্তেরা মাহিষ্য হিসাবে পণ্ডিতদের অনুমোদন লাভ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। পরবর্তী কালে এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়। বাংলার তিনজন খ্যাতনামা পণ্ডিত শীতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শিবনাথ বাচস্পতি ও অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এঁদের দাবী মেনে নিয়ে বৈবস্বত পত্র দান করেন ও প্রাচীন মাহিষ্য জনগোষ্ঠীর সাথে এঁদের সনাক্ত করেন।[৭]

বাগদী : হিন্দু বর্ণবিভাগের নিচের দিকে বাগদীদের স্থান। আদিতে পেশা ছিল মাছ ধরা, পরবর্তীকালে চাষ-আবাদে নিযুক্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে উক্ত বগাতীতদের সাথে এঁদের সনাক্ত করা হয়ে থাকে। গেইটের মতে, হয় এঁদের নাম মেদিনীপুরের বগড়ী পরগনা থেকে এসেছে; নতুবা এঁদের নামে বগড়ীর নাম হয়েছে। চাষ-আবাদ ও মাছ ধরার কাজ ছাড়াও

৫. The Castes System in Bengal—Sailendra Nath Sengupta

৬ The actual existence of Kṣatriya classes in these two lacalities (Jhālāwar and Mallagash) in Rajputana has evidently suggested the claim but no evidence whatever is adviced that the actual Jhālos and Mālos of Bengal had any historical connection with these region. —C. Porter

৭. The Castes System in Bengal—Sailendra Nath Sengupta.

এঁরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে থাকেন। এঁদের ভেতর দুলিয়ারা পাল্কীও বইতেন। মেদিনীপুরের বাগদীরা তফসীল সম্প্রদায়ভুক্ত।

সদগোপ: জেলার প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভেতর এঁরা অন্যতম। অন্যান্য বর্ণের কৃষকদের ভেতর এঁদের স্থান সবার ওপরে। স্থানীয় লোককথা অনুসারে এ জেলায় প্রথম সদগোপ পরিবার এসে বসবাস করতে সুরু করেন নারায়ণগড থানায়। এঁরা নিজেদের বৈশ্য বলে দাবী করেন। গোয়ালাদের জলচল উপশাখা হিসাবে এঁরা স্বীকৃত এবং নবশাখদের অন্যতম। গোষ্ঠী হিসাবে এঁরা মোটামুটি সম্পত্তিসম্পন্ন। এঁদের ভেতর জমিদারও আছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মুখ্য জমিদার পরিবার নাডাজোলের রাজারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী, মধ্যশ্রেণী ও ব্যাসোক্ত:

মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণই রাঢ়ী শ্রেণীর। এ ছাডা আরো দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। মধ্যশ্রেণী ও ব্যাসোক্ত। এঁদের শুধু মেদিনীপুরেই দেখা যায়। বিশেষত মধ্যশ্রেণীদের। এঁরা রাঢ়ী শ্রেণীরই একটি শাখা বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাংলা ও উডিষ্যার মধ্যবর্তী দেশে বসবাস সুরু করেছিলেন বলে এইনাম। প্রথমে এঁরা ময়না পরগনায় এসে বসতি স্থাপন করেন। বল্লাল সেন প্রদত্ত কৌলিন্য প্রথার বাইরে থাকার জন্য এঁরা কুলীন নন। যদিও পারিবারিক পদবী হিসেবে মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভবত রাঢ়ী, উৎকল ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের উপশাখা পরবর্তীকালে মিলে মিশে এই শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে।

এঁদের ভেতর যাঁরা ময়না পরগনার ভামুয়া, চেতুয়ার গোকুলনগর, কেদারের মহারাজপুর ও ভোগডাঙ্গাতে বসবাস করেন, তাঁরা সম্মানিত বলে পরিগণিত। এবং এঁদের ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে হলে যথেষ্ট কন্যাপণ দিতে হয়। উপাসনার দিক থেকে এঁরা বেশীরভাগই শাক্ত। আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে রাঢ়ী ব্রাহ্মনদের থেকে ব্যতিক্রম খুব কমই।

ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণও এ জেলারই বৈশিষ্ট্য। এঁরা সাধারণত কৈবর্তদের পুরোহিত। কৈবর্ত উপশাখার মত এঁরাও উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

তকত বা তোক্তা/তক্তা: মেদিনীপুরে, একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। সাতাশ পুরুষ আগে এঁরা এ জেলায় এসে বসবাস করেন বলে দাবী জানান। নিজেদের

ভেতর এঁরা চারটি উপশাখায় বিভক্ত—শাণ্ডিল্য (শোল মাছ থেকে), চন্দ্রঋষি (চাঁদকুড়া থেকে), বানঋষি (বানমাছ থেকে) ও কাশ্যপ (কচ্ছপ থেকে)। সম্ভবত এঁরা দ্রাবিড় জাতির উপশাখা, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। আচার-অনুষ্ঠানে এঁরা হিন্দু ধর্মানুসারী ও খুব গোঁড়া। এঁদের পূজার প্রিয় পাত্র রাম। উপদেবদেবীর ভেতর এঁরা শীতলা ও মনসার ভক্ত। ধর্মীয় বিভাগে প্রকৃতি পূজারী বা টোটেমপন্থী।

দণ্ডমাঝি : কখনও কখনও দণ্ডছত্র মাঝিও বলা হয়ে থাকে। মেদিনীপুরেই এঁদের প্রধানত দেখা যায়। এঁদের পাঁচটি গোত্র বা প্রবর। কাশ্যপ বা কাছিম, শোলমাছ, দেপাইক (পাখি), চন্দ্রকুড়া মাছ ও পাট। ধর্মীয় বিভাগে এঁরাও টোটেমপন্থী। যেসব মাছ, পাখি ও গাছ থেকে এঁদের গোত্র, তাঁদের এঁরা খুবই সম্মান করেন। এঁদের উপশাখা তিনটি—দণ্ডমাঝি, লোহারমাঝি ও কাসাইকুলিয়া মাঝি। উৎপত্তি বিষয়ে এঁরা বলে থাকেন শিবের চড়ক পূজায় যে মাঝি দণ্ড বা মাটির পাত্রে রক্তক ধরেছিলেন তার থেকেই এঁদের সূত্রপাত। মাছধরা এঁদের আদি পেশা বলে কথিত। এখনও অনেকাংশে তাই। কেউ কেউ চাষ-আবাদে থেকে দিনমজুরি করে, জীবনধারণ করেন। এঁদের মেয়েরা বর্ণহিন্দুবাড়িতে ঝিয়ের কাজও করে থাকেন। ১৯০১ সালের পরিসংখ্যানে বাগদি উপশাখা হিসাবে এঁরা পরিগণিত হন।

কদমা বা কড়মা : মেদিনীপুরে সাধারণতঃ মাছধরা, মাছবেচা, চুন তৈরী ও বেচা, বিয়ের শোভাযাত্রায় বাঁশের কাঠামোয় আলোর সজ্জা নিয়ে যাওয়া, ও বিয়ে বাড়িতে পাইকান নাচ ও নানারকম খেলা দেখান এঁদের কাজ। পারিবারিক পদবী ভুঁইয়া, দাস, দোলুই, জানা ও পাত্র। এঁদের পাঁচটি উপশাখা। কালান্দী বৈষ্ণব, মাদলবাজা, শঙ্খবাজা, মাছুয়া ও চণ্ডালি। গোত্র শোলমাছ, ফলে এঁরা এ মাছ খান না। উড়িষ্যার কাণ্ড্রদের সাথে নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এঁদের মিল দেখা যায়। বালেশ্বরে সম্ভবতঃ এই দুই শাখা একই সম্প্রদায়ভুক্ত।

কায়স্থ : মেদিনীপুর জেলা ও বালেশ্বরেই প্রধানত এঁদের দেখা যায়। কৃষি ও জোতজমার আয় জীবনধারণের অবলম্বন। এঁদের দুটি প্রশাখা। মধ্যশ্রেণী কায়স্থ ও কায়স্থ। মধ্যশ্রেণীর কায়স্থেরা সম্পত্তিসম্পন্ন ও সামাজিক দিক দিয়ে উঁচে। রিসলের মতে[৮] উভয় প্রশাখাই উড়িষ্যার লেখকগোষ্ঠী করণ

৮. The Tribes and Castes of Bengal—Herbert Risley

সম্প্রদায়ভুক্ত। পরবর্তীকালে অধিকতর বিত্তশালী পরিবারগুলি হীন ও দরিদ্র জ্ঞাতিবর্গকে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন ও বাংলার প্রসিদ্ধ কায়স্থ গোষ্ঠীর সাথে সনাক্ত করেন নিজেদের। এঁরা বেশীর ভাগ বৈষ্ণব।

বেশীরভাগ কাস্থেরা ১৯৫১ সালের লোকগণনায় কায়স্থ বলে পরিচয় দেন। ফলে এঁদের সংখ্যা দারুণভাবে কমে দাঁড়ায়—মাত্র ৩৯ জনে। ১৯০১ সালে এঁরা নবশাখ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের তফসীলে কাস্থেরা তালিকাভুক্ত ছিলেন।

রাজু : উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরেই এঁরা সংখ্যায় বেশী। পেশা চাষ-আবাদ, সুদে টাকা ধার দেওয়া। এঁদের ভেতর জমিদারও আছেন। পারিবারিক পদবী ঘোষ, পাল, দত্ত, জানা, প্রধান, মহান্তি ইত্যাদি। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান নবশাখদের মতই। এঁদের দুটি উপশাখা, দৈন ও বায়ান। দৈন-বাড়ির মেয়েরা শাড়ি বা ফ্রক বাঁদিক দিয়ে গোটান, বায়ান মেয়েরা ডান দিক দিয়ে। দৈনরা বায়ানদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করেন। উভয় শাখারই দাবী তাঁরা উড়িষ্যার রাজা চোড়গঙ্গের বংশধর।

শিয়ালগির : ছোট সম্প্রদায়। মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানাতেই এঁদের দেখা যায়। ভাষা গুজরাতী। সম্ভবত পাঁচ বা ছয় পুরুষ আগে এঁরা পশ্চিম থেকে এখানে এসে বসবাস সুরু করেন। কি কারণে পিতৃভূ্ম ছেড়ে এখানে এসে বসতি গড়ে তোলেন সে তথ্য অজ্ঞাত। বোধ হয় ভ্রাম্যমান ভীল জাতির এঁরা কোন উপশাখা। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে স্থিত হয়েছিলেন। এঁদের নানা পেশা। মাছ বিক্রি, বাঁশের মাদুর তৈরি ও বিক্রি, চাষ-আবাদ ও কেউ কেউ আনাজ-পাতিও বিক্রি করে থাকেন। এঁদের পুরোহিত নিজেদের গোষ্ঠীর লোক। মৃত্যুর পর মৃতকে পোড়ানোর বদলে এঁরা কবর দেন। রীতিনীতিতে হিন্দু।

শুকলি : মেদিনীপুরেরই ক্ষুদ্র চাষী সম্প্রদায়। শোলাঙ্কি রাজপুত বীরসিংহের বংশধর বলে এঁরা নিজেদের দাবী করেন। বীরসিংহ প্রায় ছশো বছর আগে মেদিনীপুরে এসেছিলেন ও কেদারকুণ্ড পরগনায় বীরসিংহপুরে একটি গড তৈরি করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সেই গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। এর কাছাকাছি বড বড দুটি ঢিবি আছে। একটির নাম মুণ্ডমারুই অপরটির নাম গর্দামারুই। সাতশো বাগদীর মুণ্ড ও ধড় দিয়ে নাকি

টিবি ত্রুটির সৃষ্টি। স্থানীয় লোককথা অনুসারে বীরসিংহ পাতায় তৈরি মাদুর বা 'হেশ' কথাটি বাগদীদের উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। না পারার জন্য এদের গর্দান নেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এদের কাছে পরাজিত হন। ফলে অনুচরেরা পৈতে ফেলে চাষ-আবাদে মন দেন ও এখানে বসবাস করতে সুরু করেন।

তিনটি উপশাখা এদের। বড ভাইয়া, বাহাত্তর ঘরী ও দশাসই। বড ভাইয়ারা তিন উপশাখার ভেতর সব থেকে সম্মানিত। রীতিনীতিতে হিন্দু সমাজের অনুশাসন মেনে চলেন। সামাজিক দিক দিয়ে পোদ ও ধোপাদের সমগোত্রীয়। ধর্মে বেশীর ভাগই বৈষ্ণব। কৃষিই প্রধান উপজীবিকা।

তুঁতিয়া: ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায়। প্রথাগতভাবে তুঁত বা মালবারী চাষ পেশা। এ কাজে পেট চলেনা বলে অনেকেই এখন চাষ-আবাদ ও দিনমজুরির কাজে লিপ্ত। কেউ কেউ আবার শণ থেকে দড়ি পাকিয়ে বিক্রি করেন। মুসলমানদের ভেতর এদের স্থান নিচের দিকে। সাধারণ মুসলমানেরা নিজেদের ঘরের মেয়ে এদের সাথে বিয়ে দিতে চাননা। তবে এদের ঘরের মেয়ে আনতে বাধা নেই। পুরুষরা পুরুষদের সাথে মেলামেলা করেন কিন্তু মেয়েদের মিশতে বাধা দেন।

এ ছাডা আর যেসব সম্প্রদায় আছেন তাদের বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এ জেলায় হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী। শতকরা ৯২·২৬ জন। মুসলমান শতকরা ৭·৬০ জন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আছেন খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ ও বৌদ্ধ। এরা সংখ্যায় খুবই কম। মুসলমানদের সংখ্যা এ জেলায় সব থেকে বেশী কেশপুর থানায়। শতকরা ২১ জন। তারপরেই আসে সুতাহাটা, পাঁশকুডা ও নন্দীগ্রাম। খ্রীষ্টানরা সংখ্যায় সব থেকে বেশী আছেন খড়্গপুর টাউন থানা এলাকায়। ১৯৬১ সালের লোকগণনার সাথে ১৯৫১ সালের লোকগণনার তুলনা করলে দেখা যায় এই সময়ের ভেতর মুসলমানদের জনবৃদ্ধির হার অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির হারের তুলনায় সব থেকে বেশী। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও শিখদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতির দিকে।[৯]

গেঁওখালির খ্রীষ্টানেরা: তমলুকের দক্ষিণ-পূর্বে গেঁওখালিতে পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের এক অদ্ভুত সম্প্রদায় বাস করেন। বেতকুণ্ডু ও শুকলাপুর মৌজা দুটি

৯. District Census Hand Book, Midnapore, 1961

৫

এদের বসবাসের জন্য ফিরিঙ্গীপাড়া নামে অভিহিত। বর্গীর আক্রমণ প্রতি-রোধের জন্য মহিষাদলের রাজা যে পর্তুগীজ গোলন্দাজদের এনেছিলেন, এরা তাদের বংশধর বলে নিজেদের দাবী করেন।

সম্ভবত রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী রাণী জানকী দেবী ১৭৭০ সালে এদের এনেছিলেন। মীরপুর গ্রামটি বিনা খাজনায় বসবাসের জন্যেও দিয়েছিলেন। বোধ হয় গোয়া এদের আদি বাসস্থান ছিল।

কৃষি ও কৃষি-মজুরি এদের জীবনধারণের উপায়। মাটির দেওয়াল, খড় বা টালি-ছাওয়া ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদও স্থানীয় লোকদের মত। যদিও এরা ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত, কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অনেক কিছু মেনে চলেন। যেমন বিয়ের সময় গায়েহলুদ, অষ্ট মঙ্গলা, মৃত্যুতে অশৌচ, ছেলে-মেয়ের মুখেভাতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি। অবশ্য খাওয়াদাওয়ায় কোন বাছবিচার নেই। পারিবারিক উপাধি ও নাম এখনও পর্তুগীজদের মতই, যেমন মতিলাল টেরেসা, শচীন্দ্র রোজারিও, লুই রোটা, হ্যারন পেরিয়া, অবনী ডি'ক্রুজ, মার্গারেট লোবো ইত্যাদি। সংকীর্তনের, মত এরা বাংলায় যীশুর নাম-গান করেন।

ফিরঙ্গবিটপ : মেদিনীপুরের এক অতি ক্ষুদ্র, অভিনব সম্প্রদায়। জাতিগত ভাবে হিন্দু বলে এদের দাবী। কিন্তু মন্দির দেখতে চার্চের মত। পূজার উপকরণ ফলমূল। এদের পুরোহিতও নেই। কখনও কখনও পুজোয় বলিও দিয়ে থাকেন। সম্ভবত শিরায় পর্তুগীজ রক্ত মিশ্রিত। যাদের অবস্থা ভাল নিজেদের মাহিষ্য বলে দাবী করেন ও বিয়ে করেন মাহিষ্য পরিবারে।

ঙ. উপজাতি :

উবুর ডুবুর পান মোহরি
কাঁচ কলাটির ঘর চৌরি
পাশের টোপা কই দেরে
সুবলের পো।[১]

পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলায় উপজাতিদের সংখ্যা বেশী। তিন লক্ষের ওপর। গ্রামের দিকে প্রতি বারো জনে একজন করে উপজাতি। জেলার ভেতর উপজাতিদের বাস বেশীর ভাগ সদর মহকুমায়। এর পরেই ঝাড়গ্রাম মহকুমা। এই দুটি মহকুমা মিলে এ জেলার প্রায় শতকরা ৯৫ জন এই অঞ্চলে বাস করেন। ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় এদের বসবাস প্রায় নগণ্য।

শহরাঞ্চলের ভেতর বসবাস খড়্গপুরে সব থেকে বেশী। তারপরেই চন্দ্রকোণা ও মেদিনীপুর শহর। উপজাতিরা এ জেলায় বর্দ্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠী। ১৯৫১ সালের জনগণনার তুলনায় ১৯৬১ সালে এদের বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়। পুরুষদের থেকে মেয়েদের বৃদ্ধির হার বেশী। মেয়েরা সংখ্যাতেও পুরুষদের থেকে অনেক।

সাঁওতালদের ভেতর মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে হাজারে ১৮ জন বেশী। ভূমিজ, লোধা ও কোরাদের ভেতর মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে হাজারে যথাক্রমে ১৫১, ৭৩ ও ৪৯ জন বেশী। মুণ্ডাদের ভেতর মেয়েদের বৃদ্ধির হার সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। হাজারে ১৭০ জন।

সাঁওতাল : জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশে যে উঁচু-নিচু, জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ আছে, সেখানেই বসবাস। কবে প্রথম এ জেলায় আসেন সে তথ্য অজ্ঞাত। লোককথা অনুসারে কয়েকশো বছর আগে ঘুরতে ঘুরতে এরা এ জেলার সাঁওত-এ (এখনকার শিলদায়) এসে পড়েন। এই জায়গার নাম অনুসারে এদের নাম হয় সাঁওতার বা সাঁওতাল। পরে জায়গাটির নাম হয় সান্তাভূঁই।[২]

মেদিনীপুরে সাঁওতালদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হ্যামিল্টন সাহেবের

---

১. The Lodhas of West Bengal —P. K. Bhowmick.

২. Descriptive Ethnology of Bengal—Edward Tuite Dalton (1872)

বিবরণীতে।[৩] তিনি লেখেন, এখানকার জঙ্গলে কিছু গরীব, শোচনীয় এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ বাস করেন, যাদের বলা হয় সন্তাল।

সাঁওতালরা কর্মঠ, নিরীহ, ভদ্র ও পরিশ্রমী। এ জেলায় সাঁওতালদের জনবিন্যাস প্রধানত বিনপুর, শিলদা, শালবনী ও গড়বেতায়। সব থেকে বেশী ঘনসন্নিবেশ কাঁসাই নদীর পূর্বে রামগড় ও লালগড় রাজাদের এলাকায়। যেসব গ্রামে বর্ণহিন্দুদের বসবাস বেশী, সেখানে দিক্ বা অ-সাঁওতালদের বসতির বেশ খানিক দূরে এদের কুঁড়েগুলি। সাঁওতালরাই এ জেলায় উপজাতিদের ভেতর সব থেকে বড় গোষ্ঠী। চাষ-আবাদ, দিনমজুরি, শিকার এবং বনের থেকে কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রি এদের পেশা।

ভুমিজ : সাঁওতালদের পরেই ভূমিজদের সংখ্যা। ভূমিজদের সাথে মুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। এরা মুণ্ডাদেরই একটি উপশাখা।[৪] পূর্বদিকে আসার পর হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে নতুন গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এদের আদি নিবাস ছিল মানভূম, সিংভূম ও পশ্চিমবঙ্গ। মৃত্যুর পর মৃতের অস্থি কবর দেওয়া ভূমিজদের প্রথা। এবং তা দেওয়া হয় পূর্ব পুরুষের ভিটেয়। মেদিনীপুরের তামারিয়া ভূমিজরা লোহারডাঙ্গার ছোকাহাটুতে অস্থি কবর দেন। ছোকাহাটু মুণ্ডাদের কবর স্থান। মেদিনীপুরের দেশী ভূমিজরা কবর দেন সিংভূমের কুচংয়ে।[৫] এরা বেশীরভাগই চাষ-আবাদ করেন। অন্যান্য কাজেও আছেন বেশ কিছু।

মুণ্ডা : সংখ্যার দিক থেকে এ জেলায় উপজাতিদের ভেতর মুণ্ডাদের স্থান তৃতীয়। মুণ্ডাদের আদি নিবাস ছিল ছোটনাগপুর। উপকথা অনুসারে নাগ পুণ্ডরিক[৬] ও এক ব্রাহ্মণকন্যার সন্তান এরা। ছোটনাগপুরের রাজবংশী রাজারা এদের আদিপুরুষ বলে এরা দাবী করেন। ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, বিনপুর ও নয়াগ্রাম থানা এলাকায় এদের সংখ্যা বেশী। সদর ও কাঁথি মহকুমায় এদের বসবাস থাকলেও তা নগণ্য। কৃষি, নানা রকম কুটির-শিল্প ও অন্যান্য কাজ এদের পেশা।

কোরা : আদি নিবাস ছোটনাগপুর , মানভূম ও পশ্চিমবঙ্গ। উপজাতিদের

৩. Description of Hindostan—Walter Hamilton (1820).

৪. The Tribes and Castes of Bengal—H. H. Risley (1891)

৫. Census 1951 : The Tribes and Castes of West Bengal.

৬. রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে জীবিত সাপ।

ভেতর সংখ্যায় এরা এ জেলায় চতুর্থ। রীতিনীতিতে হিন্দু-ঘেঁষা যদিও এদের পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ নন, লায়া—এদেরই সম্প্রদায়ের। মৃতকে কবর বা দাহ দুটিই করা হয়। হিন্দুদের দেবদেবী ছাড়া এরা মনসা, ভাদ্র, রুদ্র ও ভৈরব ঠাকুরকে মান্য করেন। গেইট ও রিসলের মতে মুণ্ডাদেরই একটি শাখা।

এদের বেশীরভাগেরই বসবাস সদর মহকুমায়। তাছাড়া নারায়ণগড, খড়্গপুর ও কেশিয়াড়ী থানা এলাকাতেও সংখ্যা কম নয়। ঝাড়গ্রাম মহকুমাতেও এদের কিছু বসবাস আছে। অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাছাড়া পুকুর কাটা, রাস্তা তৈরি ও নানারকম মাটি কাটার কাজে এদের দেখা যায়।

লোধা: 'লুব্ধক' শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু লোধারা নিজেদের শবর বা লোধা-শবর বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন।[৭] মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বিহারের সিংভূম ও মেদিনীপুরে এদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। মেদিনীপুরের উপজাতিদের ভেতর সংখ্যায় এরা পঞ্চম। ডঃ ভৌমিক মনে করেন নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মেদিনীপুরের লোধাদের সাথে মধ্যপ্রদেশের লোধাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা দুরূহ।

১৯১৬ সালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এরা অপরাধপ্রবণ উপজাতি হিসাবে ঘোষিত হন। স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে এই বিজ্ঞপ্তি ও আইন বাতিল হয়। এদের নয়টি গোত্র ; (১) ভুগ্‌তা, ভুক্তা বা ভক্তা (২) মল্লিক (৩) কোটাল (৪) লায়েক, লাইক বা নায়েক (৫) দিগর (৬) পরামানিক (৭) দণ্ডপাট বা বাঘ (৮) আরি বা আহরি ও (৯) ভুঁইয়া। এদের প্রথাগত উপজীবিকা জঙ্গলের সম্পদ আহরণ। কিন্তু মেদিনীপুরে এরা চাষ-আবাদ, মজুরের কাজ ও বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রিও করে থাকতেন। দেবদেবীর মধ্যে প্রিয় শীতলা, বরুণ ও ভৈরব। পুরোহিতের নাম কোটাল।

বেশীরভাগ লোধার বাস ঝাড়গ্রাম মহকুমায়, বিশেষত জামবনী ও বিনপুর থানায়। এছাড়া সদর মহকুমায়, খড়্গপুর ও নারায়ণগড় থানাতেও কিছু পরিমাণে বসবাস আছে।

৭. **The Lodhas of West Bengal—P. K. Bhowmick (1963).**

চ. ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি :

"Oriya is very closely related to Bengali. West Bengali and Oriya seem to have developed from one form of Magadhi Apabhransa as current in South West Bengal in the 7th-8th centuries."

—Suniti Kumar Chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language.

মেদিনীপুরের অধিবাসীবৃন্দ বহু ভাষাভাষী। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পরিসংখ্যান রিপোর্টে[১] দেখা যায় একশো জনের ভেতর বাংলাভাষাভাষী আশি জন, ওড়িয়া বলতেন দশজন, অবশিষ্টেরা অন্যান্য ভাষা। তাদের ভেতর সাঁওতালী প্রধান।

বাংলারও আবার রকমফের ছিল এবং এখনও আছে। উত্তর ও পূর্বদিকে যে বাংলা চালু তার প্রকৃতি হাওড়া জেলার ভাষার মত। কিন্তু গড়বেতার কাছা-কাছি যে কথ্য ভাষা, বাঁকুড়া জেলার ভাষার সাথে তার মিল বেশী। জেলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার ভাষা ওড়িয়া ও বাংলা মেশান এক অদ্ভুত উপভাষা। বাক্য সুরু হয় ওড়িয়া দিয়ে মাঝখানে বাংলা, শেষে আবার ওড়িয়া।[২] প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার উত্তরদিকের ভাষা বাংলা ঘেঁষা। এর সীমানা পেরিয়ে মেদিনীপুর জেলায় পড়লেই আমরা এক নতুন ভাষার সন্ধান পাই। যদিও ভাষা হিসেবে একে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। বরং বিকৃত বাংলা ও বিকৃত ওড়িয়ারই মিশ্রিত রূপ বলা চলে। এতে যেমন বাংলা শব্দের অবাধ ব্যবহার আছে তেমনি আছে ওড়িয়া ও এমনকি সাঁওতালী শব্দেরও। অনেকে মনে করেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ভাষাতেই লেখা হয়েছিল।[৩]

কাঁথি মহকুমার যে কথ্য ভাষা চালু তাতে ওড়িয়ার ঝোঁক বেশী। বিশেষতঃ নয়াগ্রাম ও দাঁতন থানার ভাষা ওড়িয়া-ঘেঁষা। যদিও এই ওড়িয়ার ভেতর

১. Bengal District Gazetteers, Midnapore—L. S. S. O'Malley (1911).

২. Linguistic Survey of India—Dr. Grierson (Introduction).

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপীবল্লভপুর—সুধীর করণ, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ, ১৯৭৪।

ওড়িয়া ভাষার শুদ্ধ রূপ খুব কমই বর্তমান এবং কটকের অধিবাসীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

১৯৫৪ সালে ভাষাগত কারণে মেদিনীপুর জেলার এক বিরাট অংশ উড়িষ্যা রাজ্য সরকার অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবী জানান। যথা ঝাড়গ্রাম ও কাঁথি মহকুমা দুটির সমগ্র অংশ, সদর মহকুমার খড়্গপুর, কেশিয়ারী, দাঁতন, মোহনপুর, ডেবরা, পিংলা ও সবং থানা, তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া ও নন্দীগ্রাম থানা।[৪] দাবীর সমর্থন হিসাবে অনেকগুলি কারণের ভেতর তারা বলেন '১৮৫০ সালে মেদিনীপুর যখন কটক ভুক্তির অন্তর্গত ছিল, আদালতের ভাষা ছিল ওড়িয়া। এমনকি জমিদারী সেরেস্তাগুলিতে নথিপত্রও ওড়িয়া ভাষায় রক্ষিত হত। প্রত্যুত্তর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেন ওড়িয়া কখনই মেদিনীপুরে আদালতের ভাষা ছিল না।[৫] ১৮২৯-৫৪ সাল পর্যন্ত জেলাটি যখন কটক ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল তখনও আদালতের ভাষা ছিল বাংলা। এমনকি খোদ উড়িষ্যাতে সরকারি দলিলপত্র রাখা হত ফারসীতে। জেলার দক্ষিণদিকে যেসব জমিদারী মারাঠাদের কবলিত ছিল শুধু সেই সব সেরেস্তাতে ওড়িয়া চালু ছিল। ময়ূর-ভঞ্জের রাজা যখন নয়াবসানের জমিদার ছিলেন তখন সেখানে ওড়িয়া চলত। তাছাড়া সারা জেলায় বাংলাই ছিল প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা।

১৯১১ সালের পর থেকে ওড়িয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা এ জেলায় ক্রমশ কমতে থাকে ও বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বেড়ে চলে। বর্তমানে এই সংখ্যা শতকরা নব্বই জন। জেলার ভেতর খড়্গপুর একমাত্র কসমোপলিটান নগর। এখানে নানা ভাষাভাষী লোক বাস করেন। বিশেষত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপের জন্য ভারতের নানা রাজ্যের অধিবাসীদের এখানে বসবাস। খড়্গপুর টাউন থানায় মাত্র শতকরা ৩৫ জন বাংলা ভাষাভাষী। অন্যান্য ভাষাভাষীদের ভেতর তেলেগু প্রধান। শতকরা একুশ জন।

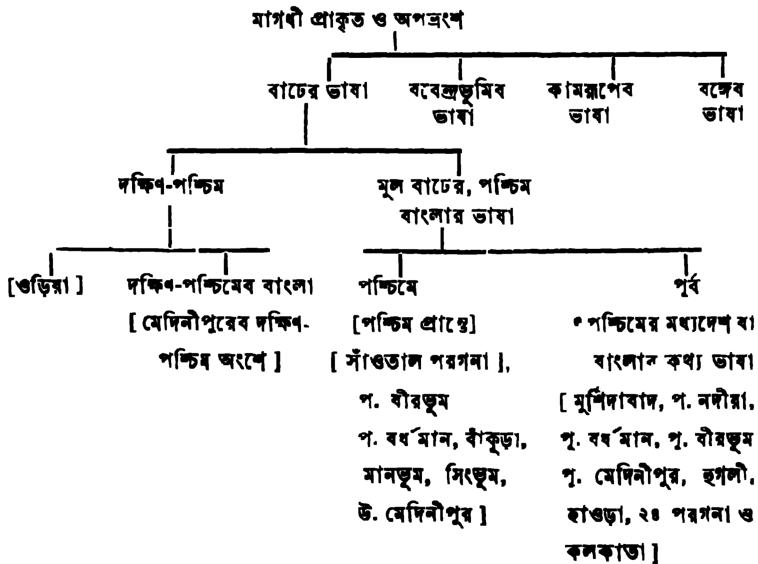
বাংলার পরেই সাঁওতালীর স্থান। এ ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা নয়াগ্রাম, বিনপুর, জামবনী, গোপীবল্লভপুর, শালবনী, খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, সাঁকরাইল থানা

৪. Memorandum (supplementary) before States Reorganisation Commission : Government of West Bengal : chap. VI

৫. Ibid.

এলাকায় বেশী। সাঁওতালীর পরে উর্দু। সদর, কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় এই ভাষাভাষী অধিবাসীদের সংখ্যা বেশী। হিন্দী ভাষাভাষী অধিবাসীদের সংখ্যা প্রধানত খড়্গপুর টাউন থানা এলাকাতেই অধিক।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে[৬] মাগধীপ্রাকৃত ও অপভ্রংশের যে বিন্যাস তালিকাকারে সন্নিবেশ করেছেন, নিচে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় তার স্বরূপটি অনুদিত করে দেওয়া হল :



৬. The Origin and Development of the Bengali Language—Suniti Kumar Chatterjee, (1975), Part I.

শিক্ষা :

ইংরেজ আমলে শিক্ষার যে প্রচলন সুরু হয় তার প্রধান মাধ্যম ছিল ইংরাজী স্কুল। সনাতন প্রথায় শিক্ষার জন্য যেসব টোল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে তাদের গৌরব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তখন শিক্ষা ছিল উচ্চকোটির গোষ্ঠীর ভেতর সীমাবদ্ধ।

উনিশ শতকের গোড়াতে এ জেলায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার পত্তন শুরু হয়। মেদিনীপুর সহরের কিছু অধিবাসী স্থানীয় ইংরেজদের সহযোগিতায় সামান্য একটি ইংরাজী স্কুল চালু করেন। পরে সরকার গ্রহণ করেন এব পরিচালনার দায়িত্ব। দেখতে দেখতে এটি হাই স্কুলে পরিণত হয়।[১] টীড সাহেব ছিলেন প্রথম প্রধান শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্কুলেই প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন। স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুও এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে স্কুলটি সেকেণ্ড গ্রেড কলেজে রূপান্তরিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে আইন বিভাগও খোলা হয়।

দ্বিতীয় ইংরাজী স্কুল এ জেলায় স্থাপিত হয়েছিল তমলুকে। চার্লস হ্যামিল্টন ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা।[২] ডায়মণ্ড হারবারের উলটো দিকে নিজের জমিদারীর ভেতর মহিষাদলের রাজা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুলে বেতন দিতে হত না। এ ছাড়া আর একটি ইংরাজী স্কুল ছিল মেদিনীপুর সহরে। স্থানীয় ইংরাজরা পরিচালনা করতেন সেটি। ছাত্রসংখ্যা ও মান দুটিই এই স্কুলে ছিল নিচের দিকে।[৩]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শিক্ষা দ্রুত এ জেলায় প্রসারিত হতে থাকে। বিশ শতকের সুরুতেই এক পরিসংখ্যান রিপোর্টে দেখা যায় হাওড়া জেলা ছাড়া বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক-ভাবে প্রসারিত। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় শতকরা দশভাগের ওপর লিখতে

১. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সালে ; সরকার নেন ১৮৩৬ সালে। হাই স্কুল হয় ১৮৪০ সালে। যোগেশ/সেকেণ্ড গ্রেড কলেজ হয় ১৮৭৭ সালে। আইন বিভাগ খোলা হয় ১৮৭৩ সালে। বি. এল. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় ১৮৯২ সালে।

২. প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৩ সালে—W. W. Hunter, SAB, Vol. III.

৩. W. W. Hunter. SAB, Vol-III.

পড়তে জানতেন। পুরুষদের ভেতর এই হার ছিল শতকরা কুড়ি ভাগের ওপর। মেয়েদের ভেতর এক ভাগেরও নিচে।[৪]

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে হিন্দুদের ভেতর ছিল টোল। মুসলমানদের ভেতর মাদ্রাসা। এ জেলার ঘাটাল অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার বেশ প্রচলন ছিল। পণ্ডিতদের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলার সাথে পরিচালিত হত প্রতিষ্ঠানগুলি। কোথাও কোথাও পণ্ডিতেরা বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রদের বাড়িতে রেখেও শিক্ষা দিতেন। বিশ শতকের আগেই[৫] ঘাটাল-নিমতলা সংস্কৃত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতি চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ, সাংখ্য, মীমাংসা ও বেদ ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা নিতে থাকেন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুর, কাঁথি, বড়বড়িয়া, অমর্শী প্রভৃতি জায়গাতেও সমিতি গঠিত হয়। এদের ভেতর কাঁথি সংস্কৃত সমিতিকে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা নেবার ভারও অর্পণ করা হয়।[৬]

সংস্কৃতের মত আরবী ও ফারসী শিক্ষা দেবার জন্য চালু ছিল মাদ্রাসা। পরবর্তীকালে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। পুরনো মাদ্রাসার ভেতর পটাশপুর মাদ্রাসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঠান অধিকারের সময় এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে মারাঠারা যখন পটাশপুর দখল করেন, মাদ্রাসার খরচ-খরচা চালাবার জন্য দুশো বিঘা নিষ্কর জমি এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। মাদ্রাসাগুলির পরিচালনাও ছিল সুষ্ঠু।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার সময় এ জেলায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের ভেতর কাঁথি ও খাজুরীর জাতীয় বিদ্যালয় দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্র নাথ শাসমলের নেতৃত্বে এই দুটি স্কুলের পুঁথিগত বিদ্যার সাথে ছেলেদের কার্যকর বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে খাজুরির স্কুলটি একটি হাই স্কুলে পরিণত হয়। কাঁথির স্কুলটি লবণ আন্দোলনের সময় বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। স্কুলটির নাম এখন বীরেন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয়।

৪. L. S. S. O'Malley.

৫. ২রা জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ।

৬. ১৯০৮ সাল থেকে।

কাঁথির প্রভাত কুমার কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ভবানীচকের জমিদার বিশ্বম্ভর দিন্দা কলেজটি প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। তার মৃত পুত্রের নামেই নামকরণ হয় কলেজটির।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এ জেলায় শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার হয়েছিল[৭], তার কারণ সম্ভবত মেদিনীপুর সিস্টেমের প্রবর্তন। এই সিস্টেমে গুরু বা শিক্ষকেরা বছরের শেষে ছাত্রদের ফলাফল অনুযায়ী পারিশ্রমিক তো পেতেনই, তাছাড়া স্কুলের স্থায়িত্বের জন্য প্রতি তিনমাস অন্তর এক টাকা করে বাড়তি অর্থ পেতেন। বছরে একবার করে পুরস্কারও দেওয়া হত। পুরস্কারের ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল ছাত্রসংখ্যা, গড় উপস্থিতি, তাদের স্থান সংকুলান, শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি।

বর্তমানে[৮] এ জেলায় সাক্ষরতার হার মন্দ নয়। পশ্চিমবাংলায় মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার লিখতে পড়তে জানা লোকের সংখ্যা হাজারে দুশো ষোল জন। মেদিনীপুরে এই সংখ্যা দুশো সাতায়। জেলার ভেতর ঝাড়গ্রাম সহর সাক্ষরতার দিক থেকে বিশিষ্ট। একেবারে পুরোভাগে। এখানে শতকরা চুয়ান্ন জনের ওপর লিখতে পড়তে জানেন। নারী শিক্ষার দিক থেকে এ জেলার স্থান পশ্চিমবাংলায় অষ্টম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা বা এনট্রান্স পরীক্ষা প্রথম চালু করে ১৮৫৭ সালে। সে বছর ও তার পরের বছর এ জেলা থেকে কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ১৮৫৯ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে যে সাত জন ছাত্র সফল হয়েছিলেন তাঁদের ভেতর চারজনের বাড়ি এই জেলাতেই। যথা, বড়মানিক-পুরের অঘোর নাথ দত্ত—ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ইনি পরে পূর্ত বিভাগে উঁচু পদে ছিলেন। অযোধ্যা লাল পাল—মেদিনীপুর কালেক্টরীতে হেড কেরাণী ছিলেন। অলিগঞ্জের ঈশানচন্দ্র বেরা—কালেক্টরেটে সেরেস্তাদার ছিলেন এবং পটাশপুরের মধুসূদন রায়। মধুসূদন এ জেলার প্রথম বি.এ.। খড়্গপুর থানার জকপুর গ্রামের কার্তিকচন্দ্র মিত্র এ জেলায় প্রথম এম.এ. এবং পি. আর. এস.।[৯]

---

৭. তখন সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল ১১৯ টি। এর ভেতর হাই স্কুল ছিল ১৭, মধ্য ইংরাজী স্কুল ৬৩, মধ্য বাংলা স্কুল ৩৯। প্রাথমিক স্কুল ৩,৭৭৯। —L. S. S. O'Malley (1911).

৮. ১৯৬১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী।

৯. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-

স্বাধীনতার পরে কারিগরী শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে পাঁচটি মহাবিদ্যালয় বা সংস্থা স্থাপন করতে উদ্যোগী হন, তাদের প্রথমটি স্থাপিত হয় খড়্গপুরে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়্গপুর শুধু এ জেলা নয়, বাংলা তথা ভারতেরই গৌরব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধোত্তর ভারত পুণর্গঠনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বর্গত নলিনী রঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে।[১০] ইনস্টিটিউটে প্রথম ছাত্র ভর্তি সুরু হয় উনিশ শো পঞ্চাশ সালে। এর আগের বছরই সংস্থাটির প্রাথমিক কাজকর্ম সুরু হয়ে যায়। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে চৌদ্দ শো একর ভূমি দান করেন, যার ওপর বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। খড়্গপুরের কাছে সংস্থাটি হিজলীর এলাকাভুক্ত। খড়্গপুর আগে থেকেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের জন্য একটি শিল্পাঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কাছাকাছি শিল্পাঞ্চলগুলিতে গিয়ে হাতেকলমে কাজ শেখার পক্ষে এখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনুকূল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেধাবী ছাত্রদের যে সমাবেশ এখানে ঘটে তাতে শিক্ষার সাথে সাথে জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও কৃষ্টির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বৃহত্তর জাতীয় সমন্বয়ের একটি ধারাও এখানে গড়ে উঠছে। যেসব বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের ভেতর কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যা, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা, বিমান সংক্রান্ত বিষয়, রসায়ন ও রসায়নবিষয়ক প্রযুক্তি বিদ্যা, বাস্তু বিদ্যা, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিকস, ভূতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিষয়ক পদার্থবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, হিউম্যানিটিজ, গণিতশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, পোতনির্মাণ ও নদীবিষয়ক বিদ্যা, পদার্থ ও মেটিরিওলজি প্রধান। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংস্থাটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে এ জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের বিষয়ও রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন।

লয়ের কৃতী ছাত্রদের ভেতর সূর্যকুমার অগস্তী, এম. এ., পি. আর. এস., জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। নীলকণ্ঠ মজুমদার, এম. এ., পি. আর. এস., কটক র‍্যাভেনসা কলেজের অধ্যক্ষ। বিপিন বিহারী দত্ত ও চন্দ্রশেখর সরকার নামকরা উকিল। আবদার রহিম, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি। ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত, নামকরা ব্যারিস্টার। বীরেন্দ্র নাথ দে, মধ্যপ্রদেশের রাজস্ব কমিশনার ও কেম্ব্রিজের সিনিয়র।

১০. কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। কমিটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করেন ১৯৪৬ সালে। বাকি চারটি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও দিল্লীতে অবস্থিত।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি :

এ জেলার প্রাচীন ইতিহাসের মত এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনও অত্যন্ত পুরনো। অবলুপ্ত যে প্রাচীন সংস্কৃতি একদিকে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) ও অন্যদিকে ঝারিখণ্ড বা ঝাড়খণ্ডকে (ঝাড়গ্রাম) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, কালের নির্দয় শাসনে তার বিনাশ ঘটলেও পরবর্তী কালে যে সংস্কৃতি নতুন করে দানা বেঁধে উঠেছিল সে ঐতিহ্যও নেহাত তুচ্ছ নয়। লিপি বা লেখ্য মাধ্যম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করার আগে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, তক্ষণশিল্প ইত্যাদিই ছিল মানুষের কল্পনা ও আন্তরিক ভাবনা চিন্তাকে রূপ দেবার একমাত্র উপায়। কিন্তু পাথর বাংলায় সহজে মেলেনা তাই রাজারাজড়া ও ধনবান জমিদার ছাড়া সাধারণ মানুষের শিল্পকর্ম প্রধান যে মাধ্যমটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল তা মাটি। হাত বাড়ালেই এটি পাওয়া যায়। কোমল, নমনীয় সহজলভ্য এই মাধ্যমটির ওপর অল্প আয়াসেই কল্পনার রূপটি ফুটিয়ে তোলা যায়। একে পুড়িয়ে শক্ত করে ধরে রাখাও যায় অনেকদিন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তাই পোড়ামাটি বা টেরাকোটার কাজ ছিল সব থেকে জনপ্রিয়। বড় বড় পাথুরে শিল্পকর্মের পাশে এর চেহারা অতি ক্ষুদ্রাকার মনে হলেও, এই ত্রুটি পুষিয়ে দিয়েছিল এর প্রাচুর্য্য।

প্রাচীন টেরাকোটা শিল্পের জাগ্রত কেন্দ্র ছিল তমলুক[১]। উনিশ শতকের শেষদিকে তমলুকে একটি ঢিবি থেকে যে টেরাকোটার মূর্তি[২] ও ছাঁচে ঢালাই তামার মুদ্রা পাওয়া যায় তা থেকেই সুরু হয় এখানকার প্রাচীন টেরাকোটার শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। কাল নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা যায় মূর্তিটি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এরপর আরো কয়েকটি প্রাচীন টেরাকোটার মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হাড়ের আয়ুধ ও জিনিষপত্র, শুঙ্গ, মৌর্য ও গুপ্ত যুগের শিল্প সামগ্রী এখানেই একটি মিউজিয়ম বা যাদুঘরে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়েছে[৩]। এ জেলায় পাথরের মূর্তি যা পাওয়া

---

১. Early Sculpture of Bengal—S. K. Saraswati (Samodhi, 1962).

২. মূর্তিটি ১৮৮৮ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির (বাং) একটি সভায় প্রদর্শিত হয়। এখন কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

৩. তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র (তমলুক), তমলুকের কয়েকজন সুধীব্যক্তির প্রচেষ্টায় গঠিত (১৯৭৬)। সংগ্রহশালাটির এখনও পর্যন্ত নিজস্ব কোন গৃহ নেই। তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির দু'খানি ঘর এজন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

যায় তা বেশীর ভাগই পাল ও সেন আমলের। সেনওপাল পর্বের আগে পাথরের উল্লেখযোগ্য মূর্তি বলতে জৈন মূর্তি। জৈন তীর্থঙ্করদের ভেতর ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৭ অব্দে মানভূম জেলার সমেতশিখরে (পরেশ নাথ পাহাড) মোক্ষলাভ করেন। তিনি পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর পরে চতুর্বিংশ বা শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন মহাবীর যাঁর অন্য নাম বর্ধমান স্বামী। জৈন ধর্ম যে এক সময় এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার অন্যতম সাক্ষ্য গোদাস প্রবর্তিত তাম্রলিপ্তিকা শাখা। জৈন মূর্তিগুলির কিছু কিছু এখনও পূজো পেয়ে আসছেন যদিও জৈন তীর্থঙ্কর হিসাবে নয়।

রামগড পরগনার নেপুরা বনধার মৌজায় একটি মূর্তি ধন্বন্তরি হিসাবে পূজিত হন। প্রকৃতপক্ষে মূর্তিটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীর।[৪] রামগডের রাজা এর পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখান থেকে দু'মাইল দূরে ডুমুরতোডেও পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি ছিল। মূর্তিটি কালামদন নামে পরিচিত। পূজক ভোক্তা উপাধিধারী। আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, এই মূর্তির সামনে পূজো উপলক্ষে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।[৫] নেপুরা বলরামপুর মৌজায় আর একজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী[৬] সেটি মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদে এনে রেখেছিলেন। এ ছাডা এ জেলার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় কত যে মূর্তি অনাবিষ্কৃত ও অবহেলিত হয়ে মাঠে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানকার বড বড কীর্তিগুলির ভেতর আছে মন্দির ও মসজিদ, দুর্গ বা গড, বড বড পুকুর বা সরোবর এবং প্রস্তর মূর্তি। তমলুকের বর্গভীমা দেবীর মন্দির, কর্ণগডের দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির, গড়বেতা, গগনেশ্বর ও নয়াগ্রামের পাথরের দুর্গ ভাস্কর ও স্থপতিদের কর্মকুশলতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। দাঁতনের শরশঙ্ক দীঘি বাংলায় অন্যতম। বগডীর কৃষ্ণরায় জীউ, কেশিয়াডীর সর্বমঙ্গলা, খেলাডের ঘোডায়চডা যুগলমূর্তি, দোরো পরগনার মাধবমূর্তি গঠনশৈলীতে চমৎকার।

এখানকার মন্দিরগুলি 'বেশীরভাগই উড়িষ্যার স্থাপত্য রীতি অনুসারী।

৪. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু (২য় সং, ১৩৪৬)

৫. ঐ

৬. ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরই যেন এদের আদল। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে উড়িষ্যার প্রভাব এত বেশী যে অধিকাংশ দেব মন্দির, সৌধ ও গড উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে গড়ে উঠেছিল বলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না।

শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মত সাহিত্যেও এ জেলার অবদান কম নয়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যখন মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা যান, তখন থেকেই এখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লাভ ঘটতে থাকে। শ্রীচৈতন্য হাজীপুর হয়ে তমলুক এসেছিলেন। এখানকার ডায়মণ্ডহারবারের নাম ছিল তখন হাজীপুর। তমলুক থেকে মেদিনীপুর, নারায়ণগড ও দাঁতন হয়ে তিনি গিয়েছিলেন উড়িষ্যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের পর তিন প্রভুর আবির্ভাব হয়। মধ্যবঙ্গে শ্রীনিবাস, উত্তরবঙ্গে নরোত্তম ও উৎকলে বা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে শ্যামানন্দ।

ষোড়শ শতকে এ জেলার দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা দুরিকা। আদি নিবাস ছিল এখনকার কলাইকুণ্ডার কাছে ধারেন্দা গ্রামে। সেখান থেকে বাস উঠিয়ে এরা দণ্ডেশ্বরে যান। শ্যামানন্দের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য। যৌবনে বৈরাগী হয়ে শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে যান এবং শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সাথে জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারই আদেশে মেদিনীপুরে এসে ধর্মপ্রচারে মন দেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "অদ্বৈত তত্ত্ব।" এ ছাড়া উপাসনা-সার সংগ্রহ ও বৃন্দাবন পরিক্রমা নামে আরও দুটি গ্রন্থ আছে। আনুমানিক ১৬৩০ খ্রীঃ তিনি লোকান্তরিত হন।

শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন রসিকানন্দ। তিনি গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অচ্যুতানন্দ, মাতা ভবানী, স্ত্রীর নাম ছিল ইচ্ছা দেবী। জন্মস্থান ডুলং নদীর তীরে রোহিণী গ্রাম (এখনকার সাঁকরাইল থানায়)। শ্যামানন্দের শিষ্যগণ বারোটি শাখায় বিভক্ত হন। কেশিয়ারীতে ছিলেন চার ঘর। কিশোর, উদ্ধব, পুরুষোত্তম ও দামোদর। রোহিণীতে ছিলেন রসিকানন্দ ও মুরারি। ধারেন্দাতে দামোদর। বড়গ্রামে চিন্তামণি, রাজগ্রামে বলভদ্র, শ্রীজগতেশ্বর হরিহরপুরে, মধুসূদন সাঁকোয়াতে, ভোগরাইতে ছিলেন আনন্দানন্দ। বারো শাখার ভেতর এগারোটিই মেদিনীপুরে। একমাত্র ভোগরাই পরবর্তীকালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোপীবল্লভ রায়কে রসিকানন্দই গোপীবল্লভপুরে

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'শাখা বর্ণন' ও 'রতি বিলাস' নামে দু'খানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন তিনি। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস অবলম্বন উপলক্ষে শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে নিচের চারটি পংক্তি দ্রষ্টব্য—

কহে মধুশীল আমি কি দুঃশীল
কি কর্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু পদ না সেবিনু
পাইয়া গোলকস্বামী।...

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে রসিকানন্দ পরলোক গমন করেন।

রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন গোপীজনবল্লভ দাস। জন্ম নারায়ণগড় থানার ধারেন্দা গ্রামে। পিতা রসময় দাস শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। 'রসিক মঙ্গল' গোপীজনবল্লভ দাসের অন্যতম কীর্তি। এই গীতিকাব্য খানি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, শ্রীগোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদির মত সুর করে গাওয়া হত। গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব যুগের একটি কীর্তি বলে স্বীকৃত।

শ্যামানন্দের দ্বিতীয় শিষ্য ছিলেন দামোদর। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত দামোদরের জন্ম কেশিয়াড়ীতে। তার শিষ্যদের মধ্যে গোবর্দ্ধন ও বলরাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা দু'জনেই এ জেলার অধিবাসী। গোবর্দ্ধন শ্যামানন্দের পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁর সাতটি পদ পাওয়া গেছে। একটি পদের একাংশের উদাহরণ দেওয়া গেল—

মধুর কেলি মধুর মেলি মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যাম গোরী কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন ইন্দু তাহে শ্রমজল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া॥

দামোদরের শিষ্য কানুরাম দাস বা কানু দাসও একজন বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। জন্ম ধারেন্দা গ্রামে, রসিকমঙ্গলের অনেক জায়গায় তার উল্লেখ আছে। কানু রচিত চৌদ্দটি পদ পাওয়া গেছে। একটি পদাংশের উদাহরণ—

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহি সজল নয়ান।

সচকিতে সঘনে　　নয়নে ধনী নিরখয়ে
জানল আওল কান ॥

বাসুদেব ঘোষ বা বাসু ঘোষ বৈষ্ণব যুগের একটি উজ্জ্বল রত্ন। এ জেলায় জন্ম না হলেও এখানে থাকাকালীনই তিনি তার পদাবলীও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাসুদেবের পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল কুমারহট্টে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস নেবার পর বাসুদেব তমলুকে এসে বসবাস করতে থাকেন। সাহিত্য মূল্য ছাড়াও গৌরাঙ্গের অনুচর হিসাবে তার পদাবলী ঐতিহাসিক দিক দিয়েও মূল্যবান।

শচীর মন্দিরে আসি　　দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা　　নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥

ভাষা সহজ সরল, ছন্দ সুললিত, সংকীর্তনে গাওয়ার মত। ফলে বাসুদেবের পদাবলী লোকমুখে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'গৌরাঙ্গ চরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গ্রন্থ দুখানিও তার রচনা।

শ্যামানন্দের অন্যতম শিষ্য শ্যামদাসও সুকবি ছিলেন। নামের মিল ও একই জেলায় জন্ম হওয়ার জন্য অনেকেই শ্যামানন্দ ও শ্যামদাসকে একই ব্যক্তি বলে ভুল করে থাকেন।[৭] দুজনেই আবার নামের আগে দুঃখী শব্দটি জুড়তে ভালবাসতেন। শ্যামদাসের জন্ম কেদারকুণ্ড পরগণার হরিহরপুরে। বাবার নাম শ্রীমুখ, মা ভবানী। দুঃখী শ্যামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "গোবিন্দ মঙ্গল।" এ ছাড়া একখানা 'একাদশী ব্রত' কথাও লিখেছিলেন। গোবিন্দ মঙ্গলের পদ্যাংশ উদাহরণ স্বরূপ নিচে দেওয়া হল :

রঙ্গিম অধর শ্যাম　　রাঙ্গা আঁখি অনুপাম
রঙ্গিম বসন কটি মাঝে।
রসনা কিঙ্কিনী সাজে　　রতন মঞ্জীর রাজে
রাঙ্গা পায় রুণু ঝুণু বাজে ॥

শ্যামদাস নিজেই গোবিন্দ মঙ্গলের গান গেয়ে গেয়ে জেলার নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন তিনি। নানা ধর্মের শিষ্যও ছিল তাঁর অনেক।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব প্রভাব এ জেলায় শুধু পুঁথিপত্তরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ

৭. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু (২য় সং)।

৬

ছিলনা, নানা উপজাতি ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। এখানকার সাধারণ মানুষের ভেতর বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরক্তি এখনও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ঐতিহ্য, দুর্বলভাবে হলেও, অনুসরণ করে চলেছে।

বৈষ্ণবযুগের পর বাংলা সাহিত্যে যে যুগ এসেছিল আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন[৮] তাকে সংস্কার যুগ আখ্যা দিয়েছেন। সংস্কার যুগের সাহিত্যে তিনজন প্রধান পুরুষ। কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য। এই তিনজনের সাথেই মেদিনীপুর কোন না কোন দিক দিয়ে জড়িয়ে আছে।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। ষোড়শ শতকের শেষভাগে তাঁর আবির্ভাব। আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় তাঁর আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দামুণ্যা বা দামিন্যা গ্রামে। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি ঘর ছেড়ে পথে বার হন (১৫৪৪খ্রীঃ)। অনাহার ও দারিদ্র্যে অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে,—

তৈল বিনা কৈনু স্নান   করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হলেন এ জেলার ঘাটাল থানার অধীন আরড়া গ্রামে। সেখানে বাস করতেন ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়। তিনি এই গুণী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে 'দশ আড়া মাপি দিলা ধান' এবং

ধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিলা পূজিত।

মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ) তখনও মুকুন্দরাম জীবিত ছিলেন।[৯] তার চণ্ডীমঙ্গল উচ্চাঙ্গের কাব্য। ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর এবং মানবিক সুর তুলনারহিত। সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষ ও নিখুঁত দলিল এই কাব্য। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পুরোধা বা গুরু ছিলেন বলরাম কবিকঙ্কণ। মুকুন্দরাম নিজেই বলেছেন, 'গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ'। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁর কাব্য উড়িষ্যায় জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তর লাভ করেছিল।[১০]

৮. বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন (১৯১৪)।

৯. বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ২য় খণ্ড (১৩৮০)

১০. Ibid।

সপ্তদশ শতকে মহাভারতের সার্থক ও জনপ্রিয় অনুবাদ করেছিলেন কাশীরাম (দেব) দাস। যদিও মহাভারতের সামগ্রিক অনুবাদ একাধিক অনুবাদকের সংকলন,[১১] তবু এটি কাশীরামের নামেই প্রচলিত। জাতিতে কায়স্থ, পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি মতান্তরে সিদ্ধি গ্রামে।[১২] তিন ভাই, বড় শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, মেজ কাশীরাম, ছোট গদাধর। তিনজনেই কবি। কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার আবাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থেকে পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন।[১৩] এখানে থাকাকালীন তিনি অনুবাদ করতে সুরু করেন।[১৪] অনুবাদ পুরোপুরি শেষ হবার আগেই অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মাত্র প্রথম চারটি পর্ব অনূদিত করতে পেরেছিলেন। বাকি অংশের কিছু অনূদিত করেন ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম কিছু অংশ নিন্দানন্দ ঘোষের আগেকার লেখা অংশ। পরবর্তী কালে অন্যান্য কবির লেখা থেকেও সংযোজিত হয় কিছু।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন এ যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন (১৭১০খ্রীঃ) এ সময়ের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। রামেশ্বরের আদি নিবাস ছিল ঘাটালের কাছে বরদা পরগনার যত্নপুর গ্রামে। পিতার নাম লক্ষ্মণ, মাতার নাম রূপবতী, দুই স্ত্রী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভাসিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারে তিনি ঘর ছেড়ে পথে বার হন। মেদিনীপুরের কাছাকাছি কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহ তাকে আশ্রয় দেন।

---

১১. History of Bengali Literature—Dr. Sukumar Sen (Revised Edn., 1971).

১২. বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার, ২য় খণ্ড (১৩৮০)।

১৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু (২য় সং)।

১৪. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন "কমলাকান্ত দেব দেশত্যাগ করে উড়িষ্যায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানেই কাশীরাম দাসের মহাভারত রচিত হয়।" (বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল, ২য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৩৮৯)।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "Kasiram wrote his unfinished poem some time in the first decade of the Century. He belonged to South-West Bengal but his family had come from the North Radha on the West bank of the Hoogly."

(History of Bengali Literature, Sahitya Academi, Revised Edn. 1971, Page 123)

সম্ভবত মেদিনীপুরে থাকাকালীনই তিনি মহাভারত অনূদিত করেন—লেখক।

শিবায়ণে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের কৃষিনির্ভর দরিদ্র সামাজিক অবস্থা নিপুণভাবে বর্ণিত। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মানুষের প্রতি সহানুভূতি গভীর। এ কাব্যে শিব ও গৌরী দরিদ্র চাষী ও চাষী-ঘরণী হিসেবে চিত্রিত। দুবেলা দুমুঠো ভাত ও পরনের একখানা শাড়ি হলেই চাষী-বৌ তুষ্ট। এদের সাংসারিক অবস্থা এতই হীন যে গৌরী শিবের কাছে দুগাছা শাঁখা পরতে চেয়েছিলেন, তাতে শিব ঠাট্টা করে বললেন—

> ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
> কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
> বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
> জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

এমন কথায় কার না রাগ হয়। পার্বতীরও রাগ হল। টিপ করে শিবের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে ছেলেদুটিকে সঙ্গে নিলেন। তারপর—

> কোলে করি কার্তিকেয় হস্তে গজানন।
> চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥

বিপাকে পড়লেন শিব। কি আর করেন! অগত্যা,—

> দৌড়াইল গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু।
> শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥

এ প্রসঙ্গে রামেশ্বরের রসিকতাটুকুও চমৎকার—

> রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি।
> পাথারে ফেলিয়া গেল পর্বতের ঝি॥

এ যেন বাঙ্গালীর ঘরেরই নিত্যনৈমিত্তিক ছবি। যেমন ঘরোয়া, তেমনি আন্তরিক। রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহ ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। শিবায়ণ আট পালা গীত। লোকের মুখে মুখে গেয় এই গীত এ অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিবসংকীর্তন ছাড়া রামেশ্বর 'সত্যনারায়ণের কথা'-ও রচনা করেছিলেন।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন কবি। কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দির ছিল তাঁর তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র। যশোবন্ত সিংহও ছিলেন তন্ত্রসাধক। মহামায়ার সামনে পঞ্চমুণ্ডী আসনে[১৫] বসে তিনি যোগসিদ্ধ হয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি।

---

১৫. বানর, শৃগাল, পেচক, বাদুড়, কুমীর (কারও মতে বাঘ)—এই পাঁচটি জন্তুর মাথার ওপর যে আসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার নাম পঞ্চমুণ্ডাসন।

আঠারো শতকের মাঝামঝি আর একজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটে এ জেলায়। নাম নিত্যানন্দ চক্রবর্তী।[১৬] তখন বাংলায় শীতলামঙ্গল লেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় কাব্য ছিল নিত্যানন্দের।[১৭] কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ, পিতার নাম মহামিশ্র, নিবাস ছিল কাশীজোড়ার কানাইচকে।

ধর্মমঙ্গল রচয়িতা বিখ্যাত কবি মানিক গাঙ্গুলীও সম্ভবত ঘাটালের উত্তরাংশে জাহানাবাদ পরগনার বেলডিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিদের ভেতরে ছিলেন অকিঞ্চণ চক্রবর্তী, হরিরাম, দ্বিজ গঙ্গাদাস, প্রাণবল্লভ ঘোষ, দয়ারাম দাস ও কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ছিল কবিয়ালের যুগ। এরা মুখে মুখে ছড়া বেঁধে অপর কবিয়ালের সাথে পাল্লা দিতেন। চন্দ্রকোনা শহরে এমনি একটি কবিয়াল পরিবার ছিল। তিন পুরুষের সকলেই মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারতেন। এদের ভেতর সব থেকে নামকরা ছিলেন রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা রকম ছড়া ছিল তাঁর। যেমন—

কার বামা এল সমরে।
জলদ রূপসী, চঞ্চলা ষোড়শী, করেতে অসি, সঘনে নাদ করে।

অথবা, এখন বাসনা করি এখানে বাস না করি
সমাধি হইগে শিবে।
আমার অশিবে, বিনা শিবে, কেবা বিনাশিবে।

রমাপতির পিতা গঙ্গাবিষ্ণুও ছিলেন সঙ্গীতকার। তাঁর কতকগুলি জনপ্রিয় গান আছে। গঙ্গাবিষ্ণুর পিতা রামসুন্দরের দক্ষতা ছিল ভক্তিগীতি রচনায়। রমাপতির স্ত্রী করুণাময়ী দেবীও সঙ্গীত রচনায় পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামী গাইতেন।

সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।

---

১৬. এই বংশে প্রথমে ডিংশাই, পরে মিশ্র এবং আরও পরে চক্রবর্তী উপাধি প্রচলিত হয়।—ঘাটালের কথা, পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় (১৯৭৭)।

১৭. History of Bengali Literature—Dr. Sukumar Sen. (1978)

১৮. ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায় (১৯৭৭)।

স্ত্রী উত্তর দিতেন—

সখি, শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।[১৯]

তারিণী দেবী এ জেলার প্রাচীন মহিলা কবি। ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগনায় তাঁর জন্ম। সাধারণের কাছে তারিণী ব্রাহ্মণী বলেই তিনি পরিচিত ছিলেন। প্রায় শ চারেক গান তিনি রচনা করেছিলেন।

এ ছাড়া পিংলার কৈলাসেশ্বর বসু, ক্ষীরপাইয়ের রামনারায়ণ ভাট, হবিব-পুরের নবীন বাউল, চন্দ্রকোনার যজ্ঞেশ্বর বা জগা ধোপা ও ঘাটালের হরিবোল দাসও কবিয়াল হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। এঁদের ভেতর একবারে নিরক্ষরও ছিলেন কয়েকজন।

বাংলা সাহিত্যে যে দুই প্রতিভাধর পুরুষ বাংলা গদ্যের প্রবর্তক ও তার গঠন শৈলীর পুরোধা, তাঁদের দু'জনেরই জন্মস্থান বলে এই জেলা দাবী করতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট লেখকদের অন্যতম, তাঁর গদ্যের মান উঁচু, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাথে সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের সংযোগও সাধিত হয়েছে ভাষায়। জন্ম আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায়।[২০] প্রথম গ্রন্থ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), পরবর্তী গ্রন্থগুলি হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮)। সব থেকে নামকরা প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। অপর গ্রন্থ বেদান্তচন্দ্রিকা—রামমোহন রায়ের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে রচনার প্রত্যুত্তর। তাঁর মৃত্যুর (১৮১৯) এক বছর পরে এই জেলাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। এখনকার ঘাটাল থানার[২১] অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪) কথামালা ও চরিতাবলী (১৮৫৬), সীতার বনবাস (১৮৬০) ও অন্যান্য গ্রন্থ বাংলা গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর আনে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ

১৯. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু, ২য় সং।

২০ মেদিনীপুর জেলায় যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম বলে কথিত, সে অঞ্চল তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। ফলে কেউ কেউ তাঁকে উড়িষ্যার অধিবাসী বলেও মনে করেন।

২১. তখন ঘাটাল থানা হুগলীর অন্তর্গত ছিল। ১৮৭২ সালের এক বিজ্ঞপ্তিতে মেদিনী-পুরের সাথে সংযুক্ত হয়। বিদ্যাসাগরের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ (বাং ১২ আশ্বিন, ১২২৭)। মৃত্যু ২৯ জুলাই ১৮৯১. (বাং ১৩ শ্রাবণ, ১২৯৮)।

শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।"

শুধু সাহিত্য নয়, চারিত্র মহিমাতেও তিনি ছিলেন অনন্য। সমতল ভূমির ভেতর হিমালয়। উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট। এই মহাপুরুষের জন্যেই মেদিনীপুরের নাম সারা ভারতের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত।

ঈশানচন্দ্র বসু এ জেলার একজন কৃতী গদ্য লেখক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভাষা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক পুঁথিও সংগ্রহ করেছিলেন। রামেশ্বরের শিবায়ণ, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, দুঃখী-শ্যামের গোবিন্দমঙ্গল তাঁর সম্পাদকতায় বঙ্গবাসী কার্যালয়ে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ ছাড়া এ জেলায় কাজের খাতিরে অনেক সুধী ও সাহিত্যিক এসেছিলেন। তাদের ভেতর অনেকে এখানে যে সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে সেসব বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৯২ সালের কাছাকাছি সময়ে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর ছিলেন।[২২] এর দুবছর আগে [২৩] দ্বিজেন্দ্র লাল রায় সুজামুঠা পরগনার সেটেলমেণ্ট অফিসার হয়ে আসেন। তখন সুজামুঠা ছিল বর্ধমান স্টেটের ভেতর। থাকতেন কাজলাগড়ে কাজলদীঘির পাশে। এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও দীঘিটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেখানে থাকাকালীন তিনি অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন, যার কিছু কিছু পরবর্তীকালে লেখা নাটক-গুলিতে স্থান পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবরাম চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ছিলেন। সেটেলমেণ্টের কাজে হিজলী, মাজনামুঠা, নাড়ুয়ামুঠা, সীপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় বন্দোবস্তের কাজ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্কুলে ভর্তি হন এখানেই[২৪], মেদিনীপুর হাই স্কুলে। কাঁথির (নেগুঁয়া) মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আবার যখন আসেন[২৫], তখনই কপাল-

---

২২. এ সময় তিনি সম্ভবত 'সমাজ' নামক সামাজিক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলেন।

২৩. ১৮৯০ সাল। ছিলেন প্রায় তিন বছর, ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত।

২৪. ১৮৪৪ সাল।

২৫. ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০, কাজে যোগ দেন। এই বছরই জুন মাসে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথম বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে, ১৮৪৯ সালে। সেই স্ত্রী মারা যান।

কুণ্ডলা উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন বলে বলা হয়। কাঁথিরই দুটি গ্রাম দৌলতপুর ও দরিয়াপুর এবং রসুলপুর নদী কপালকুণ্ডলায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এ ছাড়া রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন।[২৬] তাঁর আত্মজীবনীতে তখনকার মেদিনীপুর মূর্ত হয়ে আছে।

উনিশ শতকের শেষদিকে এ জেলায় আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন বলে দাবি করা হয়।[২৭] তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কিন্তু পরিচিতি মানবেন্দ্র নাথ রায় নামে। জন্ম ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। দাসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামে। পিতার নাম দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। দীনবন্ধু চব্বিশ পরগনার আড়িখালিতে সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন, থাকতেন শ্বশুরবাড়ি কোদালিয়া গ্রামে। লেনিনের ডাকে ১৯১৯ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবে যোগ দেন। লেনিন ও ট্রট্স্কীর সহযোগী হয়ে কাজ করেন। তাঁর বহু মূল্যবান রচনা আছে। বহুভাষাবিদ্ এই বিপ্লবীর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ সালে। বিখ্যাত পরিব্রাজক ও সাহিত্যিক জলধর সেন এখানকার মহিষাদল রাজ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

বিশ শতকে কার্যোপলক্ষে অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ও সাহিত্যিক এ জেলায় আসেন। এঁদের ভেতর বিখ্যাত বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোল রাজবাড়িতে দেবেন্দ্রলাল খাঁনের গৃহশিক্ষক ছিলেন। অন্নদা শংকর রায় ছিলেন জেলা জজ (১৯৪০), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত সাব-জজ (১৯৫৩), চারুচন্দ্র চক্রবর্তী বা জরাসন্ধ ছিলেন জেলা সুপার (১৯৪২), কবি জীবনানন্দ দাস খড়্গপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দীনেন্দ্র কুমার রায় ছিলেন মহিষাদল রাজ স্কুলের ছাত্র (১৮৮৮), পরে ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করে-ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন ঘাটাল ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র।[২৮]

মিঃ এইচ. ভি. বেলী যখন এ জেলার কালেকটর সেই সময় (১৮৫১) কয়েকজন ইংরেজ ও স্থানীয় লোকের পরিচালনায় 'Midnapore and Hijli Guardian' বা 'মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ' নামে একখানি

২৬. ১৮৫১—১৮৬৬ সাল।

২৭. ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়।

২৮. এই অনুচ্ছেদের তথ্যগুলি রামনারায়ণ পাঠাগার প্রকাশিত ও আজাহারউদ্দিন খাঁন সম্পাদিত 'বীক্ষণী' থেকে গৃহীত।

দ্বিভাষিক সংবাদপত্র সর্বপ্রথম এ জেলায় প্রকাশিত হয়।[২৯] মিঃ বেলীর উৎসাহে সর্বপ্রথম পাঠাগারও খোলা হয় এখানে। স্থানীয় ব্যক্তিদের আগ্রহে নাসের আলি খানের দেওয়া জমিতে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে।[৩০] এখনও পাঠাগারটি চালু। নাম বদলে এখন হয়েছে ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার। মেদিনীপুরে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের ভেতর মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালে। বহু গুণী ব্যক্তি ও বাংলা তথা ভারতের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা এর বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থেকে এই জেলাকে মহিমান্বিত করেছেন। এখানে বহু মূল্যবান পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া আর একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল'। ১৯৩৮ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উদ্বোধন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঠারো-উনিশ শতকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ জেলায় যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, বিশ শতকে তাতে বেশ কিছুটা ভাঁটা পড়ে। বর্তমান কবি ও সাহিত্যিকদের ভেতর বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ স্থান একমাত্র মহাকালই সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারে। এ কালের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর জন্মস্থান খড়্গপুরে।

সাহিত্যের মত সঙ্গীতেও এক সময় এ জেলার অবদান নেহাত কম ছিল না। চন্দ্রকোণা ছিল জেলার ভেতর সঙ্গীতের পীঠস্থান। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিন পুরুষ ধরে এই পরিবার সঙ্গীতের যে অনুশীলন করে চলেছিলেন, তাতেই এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মুখে মুখে ছড়া রচনা ছাড়াও রমাপতি সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। পিতা গঙ্গাবিষ্ণু পেশায় ছিলেন কাঁথির নিমক মহালের দেওয়ান। সঙ্গীতের পরে তাঁর ছিল নাড়ির টান। যতদূর জানা যায় তিনি

২৯. Midnapore and Hijli Guardian—Monthly Magazine, Printed in English and Bengali, started under the patronage of H. V. Bayley, Esq.—A Descriptive Catalogue of Bengali works : Rev. J. long. (1855)

সংবাদ প্রভাকর (আগস্ট, ১৮৫১)

৩০. Report on the District of Midnapore including Hijelee-Henry Ricketts, I.C.S. (1858).

নিজেও ছিলেন পাখোয়াজ বাদক ও ধ্রুপদ-গায়ক।[৩১] গঙ্গাবিষ্ণুর দাদা রামকৃষ্ণেরও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। পশ্চিমের দুজন খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ মহম্মদ বখ্‌স্‌ ও আসমৎ উল্লাকে তিনি পাঁচ বছর তাঁর বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। রমাপতির জীবনে এদের প্রভাব কম ছিল না। পরিণত বয়সে রমাপতি বর্ধমানরাজ মহাতপচাঁদের দরবারী গায়ক ছিলেন। বৈঠকী সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি বেছে নিয়ে "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামে একখানি পুস্তকও রচনা করেছিলেন।

চন্দ্রকোণার আর একজন প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। জন্ম, ১৮১৩খ্রীষ্টাব্দে, চন্দ্রকোণায়। পিতা রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যয়ের বৃত্তি ছিল কথকতা। ইচ্ছে ছিল পুত্রও সেই বৃত্তি গ্রহণ করুক। গানের ওপর পুত্রের অনুরাগ দেখে তিনি তাকে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দেন। অন্যান্য অনেক ছাত্রের মত ক্ষেত্রমোহনও ছিলেন তাঁর আবাসিক ছাত্র।

সে শিক্ষা যে নিষ্ফল হয়নি, ক্ষেত্রমোহনের জীবনই তার প্রমাণ। ভারতবর্ষে প্রথম ঐকতান সংগঠিত করেছিলেন তিনি।[৩২] সময়, ১৮৫৮ সালের জুলাই মাস। উপলক্ষ্য ছিল বেলগাছিয়া নাট্যশালায় "রত্নাবলী" নাটকের প্রথম অভিনয়। অনেকের মতে তিনি প্রথম স্বরলিপিকারও।[৩৩] স্বরলিপি সহ কয়েকখানা গানেব বই ও সঙ্গীতবিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। এদের ভেতর 'সঙ্গীতসার' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'সঙ্গীত সমালোচনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতেন।[৩৪] সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তাঁর প্রতিভা যে কতখানি ছিল সে বিষয়ে তানসেনবংশীয় ভারতখ্যাত দুই সঙ্গীতজ্ঞ ধ্রুপদী ও রবাবী, বাসৎ খাঁ ও রবাবী ও বীনকার কাসিম আলি খাঁর মন্তব্য স্মরণীয়। "আমাদের সময়ে এই (সঙ্গীত) শিল্পের একজন পারদর্শী জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁকে এই শিল্পের নায়ক বলা যায়।"[৩৫] বাংলার সঙ্গীত জগতে তিনজন কৃতী পুরুষ ছিলেন তাঁর শিষ্য, যথা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১. বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কে এল এম (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৭৬।
৩২. Reminiscences of Michael M. S. Dutta—Gour Das Bysack.
৩৩. Ibid. ৩১
৩৪. 'বীক্ষণী'—আলাহারউদ্দীন খান সম্পাদিত।
৩৫. সঙ্গীতসার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (প্রশংসাপত্র), ১৮৬৯।

বিশিষ্ট বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও খ্যাতনামা লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় কর্মসূত্রে তমলুকে বসবাস করতেন। কিশোরীলালের গুরু মুরাদ আলী মাঝে মাঝে তমলুকে এলে গানের আসর বসত।[৩৬] তবে এই সঙ্গীত আসর ছিল একান্তভাবেই ঘরোয়া। মহিষাদলের গর্গ পরিবার ও পটাশপুরের জমিদার পরিবারের সঙ্গীত চর্চাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নাট্যচেতনা ও নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ জেলার ঐতিহ্য পুরনো হলেও খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়। যদিও বিশ শতকের প্রতিভাবান ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্ম এখানেই। পিতা হরিদাস ভাদুড়ীর পৈত্রিক ভিটা ছিল হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে। শিশিরকুমারের জন্মের আগে তাঁর মাতা কমলেকামিনী এসেছিলেন তাঁর পিতা রামকিশোর আচাযের মেদিনীপুরের বাড়িতে। দোসরা অক্টোবর ১৮৮৯ সালে এখানেই তাঁর পুত্র হয়।

এ জেলায় প্রথম নাটক অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ১২৮২ সালে। পরপর দু'দিন দুটি নাটক, যথাক্রমে 'রাম বনবাস' ও 'মেঘনাদ বধ'। স্থান, মালঞ্চ গ্রামে প্রিয়নাথ রায়ের বাড়ি।[৩৭] তখনও কলকাতা ও মেদিনীপুরের ভেতর চালু হয়নি রেলপথ। জলপথই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। নীলরতন সরকার কলকাতা মেডিক্যাল ক্যাম্বেল স্কুল থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী যুবক নিয়ে একটি অস্থায়ী নাটক দল গঠিত হয়। তাদেরই প্রচেষ্টা এই নাটক দুটি।

এরপর নাটক হয় ঘাটাল মহকুমার জাড়া গ্রামে। কিশোরীপতি রায়ের পিতা যোগেন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ি। মেদিনীপুর সহরে প্রথম নাটক হয় বাংলা ১২৮৫ সালে, চিড়িমারসাইতে রামগোবিন্দ নন্দীর দোতলার ঘরে। মাঝে আর যেসব নাটক অনুষ্ঠিত হয় তা এদেরই মত অস্থায়ী ও প্রক্ষিপ্ত।

নাট্য সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা এ জেলায় প্রথম হয় বাংলা ১২৮৯ সালে, কলাইকুণ্ডা গড়ে। নাম, হিন্দু থিয়েটার। অবশ্য জনসাধারণের কাছে এটি 'গোপাল মাইতির থিয়েটার' নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে আর

৩৬. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।
My Brother's Face—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৩৭. নাট্যরঙ্গে মেদিনীপুর—চারুচন্দ্র সেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, মেদিনীপুর, ১৯৭৩।

যেসব নাট্য সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাদের ভেতর নিউ বেঙ্গল থিয়েটার, ডায়মণ্ড এমেচার থিয়েটার, বান্ধব নাট্যসমাজ, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব, বীণা থিয়েটার, মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গঠিত নাট্য সম্প্রদায় ও মেদিনীপুর নাট্য পরিষৎ উল্লেখযোগ্য।[৩৮] এই সম্প্রদায়গুলির বেশীরভাগই এখন বিলুপ্ত। মাঝে মাঝে কোনটি বিশেষ কোন উপলক্ষে পুনরুজ্জীবিত হয়, উপলক্ষের প্রয়োজন মিটলে বিলুপ্ত হয় আবার।

আগেকার দিনে সাধারণত মফস্বল সহরে নারী ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু গোপাল মাইতির থিয়েটারে প্রথম থেকেই অন্তত একজন নারী, নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়িকা। পরবর্তীকালে প্রায় সব নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করতেন। প্রথম দিকে এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বারাঙ্গনা। অভিনেত্রী-দের রূপগুণ সম্পর্কে গোপালবাবু নিজেই ছড়া রচনা করেছিলেন। যেমন—

পুরুষ আকৃতি যার নারীর আধারে।
রাজলক্ষ্মী সদাসুখী রাজার সংসারে ॥
কিবা চুলের বাহার আহা! কুলবালা বামা।
বয়সে ষোড়শীরূপে কাদম্বিনী ভীমা ॥ ইত্যাদি

এইসব অভিনেত্রীদের ভেতর মিস পূর্ণকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে গান গেয়ে নাম করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে শ্রীবঙ্কিমবিহারী পাল বারবনিতাদের নিয়ে 'নারী থিয়েটার' নামে একটি নাট্য সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি এ জেলায় সদর মহকুমা ও অন্যান্য মহকুমায় অনেকগুলি নাটকের দল গঠিত হয়।[৩৯] তবে এদের ভেতর সবগুলিই

৩৮. Ibid., ৩৭.

৯. যেসব নাট্য সংস্থা বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল, যাদের কিছু বিলুপ্ত কিছু এখনও বিদ্যমান, তাদের মোটামুটি পরিচয় : মেদিনীপুর সহরে—কৃষ্টি সংসদ, নিশান, হিমাদ্রি ক্লাব, সোশ্যাল শিল্পী গোষ্ঠী, নতুন দল, অগ্রগামী, নাট্যরূপা, নবোদয় নাট্যসংঘ, নাট্যশ্রী, জুভেনাইল্‌স্‌ কর্নার, শিল্পী সংঘ, সুজাগঞ্জ নাট্যসংস্থা, সিদ্ধেশ্বরী নাট্য সমিতি, বাণীমন্দির ইত্যাদি। ঝাড়গ্রাম সহরে—ঝাড়গ্রাম রঘুনাথ মেমোরিয়াল ক্লাব, রঘুনাথ স্মৃতি নাট্য মন্দির, যুব সম্প্রদায়, আনাপনি নাট্য বিভাগ, খেয়ালি সংঘ, রামনারায়ণ

যে ধারাবাহিকভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেয়েছিল তা নয়। অবশ্য প্রতিবন্ধকতাও অনেক। মেদিনীপুর সহর ও ঝাড়গ্রাম সহর ছাড়া নাটক করার মত এ জেলায় উপযুক্ত মঞ্চের অভাব আছে।

আজাহারউদ্দিন খান[৪০] মেদিনীপুরে নাটক রচনাকে দুটি ধারায় ভাগ করেছেন। এক, জমিদার শ্রেণীরপৃষ্ঠপোষকতায়রচিত নাটক ; দুই, নাট্যকারদের নিজস্ব উদ্যমে রচিত নাটক। নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই দুটি ধারা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নবনাট্য আন্দোলনের ঢেউ এ জেলায় তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। যদিও কয়েকটি নাট্যসংস্থা, মেদিনীপুর সহরের 'কৃষ্টি সংসদ', তমলুকের 'ব্রাইট ফিউচার' ও খড়্গপুরের 'মশাল' এদিকে কিছুটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং প্রথম দুটি সংস্থা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ জেলায় প্রথম একাঙ্ক নাটক লেখেন সমরেশচন্দ্র রুদ্র। প্রাচীনদের ভেতর যাঁরা নাটক লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোলকচন্দ্র বসু, ওসমান আলি, ভুবনচন্দ্র মহাপাত্র, সুরেশচন্দ্র রায় বীরবর ও বঙ্কিমবিহারী পাল উল্লেখযোগ্য। আধুনিকদের ভেতর সু. মো. দে, চিত্তরঞ্জন রায়, ঋষি দাস, সত্যেন জানা, সনৎকুমার মৌলিক, সমরেশচন্দ্র রুদ্র, অতনু সর্বাধিকারী ও শ্রীজীব গোস্বামী (বাসুদেব দাশগুপ্ত) উল্লেখযোগ্য।[৪১]

বলাকা নাট্য পরিষদ, সাংস্কৃতিক চক্র, কলাতীর্থম্, বাণীতীর্থ, তরুণ সংঘ (শিলদা), প্রগতি সংঘ (পড়িহাটি), যুব সংঘ (বেলপাহাড়ী) ও জাগৃতি (গিধনী) ইত্যাদি। খড়্গপুরে—'মশাল', তমলুকে, ব্রাইট ফিউচার। এছাড়া কিছু অফিস ক্লাবও আছে। —বিশদ বিবরণের জন্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ, শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ, মেদিনীপুর (১৯৭৩) দ্রষ্টব্য।

৪০. নাট্য সাহিত্যে মেদিনীপুর—আজাহারউদ্দিন খান। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন, ১৯৭৮।

৪১. Ibid৪০.

ছ. পূজা-পার্বণ ও লোক-উৎসব

> "ওঁ ভীমসেন মহাবীর
> মহাবিষ্ণু প্রসাধক:
> ত্রাহি মাং বীর বীরেশ
> ভীমসেন নমোঽস্তুতে ॥"[১]

এ জেলায় পূজা-পার্বণ ও লৌকিক উৎসবগুলি যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। বুদ্ধদেবের জন্মের আগে এ অঞ্চলে আর্যধর্ম বলতে ছিল জৈন ধর্ম। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যেরা এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের ভেতর চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অধিবাসীরা বেশীরভাগই ছিলেন সম্ভবত টোটেমপন্থী।[২] পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলির রূপান্তর হতে হতে এখন যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে এদের মূল নির্ধারণ করা খুবই দুঃসাধ্য। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির এ এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। যেসব পূজাপার্বণ ও লোক উৎসব প্রধানত এ জেলার সামগ্রী তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

(১) **ভীমপূজা**[৩] —এ জেলার বিশিষ্ট লোক-উৎসব ভীমপূজা। কাছাকাছি জেলাগুলি ও অন্যান্য অঞ্চলে এ পূজোর প্রচলন থাকলেও এখানকার মত এত ব্যাপক নয়। সময়, মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি। খোলা মাঠ, ক্ষেতের কিনার, ধানের মরাই বা গোলার কাছাকাছি, গ্রামের ভেতর বা সীমান্ত, হাটবাজার ও রাস্তার সন্ধিস্থল ভীম পূজার ক্ষেত্র। কাঁধে গদা, বিশাল মূর্তিই সাধারণত ভীমের রূপ। এছাড়া আরও নানারকম

১. মেদিনীপুরের ভীমপূজা ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ (১৯৭৪)।

২. Mr Herbert Spencer finds the origin of totemism in a misinterpretation of nick names. Savages first name themselves after natural objects, and then, confusing these objects with their ancestors of the same names, reverenced them as they already reverenced their ancestors'—The Tribes and Caste of Bengal: H. H. Risley, Vol. I (1891), p. LXVIII.

৩. মেদিনীপুরের ভীমপূজা ইত্যাদি—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য।

মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন জরাসন্ধ বধের দৃশ্য, কীচক বধ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, জতুগৃহ থেকে পলায়ন, হনুমানের সাথে শক্তিপরীক্ষা, দুঃশাসনের রক্তপান, ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি। সব মূর্তিতেই ভীমের আকৃতি বলিষ্ঠ, বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী। দেখলেই বোঝা যায় তিনি মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডব। মাথায় কোঁচকান বাবরি চুল, গায়ের রঙ সোনালী হলুদ, অথবা ধূসর বা লালচে খয়েরি। মুখে জুলফি ও গোঁফ। যদিও মহাভারতের ভীম ছিলেন তুবরক বা দাড়ি-গোঁফ বিহীন।

মাঘের এই একাদশী তিথি নিয়েও নানা লোককথা। জরাসন্ধকে বধ করতে যাওয়ার আগে ভীম নির্জলা একাদশী পালন করেছিলেন। তেমনি নির্দেশ ছিল শ্রীকৃষ্ণের। এই একাদশীর নাম তাই ভৈমী বা ভীম একাদশী। অন্য লোক-কথায় বলে, মাঘ মাসে পুকুরের জল যেমন ঠাণ্ডা থাকে তেমনিই ছিল ঠাণ্ডা। কুন্তী কিছুতেই স্নান সেরে একাদশীর ব্রত পালন করতে পারছিলেন না। পাশের ক্ষেতে চাষ করছিলেন ভীম। লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরে ডুবিয়ে জল গরম করে ফেললেন। তখন থেকে ওই একাদশী ভীম একাদশী বলে পরিচিত হল।

মহাভারতের ভীমকে জড়িয়ে মেদিনীপুরের নানা জায়গায় নানা কাহিনী ও প্রবাদ আছে। মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার সীমান্তে গড়বেতার লাগোয়া গণগণির ডাঙ্গা। সেখানে ভীম ও বক রাক্ষসের যুদ্ধ হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। এখানে যে ফসিলাইজড কাঠ আছে সেটাকে দেখিয়ে এখনও গাঁয়ের লোক বকরাক্ষসের হাড় বলে সনাক্ত করেন। বগড়ি কৃষ্ণনগরের কাছে একারিয়া গ্রাম পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়কার একচক্রা গ্রাম বলে কথিত হয়। এরই কাছাকাছি ভিক্নগর গ্রামে পাণ্ডবেরা ভিক্ষা করতেন বলে লোকের বিশ্বাস। খড়্গপুরের কাছে ইন্দার খড়্গেশ্বর মন্দিরের সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ হিড়িম্বডাঙ্গা নামে পরিচিত। হিড়িম্বের বোন হিড়িম্বাকে নাকি ভীম এখানেই বিয়ে করেছিলেন।

এত প্রবাদ ও উপকথা সত্ত্বেও মহাভারতের ভীম ও ভীমপূজার ভীমকে এক বলে সনাক্ত করায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মহাভারতের ভীম বলশালী কিন্তু রাজপুত্র। যুদ্ধ তার গৌরব। বিশেষত গদা ও মল্লযুদ্ধ। কিন্তু এ অঞ্চলে যে ভীম পূজা পান, তিনি মুখ্যত চাষী। ভীমের নামগুলিও এই দিকে ইংগিত করে। ভীম খেত্তী, ভীম সেন, ভীম হড়া, ভীম চাষী, হালুয়া ভীম ইত্যাদি।

লোককথা ও কাব্যে ভীমের পরিচয় চাষের সহায়ক হিসাবে। সেখানে মূল চাষী শিব। বড় সংসার, চাষআবাদ না করলে তাঁর সংসার চলেনা। রামেশ্বরের শিবায়ণে দেখা যায় পার্বতীর পরামর্শে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে কৃষিজমির পাট্টা সংগ্রহ করেন। শূল ভেঙে তৈরি হয় হাল। কৈলাস ছেড়ে যান দেবীচকে। সঙ্গে কৃষিকাজের প্রধান সহায়ক হাল্যা ভীম।

চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রণ চায়্যা।
পিছু ভীম চলিল চাষের সজ্জা লয়্যা ॥[৪]

ধান পাকলেও ভীম আছেন। মাঠভরা সোনা রঙের ধান কাটতেও তাঁর আলস্য নেই—

নিমিষেকে ভীম ধান পেলাইলেক কাটি।
সরু সরু হাতের ভৈলেক তিন মুঠি ॥[৫]

প্রকৃতপক্ষে মাঘের মাটিই চাষের কাজ সুরু করার পক্ষে উৎকৃষ্ট। খনার বচন অনুসারে, "মাঘের মাটি / হীরের কাঠি"। বাংলার লৌকিক প্রবাদও তাই বলে—

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধনি রাজা, পুণ্য দেশ।

বিরতবিহীন দীর্ঘ চার মাস পরবর্তীকালে যে লিপ্ত থাকতে হবে, তারই সূচনা হয় ভীম পূজা দিয়ে। কালপরিক্রমায় মহাভারতের ভীমের সাথে সম্পৃক্ত হলেও, মেদিনীপুরে যে ভীমপূজা হয় সে ভীম আসলে শিবের অনুচর। সহায়ক কৃষি দেবতা। এখানকার লৌকিক ছড়াও এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত করে—

মেদিনীপুরের হালুই ভীম, ভীম হুড়া চাষী
তাই—ভীম একাদশী।

(২) **শিবের গাজন**[৬] এ জেলার প্রায় প্রতিটি বড় গ্রামে বছরের প্রথম মাস বৈশাখে, অথবা শেষে চৈত্রে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিকে বলে বৈশাখী গাজন; দ্বিতীয়টি চৈত্র গাজন বা চৈতা গাজন। বৈশাখী গাজন অনুষ্ঠিত

৪ শিব সংকীর্ত্তন বা শিবায়ণ—রামেশ্বর ভট্টাচার্য (ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৩৭১)।

৫ ভীম চরিত—রাম সরস্বতী (অসমীয়া)। পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য।

৬. এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য 'মেদিনীপুর জেলার শিব গাজনে বৈচিত্র্য—তারাশিস মুখোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ (১৯৭৪) দ্রষ্টব্য।

হয় এ জেলার নানা জায়গায় প্রায় তিরিশটি। চৈতাগাজন পঞ্চাশটি।[৭] তবে গাজন অনুষ্ঠানের রূপ জেলার সব জায়গায় সমান নয়।

শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাদের গর্জনের থেকেই 'গাজন' শব্দ এসেছে।[৮] শিবের গাজন ছাড়া ধর্মের গাজনও আছে। ধর্মের গাজনে ধর্মের সাথে মুক্তির বিবাহ। দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন। ঘাটাল মহকুমা ছাড়া ধর্মের গাজন এ জেলায় আর কোথাও বেশী প্রচলিত নয়। গাজন অনুষ্ঠান নিচু বর্ণের হিন্দুরাই বেশী সংখ্যায় পালন করেন। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদেরই এটি সব থেকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় উৎসব।

প্রধান সন্ন্যাসীদের ভেতর পাটভক্তা বা শ্যাম সন্ন্যাসী, দেউলা ভক্তা বা দেউল ভক্তা, বাসহরি বা বাসঘরি ও কোটাল ভক্তার নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামের পক্ষ থেকেই এদের বাছাই করা হয়। প্রধান সন্ন্যাসীরা যেসব শারীরিক নিপীডন বা কৃচ্ছসাধন করেন তার ভেতর বিশেষত উল্লেখ্য হিন্দোল পর্ব, আগুন দোলন, আগুন-ঝাঁপ, বঁটি ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ, কাঁটায় গড়ান, কাঁটানাচ, বঁটিনাচ, মানিকচুরি নাচ, ঝুলন, কাঁটাভাঙ্গা, দণ্ডভাঙ্গা, বেতভাঙ্গা, বেতচালা, মাথা চালা, সেবা ডাক, ধুনা সেবা, কলা কাটা, মাণিক বেড, দণ্ড চালান, দণ্ড ডাক, কালিকা তোলা, হাখণ্ড ঘর পোড়ান, জিহ্বাবাণ, ও পিঠফোঁড়া চডক।

ঘট ডোবানোর দিন থেকে গাজনের সুরু। ঘট ডোবানোর আগের রাতে একটি পুকুর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারা রাত পাহারা দেওয়া হয় পুকুরটি, যাতে অন্য কেউ সেটি ব্যবহার করতে না পারেন। গাজনের প্রথম দিন, ঘট ডোবানোর আগে, এক বা একাধিক তলদা বাঁশ কাটা হয়। পুজো করা হয় বাঁশটিকে। বাঁশের মাথায় লাল বা হালকা নীল রঙের পতাকা বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁশটিকে বলে ধ্বজ বাঁশ বা গাজন বাঁশ।

গাজনের দিন ভোরে 'প্রতিষ্ঠা-পুকুরে' দুটি ঘট ডোবান হয়। কোথাও কোথাও এর একটি শিবের অপরটি দুর্গার। গাজন শেষ হলে ঘট দুটি আবার বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুরে। ঘট ডোবানোর আগে পাট ভক্তা, দেউলা ভক্তা ও বাসঘরি ভক্তাকে তেল মেখে 'প্রতিষ্ঠা-পুকুরে' স্নান করতে হয়। স্নান করে তারা নতুন গামছা পরেন। পরণের কাপড়গুলি ঘট বসানোর জন্য ব্যবহৃত

৭. পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড—অশোক মিত্র সম্পাদিত (১৯৭১)

৮. পূজা-পার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বিশ্বভারতী, কলকাতা (১৩৫৮)

হয়। ঘট-পুজোর পরে ব্রাহ্মণ বা অন্ত জাতের পুরোহিত এই মন্ত্র বলতে বলেন, 'আগু গোত্র পরিত্যাজ্য, শিব গোত্র প্রবেশিত'। এই মন্ত্র বলে পুরোহিত ওই তিনজন সন্ন্যাসীর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মন্ত্রটি তিনবার আবৃত্তি করার সাথে সাথে সন্ন্যাসীদের গোত্রান্তর হয়ে যায়। তারা শিব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হন।

ঘট ডোবানো ও উত্তরীয় দেবার পর পুরোহিত পুকুর ঘাটেই একটি মাগুর মাছ পূজা করেন। তখন মাছের মাথায় থাকে সিঁদুর, গলায় 'কাঁডোল মালা'। পূজার শেষে সন্ন্যাসীরা সেবা ডাকেন ও মাছের মাথায় অল্প অল্প জল দেন। এই সময় 'মাছ' কথাটি তারা উচ্চারণ করেন না। মাছকে বলেন গাছ। কোথাও কোথাও মাছটি উৎসর্গের পরে পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয় বা বলি দেওয়া হয়। যেখানে বলি দেওয়া হয় সেখানে মাছের রক্ত লাগান হয় ঘটে।

ঘট ডোবানোর দিন ঘাটেই আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি 'জাগপ্রদীপ' জ্বালতে হয়। মাটির নতুন প্রদীপ—সরষের তেল ও তুলোর বাতি দিয়ে সাজান হয় প্রদীপটি। জ্বালা হলে প্রদীপটি নতুন হাঁড়ির ভেতর বসিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না গাজন শেষ হয় বাসঘরি ভক্তা এটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঘট ডোবান উপলক্ষে জাগপ্রদীপ জ্বালা, ঢাকপূজা, গলাপূজা, উত্তরীয় পরানো, মাগুর মাছ ও ধ্বজ-বাঁশ পূজা হয়ে থাকে। এর পরে শোভাযাত্রা করে সবাই শিব মন্দিরে বা শিবের থানে যান। আগে থাকে ঢাক ও কাঁসি। পরে ডান হাতে বেত নিয়ে বাসঘরি ভক্তা, পেছনে অন্য কোন সন্ন্যাসী কাঁধের ওপর বয়ে নেন ধ্বজ বাঁশ। গ্রামের কেউ একটি বেত টানতে টানতে নিয়ে চলেন মাটিতে। এরপরে যায় নাপিত। ঘটি থেকে জল ছিটান কাজ তার। নাপিতের পেছনে দেউলা ভক্তা শিবের ঘট ও পাট ভক্তা দুর্গার ঘট মাথার ওপর কাপড়ের বিঁড়ের বসিয়ে কথা না বলে হাঁটতে থাকেন। উভয় ঘটের ওপরেই একটি করে বেত ধরা থাকে। জাগপ্রদীপের হাঁড়িটি নিয়ে এদের অনুসরণ করেন কেউ।

শিবের থানে পৌছুবার পর ধ্বজ-বাঁশটি মন্দিরের বা থানের উত্তরের 'নেত নালার' সামনে রাখা হয়। শিব ও দুর্গার ঘট নিয়ে ভক্তরা মন্দির প্রদক্ষিণ করেন ও শেষে ঝুলন-খুঁটির ভেতর দিয়ে মন্দিরে ঢোকেন। ঘট দুটি মন্দিরের ভেতরে পাশাপাশি রাখা হয়। ঘট-স্থাপনের দিন থেকেই সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় নানান দেবদেবীকে সমবেতভাবে আরাধনা করেন। এর

নাম 'সেবা ডাকা'। মন্দিরে সেবা ডাকার আগে গায়ে পঞ্চামৃত ছড়ান সন্ন্যাসীরা। সাধারণত সেবা ডাকার মন্ত্রটি হল—

রুদ্রেশ্বরের চরণে সোবা সে, সোবা কইলে সোবাসে
তোমার ওগত ভক্ত ডাকে, তবুনাত প্রভুর ধ্যান ভাঙ্গে
শিবো দুগ্‌গা মুনি মহাদেব মহাদেব, হরিহরি বোলা হরিবোল।

শেষে শব্দ ক'টি পাল্টে এক এক করে সব দেবদেবীর নাম নেওয়া হয়।

সেবা ডাকার পর সন্ন্যাসীরা সূর্যার্ঘ দেবার জন্য সূর্য বেদীর কাছে জড়ো হন। কলামোচার খোলায় দেওয়া হয় অর্ঘ। সূর্যার্ঘ দেবার পর তারা ঝুলন-খুঁটির কাছে আসেন। ঝুলন-খুঁটির নিচে একটি গর্তে পাট, আমকাঠ ও ধুনো দিয়ে আগুন জ্বালান হয়। ঝুলন খুঁটির সাথে বাঁধা বাঁশে পাটের দড়ির ফাঁসে ডান পা গলিয়ে পরে বাম পা আটকে একে একে সন্ন্যাসীরা আগুনের ওপর মাথা রেখে ঝুলতে থাকেন। সেই সময় ধুনো ছেটান হয় আগুনে। ধোঁয়া ও শিখা চোখে মুখে লাগে সন্ন্যাসীর। সমবেত দর্শকেরা সন্ন্যাসীর মুক্তির জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।

ভোগ-দেওয়ার ওপরে গাজনের নাম হয়। যেমন তিন ভোগের গাজন, পাঁচ ভোগের গাজন, সাত কি নয় ভোগের গাজন ইত্যাদি। ভোগ নিবেদনের পরে পুরোহিতকে একটি হাতেলেখা খাতা পড়ে শোনাতে হয়। এতে ভক্তাদের নাম থাকে। উদাহরণ, কলিযুগের ভক্তা—অমল সামাই, দণ্ড সামাই, দেউলা, পাটভক্তা, নগর খুটিয়া, মৎস উপবাসি, হবিষ্য উপবাসি, আপানি পাহাড়ি[৯] ইত্যাদি। বলা বাহুল্য হাতে লেখা খাতায় বানান ভুল থাকে অজস্র।

নীলপুজোর পরদিন (চৈত্র সংক্রান্তি) সকালে তিনটি বেঁড়ে বাঁশ, মোচাসহ কাঁঠালি কলার গাছ, তালপাতা ও খড় দিয়ে হাখণ্ড ঘর তৈরি করা হয়। এর ভেতরেই শিবদুর্গার বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। দেউলা ভক্তা শিব ও পাট ভক্তা লাল পেড়ে শাড়ি পরে দুর্গা সাজেন। বিয়ের সময় একটি মাগুর মাছ পুজো করে পুকুরে ছাড়া হয়। বিয়ের শেষে 'হাখণ্ড ঘরে' আগুন দেওয়ার সাথে সাথে দেউলা ভক্তা এক কোপে কলাগাছটি দু'ভাগ করে ফেলেন।

গাজনের[১০] সমস্ত অনুষ্ঠানটি শেষ হলে সন্ন্যাসীরা আগের মত গোত্র পরিবর্তন করে নিজেদের গোত্রে ফিরে আসেন।

৯. মেদিনীপুর জেলার শিব গাজনে বৈচিত্র্য—তারাশিস মুখোপাধ্যায়।

১০. চৈত্র গাজন প্রধানত অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগড়, তমলুক, এগরা, জামবনী, বিনপুর

(৩) **ধর্মঠাকুর**[১১] মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা ও সদর মহকুমার উত্তরাংশে ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ধর্মঠাকুরের কোন মানব দেহধারী রূপ নেই। তাই বলে যে কোন রূপেই তার পূজা হয়না। বিগ্রহ বলতে যা বোঝায় তা হল পাথরের একটি টুকরো। টুকরো একাধিক হলে সংখ্যা বাছাই করা হয় তিনটি। কখনও কখনও পাথরের টুকরোর ওপর একটি পেরেক গেঁথে নেওয়া হয়। এটি তাঁর চোখ। পাথরের আকৃতিও নানা রকম। পেট উঁচু গোলাকার, তেকোনা বা মোচাকৃতি। সাধারণত কোন গাছের নিচে পড়ে থাকে এই পাথর। সারা বছর অবহেলিত। কিন্তু যখনই খরা দেখা দেয়, বৃষ্টি হয় না আশানুরূপ, গাঁয়ের লোক দলবেঁধে এর পুজো করতে সুরু করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্যে বা কোন প্রত্যাশা পূরণের জন্য একক ভাবেও পুজো করা হয় একে।

বিভিন্ন গ্রামের বিগ্রহগুলি পরস্পরের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে গ্রথিত বলে লোকের বিশ্বাস। সম্পর্কে একটি অপরটির বড ভাই বা ছোট ভাই। ধর্মপূজোর পুরোহিত প্রধানত ডোম। এদের উপাধি পণ্ডিত। ডোম ছাডাও হাড়ি, বাগদি, কেওট ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও এর পুরোহিত হন। পশুবলি ধর্মপূজোর একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেখানে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেশী, সেখানে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। বছর পঞ্চাশেক আগেও হাঁস ও মুরগি বলি দেওয়া হত। হিন্দু প্রভাবাধীন এলাকায় পোড়া মাটির ঘোডাও উপহার দেওয়া হয়।

ধর্মঠাকুরের পুজো হয় সাধারণত তিনভাবে। এক, গৃহদেবতা হিসেবে গৃহস্থ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা পূজার মত প্রতিদিন। তখন পশুবলি হয়না। দুই, গ্রামে জাগ্রত দেবতা হিসেবে। অবশ্য যে যে গ্রামে বিগ্রহ আছে। গ্রামের মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্যে পূজা দেন। মানত থাকলে এ পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

গোপীবল্লভপুর, গড়বেতা, কেশপুর, কাঁথি, খেজুরী, নয়াগ্রাম ও মোহনপুরে। বৈশাখী-গাজন অনুষ্ঠিত হয় পিংলা, পাঁশকুড়া, দাঁতন, শালবনি, কেশিয়াড়ী, পটাশপুর ও সুতাহাটায়। এ ছাড়া আরও নানা জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১১. **Dharma Worship in West Bengal—Dr. Asutosh Bhattacharjee.** —বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য।

তিন, বাৎসরিক পূজা। জাঁকজমক ও ধূমধাম বেশী হয় বাৎসরিক পূজায়। এ পূজার প্রকৃতি বারোয়ারী। বিগ্রহ গ্রামের সম্পত্তি।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চৈত্র, বৈশাখ কি আষাঢ়ের পূর্ণিমার দিনে বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ভক্তা বা সন্ন্যাসী হবার জন্য গাঁয়ের লোকের মানত থাকে। মূল পূজোর বারো দিন আগে. শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন তা'রা পুরোহিতের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। সেদিন থেকে সুরু করে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত ভক্তাদের দুধ ও ফলমূল খেয়ে থাকতে হয়। এখন ফল ও দুধ দুষ্প্রাপ্য, ফলে দিন ছয়েক পরেই ভক্তারা বিগ্রহের কাছে এসে হাজির হন। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে নাপিত তাদের ক্ষৌরকর্ম করেন ও প্রত্যেককেই উপবীত বা পৈতা ধারণ করতে দেওয়া হয়। এরপর থেকে তারা নিরামিষ আহার করেন। মূল পূজোর দিন গাঁয়ের লোক ও ভক্তেরা জড়ো হয়ে প্রদীপ জ্বালান। সেদিন কি পুরুষ কি নারী সবাই উপবাস করেন।

মূল পূজোর তিন চারদিন আগে বিগ্রহকে তার আধার থেকে বের করে আনা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় ধূমধাম ও বাজনার সাথে সাথে আবার রাখা হয় আধারে। এই অনুষ্ঠানের নাম বরম্। মূল পূজোর আগের দিন ভক্তারা কাঁটাগাছের ডাল (কন্টিকারি) নিয়ে নিজেদের ভেতর একটি যুদ্ধের অভিনয় করেন। এটি দেখতে গাঁয়ের সব লোক সমবেত হন। ভক্তাদের এই পবিত্র কর্ম তাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে। এদিনই সন্ধ্যায় বিগ্রহকে কাছাকাছি কোন পুকুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান হয়। তারপর তাকে পাল্কীতে চড়িয়ে, শোভাযাত্রা করে প্রদক্ষিণ করা হয় সারা গ্রাম। তখন পাথর বিগ্রহটি রাখা হয় বেতের ঝুড়িতে, রোদে শুকান চালের ভেতর।

স্নানের সময় ধামাতকন্নি ও দেবাংশি যে জল ছিটান, বন্ধ্যা নারীদের বিশ্বাস তার প্রথম ফোঁটা গায়ে পড়লে তাদের বন্ধ্যাত্ব ঘুচে যাবে। এ ছাড়া মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় ঘরবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপূজো উপলক্ষে শিবের গাজন ও চড়কের মত বাণ-বেঁধা ও পাটাঘোরাও হয়ে থাকে।

ধর্মপূজা কেন্দ্র করে রাঢ় বঙ্গে এক সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য গড়ে উঠেছিল। নাম ধর্মমঙ্গল। এখনও ধর্মপূজোর সময় বারোদিন ধরে, দিনে দুটি দফায় এটি পাঠ করা হয়।

ধর্মমঙ্গলের সব থেকে প্রাচীন কবি রূপরাম চক্রবর্তী। দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে, শ্রীরামপুরে ছিল তাঁর নিবাশ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান দামুণ্যা

থেকে ছ মাইল উত্তরপশ্চিমে শ্রীরামপুর গ্রাম। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের একাধিক কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। এদের ভেতর মানিকগাঙ্গুলী ও নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিত্যানন্দের বাড়ি ছিল দক্ষিণপূর্ব মেদিনীপুরে। তার ধর্মমঙ্গল এ অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়।[১২]

ধর্মমঙ্গল [১৩] সুরু সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে। এই অংশের নাম শূণ্যশাস্ত্র বা শূণ্যপুরাণ। কারণ শূন্য থেকে সৃষ্টি উদ্ভূত বলে এর অভিমত। দ্বিতীয় অংশে আরাধনার জন্য পাত্র খুঁজতে ধর্মের কার্যকলাপ বর্ণিত। ধর্মের প্রথম পাত্র সদা ডোম। সে ধর্মের তুষ্টির জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিতেও দ্বিধা করেনি। পরে অবশ্য ছেলে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পাত্র হরিশ্চন্দ্র।[১৪] তার পুরোহিত ছিলেন রামাই পণ্ডিত। তৃতীয় অংশে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী।

ধর্মমঙ্গলের মূল কাহিনী লাউসেনকে নিয়ে। গৌড়ের রাজার সামন্ত কর্ণসেন। তার রাজধানী ছিল রামাতি।[১৫] স্থানীয় এক গোপ (ঢেকুরের রাজা) সোমা ঘোষ ও তার ছেলে ইছাই ঘোষ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। কর্ণসেনের রাজ্য ছিনিয়ে নেন তারা। কর্ণসেনের ছয় ছেলে ও সৈন্যেরা রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ করেন। দেবী শ্যামরূপার (চণ্ডী) সাহায্যে বলীয়ান ইছাই ঘোষের সাথে তারা এঁটে উঠতে পারেন না। কর্ণসেন ছাড়া সকলেই নিহত হন। গৌড়ের রাজা তখন কর্ণসেনকে আশ্রয় দেন। নিজের শালীর সাথে বিয়েও দেন তার। শালা মহামদ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এ বিয়ে সমর্থন করলেন না। কারণ কর্ণসেন অত্যন্ত বৃদ্ধ। এমনকি সন্তান উৎপাদনেও অক্ষম। সুদূর দক্ষিণে ময়নাগড় নামে এক ভূখণ্ড রাজা কর্ণসেনকে দান করলেন। যুবতী স্ত্রী রঞ্জাবতীকে নিয়ে কর্ণসেন সেখানেই বসবাস সুরু করলেন। পুত্র লাভের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন রঞ্জাবতী। বৃদ্ধা ধাত্রীর উপদেশে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের সাথে ধর্মঠাকুরের কৃপালাভের চেষ্টা সুরু করলেন। ঠাকুরের দয়ায় লাউসেন নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র হল।

---

১২. History of Bengali Literature—Dr. Sukumar Sen (Revised Ed, 1971),

১৩. ধর্মমঙ্গলের ধর্মীয় আচারগত দিকটি ধর্মপুরাণ বা অনিলপুরাণ অথবা ধর্মমঙ্গল বলে পরিচিত। সৃষ্টিতত্ত্বের দিকটি শূণ্য শাস্ত্র বা শূণ্য পুরাণ নামে পরিচিত।

১৪. হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্র—শূণ্যঃশেপের কাহিনীর অনুরূপ।—ডঃ সুকুমার সেন : পাদটীকা. ১২ দ্রষ্টব্য

১৫. রামাবতী রামপাল প্রতিষ্ঠিত।

মহামদ খবর পেয়ে লোক পাঠিয়ে তাকে চুরি করলেন। দুঃখে ভেঙে পড়লেন রঞ্জাবতী। তখন কর্পূরধবল নামে এক পালক পুত্র পাঠালেন ধর্ম। কালক্রমে লাউসেন বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। নিজের যোগ্যতা দেখাতে গৌড়ে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। গৌড় অভিযানের প্রথম পর্যায়েই লাউসেন কীর্তি স্থাপন করলেন। জালান্দার গড়ে তখন এক বাঘের উপদ্রব ছিল ভয়ংকর। সে রাজ্যের রাজা, রাজপরিবার ও দেশের সব লোককে খেয়ে ফেলেছিল কামদল নামে সেই বাঘ। জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল ভূখণ্ড। লাউসেন বাঘ মারলেন। জঙ্গল কেটে স্থাপন করলেন জনবসতি। পরে এসে থামলেন তারাদীঘির কাছে। সেখানে ছিল এক হিংস্র কুমীর। দুই ভাই পরে এলেন জামাতি। এখানকার বারুজীবি (পান-চাষী) সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল স্বৈরিণী। এই মেয়েদের ভেতর নয়নী ছিল দুষ্টার শিরোমণি। নানাভাবে সে লাউসেনকে বশীভূত করতে চাইল। না পেরে শেষে মিথ্যা অভিযোগে আটক করিয়ে সঙ্গলাভ করতে চেষ্টা করল। ধর্মের কৃপায় মুক্ত হলেন লাউসেন। পরে তিনি এলেন গোলাহাটে। এখানে মেয়েরাই অধীশ্বরী।

সুরিক্ষা ছিলেন এই অঞ্চলের রাণী। নতুন কেউ এলেই তিনি তাকে কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তর দিতে না পারলে সে থাকত ক্রীতদাস হয়ে। সফল হলে প্রেমিক বলে গণ্য হত। লাউসেনেরও পরীক্ষা সুরু হল। পর পর সবগুলির ধাঁধাব উত্তর ঠিকঠাক দেবার পর সুরিক্ষা তাকে সবচেয়ে কঠিন ও শেষ ধাঁধাটি জিগেস করলেন,

কামুরের কাম-চণ্ডী কামতায় আইসে
বল দেখি নারীর ধাতু কোথা বইসে ?

এর উত্তর এক চণ্ডী ছাড়া কারো জানা ছিল না। আগে ভণিতা করলেন লাউসেন। বললেন, পশু নয় পাখীও নয়, ডিম্ব মধ্যে ছা। যদিও হাত পা নেই তবু নিমেষে নিধন করতে পারে। সবাইকে দেখতে পারে কিন্তু নিজে অদৃশ্য। পরম সম্পদ একে যত্ন করে রাখাই বিধি। ওপরে সিন্দুর লিপ্ত। নিচে মাখান কাজল, সর্বদাই চঞ্চল, অশ্রুর মত টলটল করে কাঁপে। শেষে উত্তর দিলেন,

কামুরের কামচণ্ডী কামতায় আইসে
অষ্টাজ থাকিতে ধাতু বাম চক্ষে বইসে।

জয় হল লাউসেনের।

গৌড যাবার পর সবচেয়ে বড় যে শক্রর তিনি সম্মুখীন হলেন তিনি তার মামা, মহামদ। সুহৃদও লাভ হল কালু ডোম ও তার স্ত্রী লখিয়া। মামার শক্রতা সত্ত্বেও গৌডেশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তিনি। মহামদের চক্রান্তে তাকে পাঠান হল কামরূপ যুদ্ধাভিযানে। কামরূপেব রাজাকে পরাজিত করে লাউসেন তার মেয়ে কলিঙ্গাকে বিয়ে করলেন। ফেরার পথে মঙ্গলকোটের রাজার মেয়ে অমলা ও বর্ধমানের রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। হরিপালের রাজকন্যা কানাডাকে বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল গৌডেশ্বরের। কানাডা চণ্ডীর ভক্ত। বৃদ্ধ গৌডেশ্বরের সাথে বিয়েতে অমতও ছিল রাজকন্যার। চণ্ডী একটি লোহার গণ্ডার তৈরী করে পাঠালেন। কানাডা বললেন যে এককোপে সেই গণ্ডারের মাথা কেটে ফেলবে তাকেই বিয়ে করবেন তিনি। লাউসেন সফল হলেন ও কানাডাকে বিয়ে করলেন।

লাউসেনকে এরপর পাঠান হল তার পিতার পুরনো বৈরী ইছাই ঘোষকে জব্দ করতে। চণ্ডীর উপাসক ইছাই ভয়ানক যুদ্ধ করলেন। কিন্তু নিহত হলেন শেষে। তবু মহামদ চক্রান্ত থেকে নিরস্ত হলেন'না। বরং পরে যে চক্রান্ত করলেন, তা যেমন অসম্ভব তেমনি কূট। গৌডেশ্বরকে তিনি রাজী করালেন যে লাউসেন যদি প্রকৃতই ধর্মের (সূর্য) উপাসক হয়, সে পূবের বদলে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাবে। না পারলে তার পিতামাতা যারা অতিথি হিসেবে গৌডে আছেন তাদের প্রাণ যাবে ও লাউসেনের রাজপাট বাজেয়াপ্ত হবে। গৌডেশ্বরের নির্দেশে লাউসেনকে এই দুরূহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হল। মায়ের বৃদ্ধা ধাত্রী সামুলাকে নিয়ে তিনি গেলেন বল্লুকা নদীর তীরে ধর্মের আরাধনা করতে। এই সুযোগে মহামদ আক্রমণ করলেন ময়নাগড। কালু ডোম ও তার ছেলে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করল কিন্তু নিহত হল। লখিয়াও যুদ্ধে নিহত হল। রাণী কলিঙ্গা এলেন। তিনিও মারা পড়লেন। শেষ পর্যন্ত রাণী কানাডা ও বৃদ্ধা ধাত্রী ধুমসি মহামদের সৈন্যসামন্ত হটিয়ে দিলেন।

লাউসেনের দীর্ঘ আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্ম পশ্চিমে সূর্যোদয় করালেন। রক্ষা পেলেন বাবা মা, রাজ্যপাট বজায় থাকল। সবাইকে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন ময়নাগড়ে।[১৬]

১৬. মেদিনীপুরের লেখকরা মেদিনীপুরের ময়নাগড়েব সাথে লাউসেনের ময়নাগড় সনাক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সুরেন্দ্রনাথ জানার বৃহত্তর ময়নার ইতিহাসও দ্রষ্টব্য।

শেষ জীবন সুখে শান্তিতে সেখানেই কাটল।

ধর্মপূজায় উৎস কি এ নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত।[১৭] বৈদিক ও প্রাক্ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের সাথে অনার্য রীতিনীতি ও উপকথায় এ এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ঋক বেদের বরুণ ও যমের খণ্ড খণ্ড রূপ নিয়ে যেন ধর্মের পূর্ণাঙ্গ চেহারা। বৈদিক যুগের শেষ দিকে সূর্যদেবতা ও ইরানীয় ঐতিহ্য—এর সাথে প্রাক্ বৈদিক যুগের বিলুপ্ত কোন লোক দেবতার কাহিনী সংযুক্ত। তবে সম্ভবত প্রাচীন সূর্য উপাসনার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ধর্মপূজার বনিয়াদ। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসাম পর্যন্ত যেসব উপজাতি আজও সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাদা মোরগ উৎসর্গ করেন তাদের কথা স্মরণ করে শ্রী টি. সি. দাস মন্তব্য করেছেন[১৮], যে সুদূর অতীতে পূর্বভারতে এমন এক জনগোষ্ঠী বসবাস করতেন যাদের উপাস্য ছিলেন সূর্যদেবতা। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে বহু বিচ্ছিন্ন হলেও খোণ্ড ও নাগা এবং সূর্য উপাসক অন্যান্য উপজাতিরা এই সাদৃশ্য সূত্রেই পরস্পরের সাথে গ্রথিত।

এই পূজো সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দশটি বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করেছেন। এক, খরার মাসগুলিতেই এর পূজো হয়। দুই, বাৎসরিক ও ও শিবের পূজায় স্নানানুষ্ঠান সিংহভাগ জুড়ে থাকে। তিন, ইনি বন্ধ্যাত্ব দূর করেন। চার, পশুবলি পূজোর অপরিহার্য অঙ্গ। পাঁচ, নিজে সর্ব-শ্বেত, শ্বেত উপহারে তুষ্ট হন। ছয়, নানা অসুখ বিশেষত চোখের অসুখ, জনডিস্ ও চর্মরোগ নিরাময় করেন। সাত, প্রতিহিংসা পরায়ণ দেবতা। শাস্তি দেন, কুষ্ঠ রোগে। আট, মাটির ঘোড়া প্রিয় নৈবেদ্য। নয়, বারো পবিত্র সংখ্যা। দশ, ডোম পূজারী।

১৭. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর বুদ্ধ ছাড়া কেউ নন। ধর্ম নামটি বৌদ্ধ সৎ ধর্ম থেকে এসেছে। কূর্মের প্রতিরূপ এসেছে বৌদ্ধস্তূপ থেকে। নৃতত্ত্ববিদ্ এস. সি. রায়ের মতে ধর্ম নামটি সূর্যের প্রতি প্রযোজ্য। ধর্মপূজা সূর্যপূজারই নামান্তর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও এই মতাবলম্বী।
আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে ধর্ম শব্দের অর্থ অস্ট্রো-এসিয়াটিক (কোল-মুণ্ডা) ভাষায় কচ্ছপ। ধর্মপূজা প্রকৃতপক্ষে কূর্ম পূজার নামান্তর।
অধ্যাপক কে. পি চট্টোপাধ্যায়ের মতে ধর্ম বৈদিক দেবতা বরুণের পরবর্তী রূপ।

১৮. "Sun-Worship Amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India'
—T. C. Das.

ভাদ্র মাসের জিতাষ্টমীর জীমূতবাহন পুজোও এ জেলায় ধর্মপূজা। একটি খাদ বা গর্তে কলাগাছ পুঁতে রাত্রে পুজো হয়। প্রধান নৈবেদ্য কড়াই ভাজা। পরদিন পুঁইশাক, শসা, কচু, বেগুন, ঘুসোমাছ ও ভিজে কড়াই দিয়ে একটি তরকারি খাওয়া হয়। ভাদ্র সংক্রান্তিতে উৎসব ও মেলা হয়। এখানে ধর্ম-ঠাকুরের নানা নাম। বাঁকুড়া রায়, জগ্গালি, ক্ষুদি রায়, কালু রায়, দলু রায়, যাত্রাসিদ্ধি ইত্যাদি।

(৪) **শীতলা পূজা :** লৌকিক দেবীকুলে এ জেলায় শীতলার আধিপত্য সব থেকে বেশী। জেলার প্রায় সর্বত্র শীতলার পুজো হয়। সব থেকে বেশী হয় কাঁথি, নন্দীগ্রাম, তমলুক ও ঘাটালে। জাঁকজমক দেখলে মনে হয় এই উৎসবই বোধ হয় এ অঞ্চলের প্রধান গ্রাম্য উৎসব। এ ছাড়া সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমাও কম যায় না। শনি মঙ্গলবারে শীতলা পুজো ছাড়াও বছরে প্রায় তিনবার সমবেতভাবে এই পুজো হয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও বৈশাখে।

গাঁয়ের কোন বৃদ্ধা গোবর ছড়া দিয়ে পুজোর স্থানটি পরিষ্কার করেন। আলপনা আঁকা হয়। শালপাতা আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে একটি ছাউনি তোলা হয়। পুরোহিত ও তার সহকারীরা স্নান করে নতুন কাপড় পরেন। বেলা বারোটা নাগাদ পুরোহিত কাছাকাছি কোন পুকুরে যান জল আনতে। গলা উঁচু এই কলসীকে বলে বারিয়া। পুরোহিতের পেছন পেছন যায় শোভাযাত্রা। গাঁয়ের ছেলেমেয়ে, মেয়ে পুরুষ সবাই। কাঁসর, ঘন্টা, ঢাক, শাঁখ ও চাঙ্গল বাজে। ঘন্টা দুয়েক ধরে চলে এই বাদ্যিবাজনা যতক্ষণ না পুরোহিত জল নিয়ে আবার ফিরে আসেন ছাউনিতে। এই পাত্র বা কলসীই মা শীতলার প্রতীক। শীতলা পুজোর আগে বসুমাতা ও ধর্মদেবতার মন্ত্র পড়া হয়। এরপর পুরোহিতের সহকারীরা কাছাকাছি সব কিছুর ওপর জল ছিটিয়ে দেন। কলসীটি বসান থাকে পাটের বিড়ের ওপর। শিষ সমেত সিন্দুর মাখান ডাব দেওয়া হয় কলসীটির মুখে। দুর্বা দিয়ে তৈরী সুতোর মত মালা পরিয়ে দেওয়া হয় কলসীর গলায়। মেয়েদের শাড়িও পরানো হয় কলসীকে। নানা রঙের কাগজের মালাও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

কোন কোন সময় কলসীর পেছনে পটে আঁকা ছবিও থাকে। কলার পাতায় রোদে শুকানো ধান, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। এর পরে পূজায় বসেন পুরোহিত। পুজোর মন্ত্র খুব সরল ও সাধাসিধে। তাতে

গাঁয়ের মঙ্গল কামনা ও দেবীকে তুষ্ট করার কথাই বেশী থাকে। যেমন, তোমার পুজো দিচ্ছি মা। তুমি সন্তুষ্ট হয়ো, যেন কোন আগড়বাগড় না হয়। তোমার বলির জন্ম পাঁঠা দেব, মুরগি দেব[১৯], ইত্যাদি। হোম হয় বিকেল চারটেয়। উলু ঘাসের জ্বালানিতে ঘি ঢেলে আগুন ধরা হয় বিগ্রহের সামনে। ঘি ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে চলতে থাকে হোম।

এরপর উপহার বা ভোগের পালা। পাঁঠা, কালো ছাড়া মুরগি ইত্যাদি হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া হয়। উপহার দেওয়া হয় ভোগ। সন্ধ্যের আগেই নিবেদিত ভোগ গ্রামবাসীদের ভেতর বিলি হয়।

সন্ধ্যে হতে সুরু হয় নাচ গান ও বারমাস্যা পালা। বিগ্রহের সামনে জড়ো হয়ে গাঁয়ের লোক নৃত্যগীত করেন। এ সময় ভরও হয় কারো কারো। দেবীর আদেশ নির্দেশ ভর-হওয়া লোকের মুখ থেকে শোনা যায়। পুজো ও অনুষ্ঠান শেষে বিসর্জন হয় দেবীর।

শীতলা পুজো যে একসময় মেদিনীপুর জেলায় খুবই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য এখানে শীতলামঙ্গল রচনার বাহুল্য। এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কবিরা শীতলামঙ্গল রচনা করেছিলেন। এদের ভেতর বরদার (ক্ষীরপাইয়ে জন্ম) অকিঞ্চন চক্রবর্তী, কাশীজোড়ার (জন্মস্থান পশ্চিমমালিকা গ্রাম) শঙ্কর দেব, কেপুতের শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ও কাশীজোড়া রাজার সভাকবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য।

(৫) **যুগিনী পুজা:** শীতলা পুজোর সাথেই যুগিনী পুজো সংযুক্ত। গ্রাম থেকে দূরে বড় রাস্তার পাশে প্রধানত এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর উপকরণ, ভোগ ও নৈবেদ্য আগে থেকেই কিনে নেন গ্রামবাসী। সাময়িকভাবে একটি মাটির বেদীও তৈরি হয়। গোবর জলে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা হয় স্থানটি। বলি দেওয়া হয় কালো মুরগি। পুজোর পরে ফল, ফুল, মিষ্টি, এমন কি বলি দেওয়া মুরগিটাও ওখানে পড়ে থাকে। পুজোর ঘট বিসর্জন দেওয়া হয় পুজোর পরে।

(৬) **বড়াম বা গরাম পুজা:** লোধা-শবর ও বাউড়ী-বাগদীদের প্রধান গ্রাম্য দেবতা বড়াম বা গরাম। এদের ভেতর ইনি দীর্ঘকায় পুরুষ।

১৯, The Lodhas of West Bengal (Festive Cycle)—Dr. P. K. Bhowmick (1963)—বিশদ বিবরণের জন্ম দ্রষ্টব্য।

লোমশ শরীর হাতে কুড়ুল।[২০] অধিষ্ঠান গাছের নিচে। সব থেকে বড গাছ বা একাধিক গাছের ঝোপ বড়ামের পছন্দ বলে বিশ্বাস। পূজোর সময় সাধারণত মকর সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তি। শীতলা পূজোর সাথেও কোথাও কোথাও বড়াম পূজো হয়ে থাকে। পূজক নীচু জাতের লোক। নাম দেউরি বা দেহেরী। ভূঁইয়া, বাউড়ি, হাড়িয়া, পাত্র, বাগাল, লোধা ইত্যাদি নীচু জাতের লোকের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, রাজু ও অন্যান্য, বর্ণ হিন্দুরাও এর পূজো দিয়ে থাকেন। মাটির তৈরি হাতী ঘোড়া উৎসর্গ করা এই পূজোর বিশেষ অংগ।

(৭) **জাঠেল বা জাথেল উৎসব:** লোধাদের অর্থ নৈতিক জীবনকে-কেন্দ্র করে এই উৎসব। সাধারণত অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। কৃষিকাজের প্রারম্ভে তারা দেবতার করুণা ভিক্ষা করেন যাতে ফসল ভাল হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দেবতা বড়ামেরই নামান্তর। বনাঞ্চলে তসরগুটি কৃষির প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য। সেইজন্য সেখানে এই উৎসব পালিত হয় কার্তিকে। উৎসব পালিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ জমিতে নিড়ানি দেন না। বাধ্য হয়ে কাউকে দিতে হলে শাস্তিস্বরূপ পৃথক ভোগ নিবেদন করতে হয়।

(৮) **চণ্ডীপূজা:** এ জেলায় যে চণ্ডীর পূজা হয় তিনি বনদেবী। পৌরাণিক চণ্ডীর সাথে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বন্য ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে তিনি রক্ষয়িত্রী। বড়ামের মত এরও অধিষ্ঠান গাছের নিচে।

শাঁকরাইল থানার পিতল কাঠিতে যে চণ্ডী পূজিত তার নাম জয়চণ্ডী। ইনি যেমন প্রাচীন এর পূজা পদ্ধতিও তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পূজারী একই সাথে লোধা ও ব্রাহ্মণ। সাধারণত চণ্ডী মন্দিরে থাকেননা কিন্তু ইনি মন্দিরে অধিষ্ঠিতা। মন্দিরটিও দর্শনীয়।

পূজার সময় লোধা দেউরি বসেন উঁচু আসনে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিচে মাটিতে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, করণ, সদগোপ, তাঁতি, নাপিত, কলু, ধোপা, কুমোর, জেলে, কামার, ছুতোর, গোয়ালা, মুচি, ক্ষত্রিয় মাহাতো বা কুর্মী

শাঁকরাইল থানার কথা—অধ্যাপক সত্যেন বড়জী (১৯৬৪)

শ্রীঅশোক মিত্র লিখেছেন (District Hand Books 1951) গোপের কাছে গোপনন্দিনী হিসেবে গরাম পূজো হয়ে থাকে। দেবী মূর্তি, দুই হাত, বাঘের ওপর উপবিষ্ট। পৌষ ছাড়াও সময় বলেছেন ভাদ্র।

ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, মাঝি, নমঃশূদ্র, হাড়ি, ডোম, মাহালি, ভূমিজ, কোড়া, লোধা, সাঁওতাল ও মুসলমান সকলেই একে পূজা দিয়ে থাকেন।[২১]

(৯) **সাতভউনী**—শাঁকরাইল থানার বনপুরা গ্রামের কাছে এক অদ্ভুত ধরণের দেবীর দেখা পাওয়া যায়। নাম সাতভউনী। সাতভউনী মানে সাতবোন। ইনি যেখানে পূজা পান তার কাছাকাছি ছিল বোধহয় এক অনার্য রাজ্য। গড়ও ছিল একটি। সেই গড়েরই সাতটি দরজায় সাতজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। দক্ষিণ ও সদর দরজার কাছে যার অধিষ্ঠান ছিল তার নাম দুয়ার সুনী বা দক্ষিণ দুয়ারী। উত্তরে যিনি থাকতেন তার নাম শাঁকারী বুড়ি, পশ্চিমে দিয়াশী বুড়ি। পূবে যিনি তার নামই সাতভউনী। অপর তিনজনের নাম, কুবড়িয়া বুড়ি, কেঁউদবুড়ি ও গোপিয়া বুড়ি। গাছের নিচে এদের অধিষ্ঠান। মূর্তিও নেই কিছু। শুধু বনপুরার কাছে পাথরের বড় বড় দুটি কৌটা আছে। আর আছে সিংহের মত মুখ একটি নারী মূর্তি। পূজক লোধা ও মাঝি। এক সময় এখানে শোলাঙ্কি রাজাদের রাজ্য ছিল। সম্ভবত তারাই এই পূজার প্রচলন করেছিলেন।[২২] বনপুরা ছাড়াও বালিচক, শালবনি ইত্যাদি জায়গায় এদের পূজা হয়।

(১০) **বীরঝাপট:** কেশপুর থানার আনন্দপুরে এক বিচিত্র পূজা প্রচলিত আছে। নাম বীর ঝাপট। পৌষ সংক্রান্তিতে স্থানীয় হাড়ি সম্প্রদায় এই পূজা করে থাকেন। বিগ্রহ শিলামূর্তি। পূজার আগে দেবীর মাথায় পর পর তিনবার ফুল চাপান হয়। ফুলগুলি আপনাআপনি খসে পড়লে ধরে নেওয়া হয় পূজায় দেবীর অনুমতি আছে। যতক্ষণ না খসে পড়ে ততক্ষণ দেবীর মুখে বোতল বোতল মদ ঢালা হয়। পাশে একটি গর্তে জমা হয় মদ। পূজার পরে ভক্তেরা দেবীর প্রসাদ হিসাবে তা পান করেন। মানত থাকলে শূকর, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়।[২৩]

(১১) **সর পুজা:** মেদিনীপুরের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে কৃষি উৎসব সরপূজা পালিত হয়। ধান কাটার শেষ দিন বাড়ির কর্তা মাঠে যান একাকী। পাকা ধানের এক গোছা কেটে নিয়ে একা একা তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। সেদিন বাড়ির মেয়েরা গোবর ছড়া দিয়ে উঠানটি পরিষ্কার করেন। আলপনা

২১. শাঁকরাইল থানার কথা—অধ্যাপক সত্যেন ষড়ঙ্গী (১৯৬৪)।

২২. Ibid. ২১,

২৩. পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা—শ্রীসনৎকুমার মিত্র (১৩৮২)।

আঁকা হয় উঠান-প্রাঙ্গণে। তাতে থাকে কৃষির সাজসরঞ্জাম ও গরুর চিত্র। কর্তা যখন ধানের আঁটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, দূর থেকে দেখতে পেলেই মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে অভিনন্দিত করেন। ধানের আঁটি এনে যেখানে রাখা হয়, সেখানেই থাকে কৃষিকাজের সরঞ্জাম। মেয়েরা শাঁখ বাজান, উলু দেন। প্রতীক্ষা করেন কখন শেয়াল ডেকে উঠবে। যেদিক থেকে প্রথম শেয়াল ডেকে উঠবে সেদিকেই প্রথম বৃষ্টি হবে বলে এদের বিশ্বাস। সে রাতে পরিবারের সকলে চিঁড়ে মুড়ি ও ফল খেয়ে থাকেন।

(১২) **চাঁচর উৎসব :** ফাল্গুনী পূর্ণিমার আগের রাত্রে চাঁচর ও পরদিন পূর্ণিমায় দোল উৎসব এ জেলায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। লম্বা বাঁশের গাঁটে গাঁটে শুকনো তালপাতা বেঁধে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় প্রথমে। তারপর তাতে দেওয়া হয় আগুন। চাঁচরের সময় কাঁসর ঘণ্টা বাদ্যিবাজনা বাজে। শোভাযাত্রা করে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি ও ডুলি করে শালগ্রাম শিলা চাঁচর স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন বিশেষ পুজো হয় শ্রীকৃষ্ণের। প্রথমে আগুন দেওয়া হয় সবচেয়ে বড় চাঁচরটিতে। তারপর অন্যসব ছোট চাঁচরগুলিতে।

১(৩) **অন্যান্য দেবদেবী :** এ ছাড়া আর যেসব ছোটখাট দেবদেবীর পুজো ও উৎসব পালিত হয় তাদের ভেতর মৎস্যজীবীদের মৎস্য সংগ্রহে সাহায্যকারী মাকাল ঠাকুর, গড়বেতা থানার রূপার ঘাঘরা গ্রামের রূপাসিনী, আকছড়া গ্রামের বনদেবী শিকড়বাসিনী, নাচনজাম গ্রামের নাচনজামসিনী, ঝাড়বনি গ্রামের ঝাড়বনিসিনী, খড়িকাস্থলী গ্রামের পাষাণময়ী মূর্তি মাচাইসিনী ও বালিবিলাসিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি উল্লেখযোগ্য।

কৃষি শিল্প বাণিজ্য :

"In 1874 it was estimated that the area of rice-growing lands had increased by about 50 per cent. during the previous twenty years. There is little doubt that since then there has been a further large increase .."—L. S S. O' Malley.

ক. কৃষি

মীরকাশিম যখন বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সমর্পণ করেন, তখন মেদিনীপুরে ছোট বড় জমিদার ও তালুকদারের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। চুক্তিপত্রে স্পষ্ট করে বলা ছিল এইসব অঞ্চলে জমিদার ও রায়তদের পুরনো অবস্থাতেই রাখতে হবে।[১] আঠারো শতকের বাংলায় গ্রামের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই ছিলেন স্ব-নিযুক্ত কৃষক ও ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পী। অনেকেই কৃষি ও শিল্প উভয় সূত্রেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। জমিতে চাষ হত এক ফসল। প্রধানত আমন ধান। আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, ভিখারী বলতে গাঁয়ে তখন খুব কম লোকই দেখা যেত। অপরের জমিতে চাষ করেন, এমন কৃষকের সংখ্যাও বেশী ছিল না। ভূমি-মজুরের সংখ্যা ছিল খুবই কম। খুব দুর্দশাগ্রস্ত না হলে কেউ অপরের জমি চাষ করতে যেত না। চাষের সময় মজুরের কাজ চলত বিনিময় করে। ১৮০২ সালে জেলা জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ, স্ট্যাচি সাহেবের রিপোর্টও এই তথ্য সমর্থন করে।

বড় বড় শহর তখন বড় গ্রাম ছাড়া কিছু নয়। শহরে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাও হাতে গোনা যেত। গ্রাম্য জীবন আপাতদৃষ্টিতে যতই নিশ্চল ও জড় বলে মনে হোক না কেন, যে প্রধান শলাকা তাকে প্রাণবন্ত করে রাখত, তা হল সামাজিক দায়িত্ববোধ। অনুকম্পা ও সহানুভূতিতে আঠারো শতকের বাঙ্গালীর গ্রাম প্রায় এক পরিবারেরই রূপ নিয়েছিল। উনিশ শতকে শহুরে আবহাওয়া গ্রামে যতই অনুপ্রবেশ করতে থাকল, কর্তব্যনিষ্ঠা, দানশীলতা ইত্যাদি গুণগুলি ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে ততই লোপ পেতে থাকল।

১. বাংলার অর্থনৈতিক জীবন—নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ (১৯৬৭)

কৃষি নির্ভর গ্রামগুলির চেহারা এখন ক্ষয়িষ্ণু। মেদিনীপুরে এই চেহারা আরও দীন। কারণ পশ্চিমবাংলায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা শতকরা ৫৪ জন। মেদিনীপুরে এই হার অনেক বেশী। শতকরা ৭৬ জন।

কোন স্থানের কৃষিকর্মের কাঠামো ও তার সম্পূর্ণ ধারাটি নির্ভর করে ভূ-প্রকৃতি, মাটির গঠন ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর। এ জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের মাটি পলিগঠিত। হুগলী নদীর উপনদী ও শাখানদীগুলির অববাহিকা অঞ্চল। বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত। কৃষিকাজ বিশেষত ধান চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। অবস্থান অনুযায়ী কৃষি জমিগুলি তিনভাগে বিভক্ত। উঁচু জমি, নিচু জমি ও দেয়াড়া বা নদীবাহিত পলিতে গড়া তটভূমি। উঁচু জমিতে বালির ভাগ বেশী। প্রধানত রবি শস্যের চাষ হয়। জমির নাম গ্রামের ভাষায় কালা। কালা জমির ও দুটি উপভাগ। বাস্তু ও ধোসা। বর্ষা-কালের সুরুতে ধোসা জমিতে চাষ হয় আউশের। শীতে দ্বিতীয় ফসল ডাল বা তেলবীজ। নিচু জমিকে বলা হয় জলা। বর্ষাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলে ডুবে থাকে। গ্রীষ্মে কোথাও কোথাও তিলের চাষ হয়। দেয়াড়া জমি খুবই উর্বর এবং প্রায় সব রকম শস্যের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। সাধারণত রবি-শস্য, ডাল, গম, বার্লি, তেলবীজ ও নানাপ্রকার সবজি এই জমিতে উৎপন্ন হয়। কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় চাষের জমিকে দুটি নামে পৃথক করা হয়। মধুর বা মিষ্টি জল বিধৌত ও নিমাকি বা নোনা জলে ধোওয়া।

এ জেলার মোট কৃষিযোগ্য ভূখণ্ডের শতকরা ৮৬ ভাগ জমিতে চাষ হয় ধানের। সে ধানও প্রধানত হৈমন্তিক বা আমন।[২] বীজ ধান ছিটিয়ে দেবার বদলে আমন সাধারণত রোপন করা হয়। এ জন্যে তৈরী হয় বীজতলা। যে জমিতে জল বাঁধার ভয় নেই অথচ আর্দ্রও থাকে, এমন জমি বীজতলার জন্যে বাছাই করা হয়। নিপুনভাবে লাঙ্গল দিয়ে একর প্রতি কুড়ি থেকে পঁচিশ সের ধান ঘন করে বোনা হয়। জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত চলে রোপার কাজ। জমির উর্বরতা অনুযায়ী ছয় থেকে আট ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে

এ জেলায় আমন ধানের ভেতর উল্লেখযোগ্য: কাশিফুল, কলমকাঠি, সোনা,-গেরিকা জাল, হেমন্তা, রামশাল, দ্রৌপদীশাল, কালিন্দী, বজিকয়াল, জামাইগাড়ু, বকুলকুঞ্জ গয়াবালি, হলুদগুড়ি, সোনাতার, সিতাহার, বাঁশকুলি, দাউদখানি, কামিনীকুঞ্জ, রূপশাল, পাণ্ডুলই, পশীনাদন, চেঙ্গা, গুয়াখুরী, বাঁকুই, মহিষমুড়ি, পিঙ্গাশোল, মহীপাল, ভুতাশোল, কর্ণশাল, মেটে আকড়া, গাঁজাকলি প্রভৃতি।

আট থেকে বারো গোছা ধান রোপিত হয়। খনার বচনই এ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য সূত্র,

বোল পাতলা, ডাগর গুছি
লক্ষ্মী বলেন এখানেই আছি।

আশ্বিনের শেষে বা কার্তিকের প্রথমে যদি অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সে বৃষ্টি ফলনের পক্ষে খুবই উপযোগী। 'কার্তিকের ঊনো জলে, দোনা ধান খনা বলে।' বৃষ্টি বেশী হলে বা সাথে বাতাস থাকলে পাকার আগেই ধান মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়।

ধান কাটা সুরু হয় নভেম্বর মাস থেকে। চলে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

উঁচু, খোলা জমিতে চাষ হয় আউশের। রোপার বদলে ধান বোনা হয় ছিটিয়ে। মার্চের শেষে বা এপ্রিলের প্রথমে, কালবৈশাখীর ঝড় ও ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে মাটি যখন সামান্য আর্দ্র হয়, জমিতে চাষ দেওয়া হয় তিন কি চার বার। এর পরেই ছিটিয়ে দেওয়া হয় বীজধান। একর প্রতি প্রায় পনের সের। কখনও কখনও জমিতে একবার মাত্র নিড়ানি দেওয়া হয়। ফসল কাটা হয় সেপ্টেম্বর মাসে। আউশে[৩] চাষীরা নজর দেন না বেশী। তবু মোটামুটি ফলন হয় একর প্রতি বারো মনের মত।

জুন জুলাই মাসে আর এক ধরণের ধান এ জেলায় উৎপন্ন হয়। নাম আমলা। কাটা হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে। তিন রকমের চাল হয় এ থেকে। কাকরি, ঝাঞ্জি ও সুয়ান। কাকরি ধানের গাছ চার থেকে সাড়ে চার ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আর একজাতীয় ধানের নাম পাকই। বেশী জলে অর্থাৎ ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি জলে রোপিত হয়।

খড়্গপুর ও নারায়ণগড় থানা এলাকায় এক ধরণের ধান হয় যা সাটিয়া বা সেটিয়া নামে পরিচিত।[৪] বোয়া থেকে ষাট দিনের ভেতর এই ধান পেকে যায়।

৩. এ জেলার আউশ ধানের ভেতর উল্লেখযোগ্য, মন্দিরবণী, নেড়ানাতি আসলভূমনি, ঝিঙ্গা, ভূতমুড়ি, শাঁচী, পিঁপড়েশাব, সূর্যমণি, চন্দ্রমণি, মধুমালতী, শুকনি, কাজলা, দলকচু, লোহাগজাল, তুলসীমঞ্জুরী, সৌরভি, কালামাণিক প্রভৃতি।

৪. Report on the Survey and Settlement Operations (Midnapore) —A. K. Jameson (1918)

যে সব জায়গায় জলের আধিক্য আমন ধান নষ্ট করে, সেখানো বোরো চাষ হয়। চাষের পদ্ধতি আমন ধান চাষের মতই। জেলাব যেসব অঞ্চলে সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে, সেখানে এখন অধিক ফলনশীল ধানের চাষ হয়। এক ফসলের বদলে দুই বা তিন ফসলও উৎপন্ন হয়।

এ জেলায় আমন জমির অবস্থান বেশীর ভাগই নিচু জমিতে। বর্ষার সুরু থেকে জল জমে হয়ে ওঠে চাষেব অনুপযুক্ত। এই জমিগুলি যাতে আমন চাষের পক্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে কৃষিদপ্তর উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশ থেকে এক ধরণের ধান পরখ করে দেখছেন। বেশী জলেই এই ধানের ফলন ভাল হয়।[৫]

পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ধানচাষের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। বৃষ্টিপাতে দীর্ঘ বিরতি পডলে বা অনিয়মিত বৃষ্টি হলে, নানা রকম কীট ও ব্যাধির আক্রমণ ধানের ক্ষতি করে। বৃষ্টির অভাবে বেস্নুনিয়া নামে এক ধরণের রোগ ধানগাছের রস শুষে নেয় ও কমিয়ে দেয় বাড। শানরা ভেকু নামে এক জাতীয় কীট, ঢলদেটে করে দেয় গাছের চেহারা। ধবলি ও বোরা রোগও কীটের দ্বারা সাধিত হয়। এতে পাতা ও শিকড নষ্ট হয়ে যায়।

পাট বা এজাতীয় অর্থকরী শস্যের চাষ এ জেলায় বেশী হয় না। ঘাটাল মহকুমা ও সদর মহকুমার সবং থানা এলাকায় আখের চাষ কিছু কিছু হয়ে থাকে।

তেলবীজের ভেতর এখানে চাষ হয় সরিষা, রাই ও তিলের। সরিষা ও রাইয়ের ভেতর কাজলি ও মধুবনী (রাই) প্রধান। কাজলির গাছ ছোট, ফলন ভাল। মধুবনীর গাছ মাঝারি আকারের, বীজ সাদা, ফলন কম। তিল হয় চার রকমের। কৃষ্ণ তিল বা কালো তিল, সঙ্কি বা সাদা তিল ;—এই দুই ধরণের তিলই ডাংলা জমিতে উপন্ন হয়। সময় জুন জুলাই। সংগ্রহ করা হয় নভেম্বর ডিসেম্বরে। খাসলা তিল উৎপন্ন হয় আখের জমিতে। বোনা হয় মাচ এপরিলে, জুন মাসে কাটে। ভাদো তিল মে জুন মাসে জঙ্গল এলাকায় বোনে, কাটে আগস্ট সেপ্টেম্বরে।

ডালের ভেতর মটর, বিরুহি (মুগ), ছোলা, মুসুরি অড়হর ও খেসারি প্রধান।

Midnapore : Progress & Problems—D. M Midnapore (1972)

জেমসন সাহেবের রিপোর্টে[৬] দেখা যায় ভগবানপুর, পটাশপুর ও দাঁতন থানা এলাকায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে পানের চাষ ছিল ব্যাপক। মাটি উঁচু ও বালিমেশান, বরজের জন্য জমি লাগত আট কাঠা। কোদালে জমি ভেঙে, খৈল ও পুকুরের পাঁক দিয়ে তৈরি হত মাটি। এক হাত ফাঁকে ফাঁকে মাটির দাঁড়া করে বপন করা হত পানের চারা। বাঁশের চাঁচালি ঘেরা, মাথায় আগাছা ও চাঁচালির পাতলা ছাউনি দিয়ে তৈরি হত বরজ। যাতে আলো হাওয়ার কমতি না হয়। সাধারণত মে মাসে চারা রোপার কাজ হত। কখনও কখনও হত অক্টোবর ও নভেম্বরে। যখন লতা বেড়ে বরজের ছাউনি ছুঁয়ে ফেলে, তখন ঘুরিয়ে দেওয়া হয় লতার মুখ। সাধারণত বরজের উচ্চতা হয় পাঁচ থেকে ছ ফুট। পান চারার জীবন খুব ছোট নয়। বারো থেকে ষোল বছর পর্যন্ত বাঁচে। এক একটি বরজের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ বছর। সারা বছর ধরেই তোলা হয় পান পাতা। একই লতা থেকে তোলা হয় সপ্তাহে প্রায় দুবার। আটকাঠার একটি বরজে চারা থাকে প্রায় এক হাজার।

আগে বারুজীবি, বা বারুই সম্প্রদায়ের জাতিগত পেশা ছিল এই চাষ। এখন সব জাতের লোকই পান চাষ করেন। এলাকাও বেড়েছে অনেক। তমলুক মহকুমার তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না থানা এলাকা, কাঁথি মহকুমার রামনগর, এগরা, পটাশপুর ও ভগবানপুর থানা এলাকা, এ ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে জেলার প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে শুধু তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় প্রায় চার হাজার একর জমিতে চাষ হয় পানের। এই বিলাসী লতার পাতার নামও বাহারী, রকমও হরেক। বাংলা, সাঁচি, মিঠা, ইমল, ধল চাকুলিয়া ইত্যাদি। এদের ভেতর বাংলা পানের চাষই বেশী হয়। বাংলা পানের পরেই মিঠা ও সাঁচি পানের স্থান। দামের দিক থেকে মিঠা পান লাভজনক।

এ জেলায় বছরে সাইত্রিশ থেকে চল্লিশ কোটি টাকা দামের পান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই উৎপাদনের বেশীর ভাগই যায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। যেমন, আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, অন্ধ্র, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু

৬. Report on the Survey and Settlement Operations (Midnapore)— A. K. Jameson (1918)

ইত্যাদি।[৭] পানের কেনাবেচা ও চালান কেন্দ্র করে কয়েকটি আড়তও গড়ে উঠেছে। এদের ভেতর কাকটিয়া, মেছেদা, নন্দকুমার ও চৈতন্যপুর উল্লেখযোগ্য। মেছেদা ও পাঁশকুড়া রেলস্টেশন থেকে বেশীর ভাগ পান বাইরে চালান যায়।

মাদুর শিল্পের জন্য মেদিনীপুর এক সময় বিখ্যাত ছিল। এ জন্যে নল জাতীয় যে আগাছার চাষ হত তার নাম খাঞ্চি। বিশেষত পাঁশকুড়া, সবং ও নারায়ণগড় থানা এলাকায় এই চাষ ছিল ব্যাপক। সব থেকে জনপ্রিয়, ভাল জাতের মাদুরের নাম মসলন্দ। মোগল আমলেরও আগে থেকে প্রচলিত এই শিল্প এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে। সাধারণত কালা জমিতে চাষ হয় খাঞ্চির। খৈল, পাঁকমাটি দিয়ে চাষ হয় জাম। ঝুড়ি করে খাঞ্চির শিকড় বা মূল দশ থেকে বারো দিন ভিজিয়ে রাখা হয় জলে। যখন শিকড়ের গায়ে অঙ্কুর দেখা যায়, তাদের এক থেকে দুহাত অন্তর পুঁতে দেওয়া হয়। পোঁতার কাজ প্রধানত হয় এপরিল মে মাসে। কাটা হয় নভেম্বরে। কাটার পর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বাণ্ডিল বাঁধা হয় তাদের, ডালপাতা ছাড়ান হয়, বাইরের সুন্দর বাকলও ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এরপর আগাছাকে শুকান হয় রোদে। এ কাজে গাফিলতি বা দেরী হলে নষ্ট হয়ে যায় আগাছার সৌকর্য।

এ ছাড়া ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় তুঁত চাষও হয়ে থাকে। কোদাল দিয়ে মাটি কোপান হয় আঠারো ইঞ্চি গভীর করে। ঢেলাগুলি দেওয়া হয় ভেঙে, বার দুয়েক চাষ দিয়ে সমান করে নেওয়া হয় মাটি। জমি তৈরি করার পর আঠারো ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে গর্ত খোঁড়া হয়। বসিয়ে দেওয়া হয় তুঁতের চারা। চারা যখন বেড়ে ওঠে, জলে ভরিয়ে দেওয়া হয় জমি। তুঁত চারা লাগান হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবরে। পাতা সংগৃহীত হয় মে জুন মাসে।

সবজির ভেতর বেশী পরিমাণে চাষ হয় আলু, বেগুন, লংকা, পালং ইত্যাদি। কৃষিজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য এ জেলায় ওয়ারহাউস ও গোডাউন আছে ৭১৭টি। এদের ভেতর ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে ৬৩১টি, সরকারি গোডাউন ৩৬টি, বড় কোঅপারেটিভ গোডাউন ৫টি. মাঝারি আকারের কোঅপারেটিভ গোডাউন ৩৮টি। হিমঘর ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে ৮টি, সরকারি ১টি। এদের মোট দ্রব্য গুদামজাত করার ক্ষমতা ৯ লক্ষ

৭, তমলুক ও কাঁথির পান ও পানচাষী—সুধাংশু ভৌমিক।
(তমলুক প্রদর্শনী ও মেলা, ১৯৭৭ স্মারকগ্রন্থ)

টন। ৯টি হিমঘরের ৭টিই সদর মহকুমায় ও এক একটি করে আছে ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায়।[৮]

কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে বড় বড় নটি বাজার বা কেন্দ্র আছে, তাদের একটিও কাঁথি ও তমলুক মহকুমার এলাকাধীন নয়। প্রধান প্রধান যেসব সামগ্রী এগুলিতে কেনাবেচা হয় তাদের ভেতর ধান, চাল, খেসারি, আলু, পাট ও নারিকেল উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রগুলির চারটি সদর মহকুমায়, অবস্থিত তাছাড়া গড়বেতা ব্লকের আমলাগোড়া, বালিচক ও ডুধকুমার কেন্দ্রগুলিও উল্লেখযোগ্য।

এ জেলায় কৃষিকাজ এখনও পুরনো প্রথা অনুসরণ করে চলে আসছে। বর্ষাই একমাত্র ভরসা। রবি শস্যে জলের প্রয়োজন খুব। কিন্তু এখানকার মাটি জল ধরে রাখতে পারে কম। ফলে রবিশস্যের ফলন ভাল হয় না। চাষও ব্যাহত হয়। এই অবস্থা দূর করবার জন্য সরকার কিছু কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। যদিও সমস্যার বিশালতার তুলনায় এই প্রচেষ্টা খুবই সীমিত। দুটি বড় প্রকল্প, মেদিনীপুর ক্যানেল সিসটেম ও কংসাবতী প্রজেক্ট সদর মহকুমা এলাকায় ১৩৫ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে প্রত্যাশা। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় দুটি ছোট প্রকল্প ৩০ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে ধারণা। ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় সেচ বিষয়ক ছোট বা বড় প্রকল্প এখনও হাতে নেওয়া হয়নি। সুবর্ণরেখা কালিঘাই বাঁধ প্রকল্প পুনরায় হাতে নিয়ে কাজ চালু করলে জেলার অনেকাংশ উপকৃত হবে। ১৯৬৯-৭০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ জেলার মোট সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ২,২৯৫৮৫ হেক্টর। এর ভেতর শতকরা ৫৪ ভাগ সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, ২১ ভাগ তমলুক মহকুমায়। বাকি এলাকা তিনটি মহকুমার ভেতর বিভক্ত। মোট সেচপ্রাপ্ত এলাকার মহকুমাগত আনুপাতিক হার, তমলুকে শতকা ৭৪, ঘাটালে ৩৮, কণ্টাইয়ে ১১, ঝাড়গ্রামে ১৬, সদরে ৪৬ ভাগ। ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় বড় কোন সেচ প্রকল্প না থাকলেও সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ অন্য অংশের তুলনায় খারাপ নয়।[৯]

---

৮ Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—Deptt. of Economic Studies, UBI (1971).

৯. Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—Department Economic Studies, UBI (1971)

জেলার সামগ্রিক কৃষিঅঞ্চল প্রশাসনিক দিক থেকে দুটি জেলায় বিভক্ত। মেদিনীপুর পূর্ব বিভাগ বা জেলা। তমলুক, কাঁথি ও ঘাটাল মহকুমা এই বিভাগের অন্তর্গত। এবং মেদিনীপুর পশ্চিম বিভাগ বা জেলা। সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা এই জেলার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব বিভাগ বা জেলার সদর দপ্তর তমলুকে। পশ্চিম বিভাগ বা জেলার সদর দপ্তর মেদিনীপুর সহরে। উভয় জেলারই মুখ্য প্রশাসক প্রিন্‌সিপ্যাল এগ্রিচালচারাল অফিসার। এ ছাড়া একজন যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জয়েণ্ট ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার) আছেন। যিনি উভয় জেলাই তদারকি করেন। তাঁর দপ্তর মেদিনীপুর সহরে।

স্বাধীনতার আগে এ জেলার বনাঞ্চল কয়েকটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগগুলির মালিকানা ও তদারকি ছিল (১) মেদিনীপুর জমিদারী কোং (২) ঝাড়গ্রাম, লালগড় ও রামগড়ের রাজার ও (৩) মুর্শিদাবাদের নবাবের।[১০] তখন বন নিয়ে বেশী ভাবনা ছিল না। স্বাধীনতার আগেই এদিকে সরকারের নজর পড়ে। জমির ক্ষয়রোধ ও বন সংরক্ষণের জন্য সরকার আইনও প্রণয়ন করেন।[১১] উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালেই পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগও গঠিত হয়। তার সদর কার্যালয় হয় মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয় এ বিভাগের। ১৯৪৭ সালে এই বিভাগ দুইভাগে ভাগ হয়। দুটি জেলার দুটি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ গঠিত হবার পর কাঁথিতে একটি নার্সারীও স্থাপিত হয় (১৯৪৫-৪৬)। এর পরের বছরই জুনপুট ও দীঘায় পরীক্ষামূলকভাগে দু একর জমিতে বৃক্ষ রোপন সুরু হয় ঝাউয়ের গাছ দিয়ে। পরবর্তীকালে এ জেলার সমস্ত বনাঞ্চল দুটি ডিভিসনের আওতায় ভাগ করে ফেলা হয়। মেদিনীপুর পূর্ব বিভাগ ও মেদিনীপুর পশ্চিম বিভাগ। ঝাড়গ্রাম ও সদর দক্ষিণ মহকুমার অধিকাংশ বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বিভাগ। বাকি বনাঞ্চল নিয়ে পূর্ব বিভাগ। দুই বিভাগের মোটামুটি সীমারেখা কংসাবতী নদী।

১৮৯৮ সালে খড়্গপুর ও ঝাড়গ্রাম ছুঁয়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খোলার সাথে সাথে বনজ দ্রব্য ও কাঠের চাহিদা দেখতে দেখতে হু হু করে বাড়তে সুরু করে। বনও যে সম্পদ সেকথা জমিদারেরা বুঝতে সুরু করেন। চলতে

---

১০. Forests of Midnapore—S. N. Misra. Dy, Conservator of Forests.

১১. Bengal Private Forests Act 1945.

থাকে গাছ কাটা ও বেচা। সব থেকে বেশী চোট পড়ে শাল গাছের ওপর। বর্তমানে ভূমি সংরক্ষণের জন্য কেলেঘাই নদীর অধিত্যকায় প্রায় ৮২০ একর জমিতে এক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কংসাবতী ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ তৈরি হয় ১৯৬৪ সালে। তার এলাকাধীন দু'হাজার একর জমি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয় এক বছরের ভেতরেই। দ্বিতীয় দফায় প্রতি বছর পাঁচ হাজার একর জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রকল্পাধীন।[১২]

চব্বিশ-পরগণার সুন্দরবনাঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে আর কোন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা বা স্যাংচুয়ারী নেই। যদিও এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সৌন্দর্যমণ্ডিত। বনাঞ্চল কোথাও কোথাও গভীর ও বিস্তীর্ণ। বিশেষত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের সীমান্ত ঘেঁষে ডুশো বর্গ মাইলের এক ব্যাপক এলাকা বনাঞ্চল। এখানে অল্প আয়াসেই একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা বা স্যাংচুয়ারী গড়ে উঠতে পারে। কলকাতা ও কাছাকাছি অনেকগুলি শিল্পাঞ্চল ও বর্ধিষ্ণু সহরের অধিবাসীদের কাছে এটি খুব সহজেই যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

মেদিনীপুরে অর্থকরী বনজ সম্পদ বলতে শাল গাছের জ্বালানি, শাল খুঁটি ও কাজুবাদাম। ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রথম দুটি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮৫.৯৫ হাজার সি. এম. ও ৫৯.১৩ সি. এম.। কাজুবাদাম থেকে আয় হয়েছিল ৯৮ লক্ষ টাকা।[১৩]

১২ The Forest of the Southern Circle—Its History and Management—K. C. Roychowdhury, Conservator of Forests.

১৩. Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District.—UBI (1971)

খ. শিল্প

> "No steps have been taken to improve the ancient manufactures, or to introduce new ones……"—W. W. Hunter.

১৮৭৬ সালে হাণ্টার সাহেব যখন এ স্ট্যাটিস্টিকাল একাউণ্ট অব বেঙ্গল সংকলন করেন, বড শিল্প বলতে এ জেলায় কিছুই ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না তার। কৃষি নিভর জীবন যাত্রায় কৃষিভিত্তক ক্ষুদ্র ও কুটীব শিল্পই ছিল গ্রামীণ জীবনে অর্থ নৈতিক ঘাটতির পরিপূরক। অবশ্য এর আগে প্রায় শতাধিক বছরের ইংরেজ শাসন ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। যেসব শিল্প বংশানুক্রমিক ধারায় গড়ে উঠেছিল, অতি দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছিল তাদের। ইংরেজ আমলে সেসব শিল্প পুনরুজ্জীবিত করাব চেষ্টা যেমন হয়নি, তেমনি কিছু কিছু শিল্প জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে এই অবস্থার তেমন গুরুত্বপূর্ণ হেরফেব ঘটেনি। সহরে রুচি ও বহির্বাণিজ্যের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পের পত্তন হয় এখন। ফলে এ জাতীয় শিল্পের সাথে গ্রামীণ জীবনের সম্পর্ক থাকে অতি ক্ষীণ। কৃষি-ভিত্তিক ও গ্রাম-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প তাই এখনও অবহেলিত। এদের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন এখনও উপেক্ষিত। যদিও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃত কোন উন্নতি করতে হলে এইসব শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ অনস্বীকার্য।

হাণ্টার সাহেবের সময় জমিই ছিল রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস। শিল্প ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামান হত কম। জানাশোনার ভেতব শিল্প বলতে ছিল মাদুর, কাঁসা পিতলের বাসন, তসর ও লবণ। চমৎকার মাদুর তৈরি হত তখন রঘুনাথবাড়ি, কাশিজোড়া ও নাড়াজোলে। মেদিনীপুর সহরে তৈরি হত কাঁসা পিতলের বাসন, কাপ, প্লেট ও রান্নার তৈজসপত্র যা গেরস্থালী কাজকর্মে সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। তসর শিল্পের প্রচলন ছিল সীমিত। নীল ও রেশম শিল্পের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন মেসার্স রবার্ট ওয়াটসন এণ্ড কোং।[১]

নবাবী আমল থেকে 'নিমক মহাল' বা লবণ উৎপাদনকারী এলাকা থাকত নবাবের খাস দখলে। ইংরেজ আমলেও এই ব্যবস্থার রকম ফের ঘটেনি।

১. A Statistical Account of Bengal—Vol III—W. W. Hunter

১৭৬০ সালে মীরকাশিম যখন মেদিনীপুর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেন, লবণ উৎপাদনের লাভজনক মহাল 'হিজলী' রেখে দেন নিজের হাতে। পাঁচ বছর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার দেওয়ানী লাভ করে, স্বভাবতই কোম্পানীও এই লাভজনক ব্যবসা নিজের খাসদখলে রেখে দেয়। ১৭৮১ সালে কোম্পানী এই ব্যবসা পরিচালনার জন্য নয়া দপ্তর খোলেন, নাম নিমক দপ্তর বা সল্ট ডিপার্টমেণ্ট। ১৮৫২ সালের এক হিসাবে দেখা যায় হিজলীর কৃষকদের তিন চতুর্থাংশ চাষ ও লবণ শিল্প উভয় কাজে নিযুক্ত। তাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল।

সাধারণত কার্তিক মাস থেকে সুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এ অঞ্চলে লবণ তৈরির কাজ চলত। যেসব জমি বর্ষাকালে জোয়ারের জলে ধুয়ে যেত, সেইসব জমিতেই তৈরি হত লবণ। জমিগুলিকে বলা হত চর। চর জমির আবার 'খালাড়ী' নামে ছোট ছোট ভাগ ছিল। প্রতি খালাড়ীতে কাজ করত সাতজন করে 'মলঙ্গী'। লবণ উৎপাদিত হত দুশো তেত্রিশ মণ। মলঙ্গীরা সাধারণ প্রথায় মাটি থেকে লবণাক্ত জল পরিস্রবণ করে কাঠের আগুনে গরম করে নিত। জল বাষ্পে পরিণত হলে, নিচে পড়ে থাকত লবণ। পরে ওই লবণ একত্রিত করে গুদামে জমা করা হত। লবণাক্ত জল গরম করার জন্য কাছাকাছি যে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগৃহীত হত, তাকে বলা হত 'জালপাই জঙ্গল'। বিশেষভাবে রক্ষিত হত এইসব জঙ্গল।[২]

মলঙ্গীদের পারিশ্রমিক ছিল প্রতি একশো মণ লবণে বাইশ টাকা। ছ মাসের জন্য বেতন বা পারিশ্রমিক পেতেন তাঁরা। বাকি ছ'মাস বিনা খাজনায় বা সুবিধাজনক সর্তে কৃষি জমি (মধুরী বা চাকরান্) ভোগ করতেন। নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় খালাড়ীর সংখ্যা ছিল চার হাজার।[৩] শুধু হিজলীতেই উৎপাদিত লবণের পরিমাণ ছিল ৮৫০,০০০ মণ।[৪] ১৭৬৫ সাল থেকে প্রায় ১৮৬১ সাল পর্যন্ত লবণের ব্যবসা ছিল ইংরেজদের একচেটিয়া। সিসিল বিডন যখন বাংলার ছোটলাট (১৮৬২-৬৩), সেই সময় সরকার নিয়ন্ত্রিত লবণের একচেটিয়া কারবার তুলে দেন।[৫] অবশ্য এর কয়েক বছর আগে থেকেই

২ ও ৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু

৪. Mr. 'Grants' Report 1786

(Bengal District Gazetteers, Midnapore—L S S O' Malley

৫. ডনির্থর্ণ ও কর্লিক যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের শেষ সল্ট এজেণ্ট।

বিলিতি লবণ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হতে থাকে। সরকারকে কর দিয়ে দেশী লবণ প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছিল না। পরে আইন করে লবণের কারবার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে লবণ উৎপাদনকারী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে।[৬] বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে কিছু পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কাঁথির সমুদ্রোপকূলে প্রায় দশ হাজার লোক এই ব্যবসায় নিযুক্ত। মোট লবণ উৎপাদিত হয় ২০,০০০ টন। পশ্চিমবাংলায় মোট উৎপাদিত লবণের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ।[৭]

ওম্যালি সাহেবের জেলা গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। তার আগেই বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খোলা হয়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপও তৈরি হয় খড়্গপুরে (১৯০৪)। আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই কারখানার মোট এলাকা তখন ছিল ৭৭ একর। এর ভেতরে ছাউনি ঢাকা ছিল ৯ একর এলাকা। লোকোমোটিভ তৈরি ও মেরামতির কারখানা ছিল এটি। ১৯০৮ সালেই মোট কর্মী সংখ্যা ছিল ৫,৯৭৫।[৮] পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও মাদ্রাজের দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত ছিল এর শ্রমিক-বাহিনী। বর্তমানে এটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। শুধু খড়্গপুর রেলওয়ে কলোনীরই এখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৩,৪৩৫।[৯] যোগেশবাবু লিখেছেন খড়্গপুর রেলওয়ে সেটেলমেন্টের মোট জমির পরিমাণ চোদ্দ হাজার বিঘা। কাছাকাছি ছ'টি গ্রাম এর আওতায় পড়েছিল।

ওম্যালি সাহেব সম্পাদিত গেজেটিয়ারে শিল্পের আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[১০] বিশ শতকের গোড়া থেকেই মেদিনীপুরে রেশম শিল্পের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে।[১১] দাসপুর থানায় মেসার্স লুই, পায়েন এণ্ড কোং অব লায়নস তখন উঠে যায়। তবু দাসপুর থানার মহেশপুরে ও ঘাটাল থানার গড়প্রতাপপুর, রামচন্দ্রপুর ও মহারাজাপুরে কয়েকটি রেশম কুঠি ছিল। ঘাটাল ও তমলুক মহকুমাতেই প্রধানত চাষ হত তুঁত ও গুটিপোকার। গুটিপোকার শ্রেণীবিভাগ ছিল চার প্রকার। নিস্তারি বা মাদ্রাজী, ছোট-পালু বা দেশী, বড়-পালু ও চিনা-পালু। ঢালি বা সাদা সিল্ক তৈরি হত বড়-পালু থেকে।

---

৬ ও ৮. Bengal District Gazetteers, Midnapore—L. S. S. O Malley

৭. Report of the Fact Finding Survey, Midnapore District—UBI.

৯. Census of India 1971, West Bengal Series 22 Part II— A.

১০. দুঃখের বিষয় ১৯৬১ সালের জেলা গেজেটিয়ারে শিল্প সম্পর্কিত অধ্যায়ই অনুপস্থিত।

১১. Bengal District Gazetteers, Midnapore (1911)—L. S.S.O' Malley.

রেশম বয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল চন্দ্রকোণা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। মেদিনীপুরের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তো বটেই এমনকি হাওড়া ও হুগলী থেকেও বয়নের জন্য রেশম সুতা আসত চন্দ্রকোণায়। নানা ধরণের রেশম বস্ত্র ঘাটাল ও দাসপুর থেকে কলকাতা ও অন্যান্য বাজারে যেত বিক্রয়ের জন্য। ১৯০৭৮ সালের হিসাবে দেখা যায় প্রায় এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার রেশম বস্ত্র তৈরি হত এ জেলায়। উনিশ শতকে যে শিল্প ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল, তারই অতি দীন চেহারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ১৯৫০ সালে ডাইরেকটরেট অব ইণ্ডাসট্রিজের এক সমীক্ষায়। যেখানে আগে র-সিল্ক তৈরি হত ৬৩,০১০ পাউণ্ড তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছিল তখন মাত্র ৬৬ থেকে ৮১ মণে।[১২] এ অবস্থার এখনও কোন পরিবর্তন হয়নি।

তসর গুটিও এ জেলায় উৎপন্ন হত প্রধানত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল গোগোই, সুনগা, শিলদা ও রামগাঁওয়ে। ময়ূরভঞ্জ ও সিংভূম থেকেও আমদানী হত বেশ। তসর বয়ন কেন্দ্র ছিল কেশপুর থানার আনন্দপুরে ও নারায়ণগড় থানার কেশিয়াড়ী ও গগনেশ্বরে। বয়ন ছাড়া এখানে রঙও করা হত। সাদা, পীত, নীল, বেগুনি, ময়ূরকণ্ঠী।' রঙের বাহারও কম ছিল না। ১৮৫২ সালে কেশিয়াড়ীতে আট থেকে ন শো তাঁতির বাস ছিল। বর্তমানে পঞ্চাশ ঘরও হবে কিনা সন্দেহ।[১৩] আনন্দপুরের জাঁকজমকও ছিল বেশ, আয়তনে মেদিনীপুর সহর থেকেও বড় ছিল আনন্দপুর। ১৭৯৯ সালে চয়াড় বিদ্রোহের সময় দুইবার এই গ্রাম লুণ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরের প্রায় সব গ্রামেই দেশী তাঁতে সুতী বস্ত্র তৈরি হত।[১৪] ধুতি, শাড়ি, চাদর ও ছিট কাপড় ছিল এইসব বস্ত্রের ভেতর প্রধান। মূল কেন্দ্র ছিল চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও রাধানগর। মিলে তৈরি কাপড় ব্যাপকভাবে বাজার ছেয়ে ফেলায় তাঁত শিল্প মার খেতে থাকে। ক্ষীরপাই তখন ছিল হুগলী জেলার একটি মহকুমা শহর। ইংরেজ ও ফরাসীরা এখানে কুঠি তৈরি করেছিলেন। সুতি ও রেশম বস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হত। মিলের সাথে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এই শিল্প আবার জোরদার হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুরের তাঁত বস্ত্রের নামও হয়েছে বাজারে।

১২. District Handbooks, Midnapore (1951)

১৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশ চন্দ্র বসু (২য় সং)

১৪. Bengal District Gazetteers Midnapore…L. S. S. O' Malley,

তমলুক মহকুমার রাধামণি ও কাছাকাছি গ্রামগুলিতে তৈরি মশারি, লুঙ্গি, গামছা হাওড়া হাট ও কলকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাণে চালান যায়। ঘাটাল মহকুমার নিমতলা ও রামজীবনপুরের ও কাঁথি মহকুমার অমর্শী গ্রামের মিহি ধুতি ও শাড়ির যেমন চাহিদা সুনামও তেমনি। ১৯৭০ সালে এ জেলায় হস্তচালিত তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল ৬,৫৮৬।[১৫]

অবশ্য স্বাধীনতার আগে তাঁত শিল্প যে পর্যায়ে ছিল, এখনও ঠিক সে অবস্থায় এসে পৌঁছুতে পারেনি। যদিও এ সময় শিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল, তবু ১৯৪০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এ জেলায় তখন ফ্রাই শাটল তাঁতের সংখ্যা ছিল ৬,৫৯৭ ও থ্রো শাটল তাঁত ছিল ২০৫০টি। মোট বস্ত্র তৈরি হত হত ৬,৭৭৪, ৬৬০ গজ যার মূল্য ছিল ৩০, ০৬, ১৬৮ টাকা।[১৬]

মাদুর শিল্পের জন্য বিখ্যাত মেদিনীপুর। মাদুর, মসলন্দি বা মসলন্দ ও ঝাঁতলা তৈরি হত পাঁশকুড়া, সবং ও নারায়ণগড়ে। এদের ভেতর মসলন্দি যেমন সুন্দর তেমনি প্রসিদ্ধ। মোগল আমলেই এই শিল্প এ জেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এমনকি সরকারি খাজনা পর্যন্ত দেওয়া হত মাদুরে।[১৭] মাদুর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য স্থায়ী হাট ছিল চারটি। প্রতি হাটে হাজার থেকে দু হাজার পর্যন্ত মাদুর বেচাকেনা চলত।[১৮] উৎকৃষ্ট মাদুর তৈরি হত কাশীজোড়া ও নাড়াজোলে। ১৯০৭-০৮ সালে তৈরি মাদুরের সংখ্যা ছিল ৪,৪৮,৩০০।[১৯] ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর এখন এই শিল্প উন্নয়নের জন্য নজর দিয়েছেন। মাদুর তৈরির এলাকাও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে রামনগর, এগরা, পিংলা, সবং ও পাঁশকুড়া থানা এলাকায় মাদুর তৈরি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মিরগোদা, দুবদা রঘুনাথবাড়ি, ও বালিচক। ১৯৭০ সালে মাদুর তৈরির মোট সংস্থা এ জেলায় ছিল ৭,৭৪২টি।[২০]

---

১৫. Report of the Fact-Finding Survey on Midnapore District-UBI (1971)

১৬. District Handbooks, Midnapore. (1951)

১৭ Final Report on the Survey and Settlement Operations, Midnapore A. K Jameson I C S. 1918

১৮ Bengal District Gazetteers—L S S O'Malley.

১৯. Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal—J G. Cumming (1908)

২০. Report of the Fact—Finding etc—UBI (1971)

কাঁসা পিতলের বাসন ও তৈজসপত্র তৈরির জন্য প্রধান কেন্দ্র ছিল ঘাটাল, খড়ার, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা ও রামজীবনপুর। ঘাটাল ও খড়ারে এই শিল্প ছিল খুবই সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত। স্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট ও জাপান থেকে আসত টিন, উৎপাদিত দ্রব্য চালান যেত কলকাতার বড়বাজারে। খড়ারে তখন ন' হাজার অধিবাসীর ভেতর চার হাজারই এই শিল্পে লিপ্ত থাকতেন।[২১] "সারা গ্রাম কাঁসা পিতলের ঝনঝনানিতে অনুরণিত হত।"[২২] স্বাধীনতার আগেই ১৯৩৯ সালে এই শিল্পের এক সমীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, ঘাটালে উৎপাদিত কাঁসা পিতলের পরিমাণ ছিল তখন ২,৪০০ মণ, মূল্য ৭০,০০০ টাকা। ফ্যাক্টরী ছিল পরিবার ভিত্তিক ১৬ টি, মহাজন ভিত্তিক ১২টি। নামকরা দ্রব্য বদনা ও গাড়ু। খড়ারে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ৭,০০০ মণ, মূল্য ৪,৯০,০০০ টাকা, ফ্যাক্টরী পরিবার-ভিত্তিক ২৫, মহাজন ভিত্তিক ১৫, নামকরা দ্রব্য থালা ও প্লেট।[২৩] ১৯৭০ সালে কাঁসা পিতলের বাসন তৈরির মোট সংস্থার সংখ্যা ছিল ৯,১১৫।[২৪]

দাসপুর থানার দক্ষিণ-পূর্বাংশ শিল্পজাত দ্রব্য ও চিরুণি ব্যবসার ঘাটি। মূল কেন্দ্র জোতঘনশ্যাম গ্রাম। দেড়শো বছর আগেও এই শিল্প ছিল বেশ জমজমাট। রুচি পরিবর্তন ও চিরুণি তৈরির কৃত্রিম উপাদান চালু হবার পর শিল্পটি প্রায় উঠে যেতে বসেছিল। সম্প্রতি সরকারী শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রভাবে নানা ধরণের সৌখীন জিনিস ও জীবজন্তুর মূর্তি তৈরি হওয়ায় শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন শিঙ আমদানী হয় প্রধানত মাদ্রাজ, বিহার, আসাম ও দার্জিলিং থেকে। প্রথমে আসে কলকাতায়। চিরুণি তৈরী হবার পর চালান যায় আসাম ও উড়িষ্যায়। স্থানীয় চাহিদাও খুব নয়। এই অঞ্চলেই পশ্চিমবাংলায় চিরুণি তৈরির অন্যতম প্রধান এলাকা। এখানকার চিরুণিতে যশোরের ছাপ দেওয়া হয়।[২৫]

২১. Bengal District Gazetteers, Midnapore—L S S, O'Malley (1911)

২২. Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal– J. G. Cumming

২৩. District Handbooks, Mid (1951)

২৪. Report etc —UBI (1971)

২৫. ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায় (১৯৭৭)

Report of the Fact-Finding Survey on Midnapore District—UBI

অন্যান্য প্রাচীন শিল্পের ভেতর এ জেলার আর উল্লেখযোগ্য শিল্প মাটির হাঁড়ি কলসী ও দ্রব্যাদি, শঙ্খ শিল্প, তালগুড়, গরম বস্ত্র, ডাকের সাজ ও সোলার কাজ। ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও সদর মহকুমার মাটির হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি তৈরী হয়। দাসপুর ও ঘাটালের মাটির পাত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হুগলী ও হাওড়াতে এদের চাহিদাও বেশ।[২৬] অন্যান্য কুটীর শিল্পের মত শঙ্খশিল্প এক সময় এ জেলায় খুব উন্নত ছিল। বাজাবার শাঁখ, পাণিশঙ্খ, বালা, চুড়ি, আংটি, কোটা, মালা, ফুল, কানের টপ ও দুল ইত্যাদি তৈরি হত এখানে। এখন বোতাম, খেলনা ইত্যাদি তৈরি সুরু হয়েছে। এগুলির উৎপাদন লাভ-জনক।

১৯৫৩ সালে ডাইরেক্টরেট অব ইণ্ডাসট্রিজ তালগুড় শিল্পের এক সমীক্ষা করেন। তাতে দেখা যায় এ জেলায় তালগাছের সংখ্যা তিন লক্ষ। এর ভেতর ৪১,০৭০ টি গাছ থেকে রস সংগৃহীত হয় গুড় তৈরির জন্য। গুড়ের পরিমান ১,৪৬৬ টন। পরবর্তীকালে যেসব গাছ থেকে রস সংগৃহীত হয় তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,২৮,৬৯৩। শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ারে[২৭] গুড় তৈরির ২৫টি কেন্দ্রের হদিস পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত গবেরি সম্প্রদায়ের লোকেরা মেদিনীপুরে বসবাস করার ফলে জীবিকা অর্জনের জন্য গরম বস্ত্র ও কম্বল তৈরি করেন। ঘাটাল মহকুমার সোলা ও ডাকের কাজ খুব প্রসিদ্ধ। মালাকার নামক এক সম্প্রদায় এই কাজ করে থাকেন। এ ছাড়া ডেবরা থানার লোয়াদা গ্রামে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হয়। আগে এখানে অনেকগুলি মিছরীর কারখানাও ছিল। তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, রামনগর ও নাগাছীতে নারকেলের ছোবড়া থেকে কয়ার শিল্প গড়ে উঠেছে।

২৬. District Handbooks, Midnapore (1951)

২৭. Ibid. ২৮

গ. ভবিষ্যৎ শিল্পাঞ্চল

স্বাধীনতার আগে এ জেলায় কর্ম সংস্থানের বড় কেন্দ্র বলতে ছিল খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। যদিও স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে ভারতের নানা রাজ্যের কর্মীরাই এখানে সংখ্যায় বেশী। বিশ শতকের মাঝামাঝি কারিগরী শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানটি এখানে স্থাপিত হলেও, আগের মত এ জেলাটি শিল্পের দিক থেকে অনুন্নতই থেকে যায়। এমন কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোদ্যোগের যে পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন, তার আওতা থেকেও বাদ পড়ে জেলাটি। উনিশশো পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে এ রাজ্যে শিল্পের কিছুটা প্রসার ও উন্নয়ন ঘটেছিল। তবে এই প্রসারের অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত ছিল চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে। পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে চলেছিল শিল্পের ক্ষেত্রে মন্দার বাজার। তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে শিল্প বিনিয়োগের উন্নতি ঘটলেও এ জেলায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠে নি। যদিও কাঁচামাল, শ্রমিক, পণ্যের বাজার, এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিক থেকে এ জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনা তুচ্ছ করার মত নয়।

প্রকৃতপক্ষে হলদিয়ায় বৃহত্তর শিল্পাঞ্চল ও খড়্গপুর-নিমপুরায় সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলি ছাড়া, এ জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উন্নয়ন পাঁচটি ধারা অনুসরণ করে পরিপুষ্ট হতে পারে। এক, যে প্রাচীন কুটীর শিল্প এক সময় খুবই জমজমাট ছিল কিন্তু বর্তমানে প্রায় উঠে যেতে বসেছে, তাদের আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভজনক করে পুনরুজ্জীবিত করা। দুই, যেসব ক্ষুদ্র শিল্প এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও জেলাতেই চাহিদা আছে ও ভাল বাজার পেতে পারে, সেগুলিকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা। তিন, জেলার কৃষি সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সমর্থিত ক্ষুদ্র শিল্প নির্বাচিত করে স্থাপন করা। চার, খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল কাজে লাগিয়ে শিল্প পত্তন ও ওই কারখানার ব্যাপক চাহিদা মেটাতে ছোট ছোট আইটেম বা উপাদান সরবরাহ করার মত শিল্প সংস্থা গড়ে তোলা। পরিশেষে, হলদিয়া বন্দর ও শিল্পকেন্দ্রের চাহিদা মত উপাদান সরবরাহ করার মত শিল্পসংস্থা।

জেলা হিসেবে মেদিনীপুর যেমন বড়, এর আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রাচুর্যও

তেমনি যথেষ্ট। শিল্পের দিক থেকে এতদিন অবহেলিত এই জেলাটির এখন জেগে ওঠার সময় এসেছে। কাঁচামাল ও চাহিদার ভিত্তিতে যে যে শিল্পাঞ্চল এ জেলায় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দেওয়া হল।

খড়্গপুর-নিমপুরা শিল্পাঞ্চল—রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ছাড়া খড়্গপুর-মেদিনীপুরে আর একটি শিল্পসংস্থা ছিল তাঁতিগেড়িয়ার সুতাকল। এটি আকারে মাঝারি শিল্পসংস্থা। বর্তমানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভঃ করপোরেশানের[১] তত্ত্বাবধানে খড়্গপুরের কাছাকাছি নিমপুরায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে দুটি মাঝারি আকারের শিল্পসংস্থা এখানে স্থাপিত হয়েছে। একটি স্কুটার কারখানা অপরটি মেটাল প্রসেসিং, রোলিং মিল ও মেটালারজিকাল যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা।[২] আরও কয়েকটি মাঝারি আকারের শিল্পসংস্থা এখানে প্রতিষ্ঠিত করার তোড়জোড় চলছে।

খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ওপর ভিত্তি করে যেসব মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা এখানে সহজেই গড়ে উঠতে পারে তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য ১. ব্রেক ব্লক ২. বোল্ট, নাট ও স্ক্রু ৩. হিঞ্জ, রিভেট ওয়াশার ও পিন ৪. কাঠের গুঁড়ো থেকে হার্ডবোর্ড তৈরির কারখানা।

ব্রেক ব্লকের জন্য কমপক্ষে দুটি সংস্থা এখানে গড়ে উঠতে পারে। এতে ওয়ার্কশপের মোট বাৎসরিক চাহিদার শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার সাত লক্ষ ব্রেক ব্লক ওয়ার্কশপ কিনে থাকে। প্রয়োজনীয় কাঁচামালও পাওয়া যেতে পারে কারখানার স্ক্র্যাপ থেকে। বোল্ট, নাট ও স্ক্রুর চাহিদা বছরে প্রায় দুশো পঞ্চাশ টন। ওয়ার্কশপ থেকেই প্রাপ্ত কাঁচামাল রি-রোলিং মিলের সাহায্যে এইসব উপাদান তৈরী করতে পারে। হিঞ্জ, রিভেট, ওয়াশার ও পিন দরকার হয় বছরে প্রায় দুশো টন। একটি ছোট আকারের সংস্থা এসব তৈরী করতে পারে ওয়ার্কশপ

১. The West Bengal Industrial Infra Structure Development Corporation তৈরি হয়েছে West Bengal Act XXV of 1974 অনুসারে।

২. The West Bengal Scooters Limited চালু হয়েছে ১৯৭৬ সালে। অপরটি, The Davy Ashmore India Pvt. Ltd. পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এটির উদ্বোধন করেন ৩১. ১০. ১৯৭৭।

থেকেই উচ্ছিষ্ট কাঁচামালে। উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারও ওয়ার্কশপ। কাঠের গুঁড়ো প্রচুর পরিমাণে রেলওয়ে কারখানা থেকে বের হয়। এ ছাড়া এ জেলার নানা জায়গায় যেসব কাঠ চেরাইয়ের প্রতিষ্ঠান আছে, সেসব জায়গা থেকেও সংগৃহীত হতে পারে কাঠের গুঁড়ো। এর ওপর ভিত্তি করে মাঝারি আকারের একটি হার্ডবোর্ড তৈরির কারখানা এখানে স্থাপিত হতে পারে।[৩]

এ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আরও কয়েকটি সুবিধা আছে। যেমন, (১) এখানে রেলওয়ে ওয়ার্কশপের অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্য ও নিয়োগ সহজ লভ্য। (২) যা তৈরী হবে সাথে সাথে তা স্থানীয় বাজারে বিক্রী হতে পারে। (৩) কাঁচামালের নিশ্চিন্ত ভাণ্ডার রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। (৪) সুবিধাজনক ভাড়ায় কারখানা বা কারখানার জায়গা পাওয়া যেতে পারে। বৃহত্তর বাজারের জন্য রেলওয়ে ও সড়ক দুটি পরিবহণ মাধ্যমই একেবারে হাতের গোড়ায়। তাছাড়া কারিগরী ক্ষেত্রে গবেষণা ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির দারস্থ হওয়া যায় পা বাড়ালেই।

ঝাড়গ্রাম শিল্পাঞ্চল—শুধু যে শিল্পের দিক থেকে তাই নয়, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সহুরে সুযোগসুবিধার অভাব, সব দিক থেকেই এ জেলার ভেতর ঝাড়গ্রাম মহকুমা সব থেকে অনুন্নত। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় তিরিশ ভাগ উপজাতি ও চোদ্দভাগ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়।[৪] অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী। মোট ভূখণ্ডের সাতাশ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানা মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মহকুমা সহর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে। বর্ষাকালে সুবর্ণরেখা নদী যখন ফুলফেঁপে ওঠে, একমাত্র বিহার উড়িষ্যায় ভেতর দিয়ে ছাড়া এই অঞ্চলদুটির অভ্যন্তরে যাবার কোন পথ থাকে না। ফলে স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত এই মহকুমাটি শিল্প স্থাপন ও মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। পুরনো ধাঁচের শিল্প সংস্থা বলতে ছিল মাত্র ৫২টি। তাও অতি ক্ষুদ্র।

৩. Report of The Fact Finding Survey on Midnapore District—UBI (1971).

৪. মোট জনসংখ্যা ৬,৫৮,১০৫ · উপজাতি প্রায় ২,০০,০০০ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ৮০,০০০—Census, 1971

মহকুমার দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে ষাট দশকের শেষাশেষি যে ব্যাপক নকশাল আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেছিল, তারপর থেকেই এদিকে রাজ্য সরকারের নজর পড়ে। গঠিত হয় ঝাড়গ্রাম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড।[৫] একজন কেবিনেট পর্যায়ে মন্ত্রী এর সভাপতি।[৬] এই বোর্ড বা পর্ষদের লক্ষ্য চারটি। মহকুমার নানা জায়গায় যেসব সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের সুসংগঠিত ও ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা। (খ) এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ছাড়া ছাড়া পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন করা। (গ) উন্নয়ণমূলক কাজগুলির তদারকি (ঘ) কার্যক্ষেত্রে পরিকল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ণের মূল্যায়ণ ও মূল্যায়ণের ফলে আসামঞ্জস্য দেখা দিলে তার অপসারণ।

পর্ষদ ইতিমধ্যেই শিল্পস্থাপন ও উন্নয়নের জন্য একটি ম্যাক্রোপ্ল্যান বা বড় পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এর আগেই পশ্চিমবঙ্গ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম সহরের সহরতলিতে একটি কাগজের কল তৈরির কাজকর্ম সুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কাগজের কলটি, মেসার্স ইউনিভার্সাল পেপার মিল দিনে কুড়ি টন কাগজ উৎপাদন করবেন বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন। পরবর্তীকালে এর উৎপাদন দাড়াবে দিনে পঞ্চাশ টন। অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও হবে প্রায় চারশো কর্মীর। এ ছাড়া অভক্ষ্য তেল তৈরীব একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছিল পর্ষদ গঠিত হবার আগেই। স্টেট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিম, মহুয়া, কাজুবাদাম ইত্যাদি থেকে "অয়েলস এণ্ড ফার্টিলাইজারস" নামে এই সংস্থা উৎপাদন সুরু করে উনিশশো বাহাত্তর সালেই। তেল ছাড়াও সার তৈরীর একটি প্রকল্প এই সংস্থা চালু করতে চান। কাঞ্চন অয়েল ইণ্ডাষ্ট্রীজ ও মণ্ডল অয়েল ইণ্ডাষ্ট্রীজ নামে আরও দুটি সংস্থা তৈল উৎপাদনেয জন্য কারখানা গড়ে তুলছেন। নিম ও মহুয়ার বীজ থেকে এরাও তৈল আহরণ করবেন।[৭]

৫. উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে জানুয়ারী, ১৯৭৩ সালে একটি নতুন সেল তৈরি হয়। নাম ঝাড়গ্রাম এ্যাফেয়ার্স ব্রাঞ্চ। দুমাস পরে মার্চে গঠিত হয় ঝাড়গ্রাম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড।

৬. অবশ্য (নভে, ১৯৭৭) এখন যিনি সভাপতি তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী।

৭. এছাড়া কাজুবাদাম প্রসেসিংয়ের জন্য একটি ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে: বিশ্বনাথ কেষু ফ্যাক্টরী। মুদ্রণ ইত্যাদির জন্য হয়েছে প্রিণ্টেকস।

এই মহকুমায় একটি বোন মিল বা হাড কল ও একটি ছোট চিনি কলও পর্ষদ স্থাপন করতে চান। এছাড়া কাজুবাদাম প্রসেসিং ইউনিট, করাত কল, সাবুই ও সিসেল থেকে দড়ি তৈরি, ইট তৈরি ও পাথরের বাসন কোসন তৈরির কারখানা এ অঞ্চলে অনায়াসেই গড়ে উঠতে পারে।

পাথরের তৈজসপত্র তৈরি ঝাড়গ্রামের পুরনো কুটীর শিল্প। বিনপুর, জামবনী ও ঝাড়গ্রাম এলাকায় দুশোর কাছাকাছি পরিবার জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে একেই অবলম্বন করে আছেন। এ জাতীয় তৈজসপত্রের বড় বাজার বলতে শিলদার হাট। মহাজন ও ব্যাপারীদের মাধ্যমে হাত ফেরতা হবার ফলে উৎপাদনকারী পরিবারগুলি অন্যান্য জিনিষের মত এর ক্ষেত্রেও যথোপযুক্ত দাম পান না। বড় বড় সহরে সরকারি বিপণি কেন্দ্রের মাধ্যমে জিনিষগুলি বিক্রী হলে এবং দালাল ও মহাজনদের কবল মুক্ত করতে পারলে এই শিল্পটিকে সহজেই পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। গোপীবল্লভপুরেব তসর শিল্প এক সময় আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ীর মতই সমৃদ্ধ ছিল। এই শিল্পটিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব কিনা সেটিও বিচার্য।

কাঁথি শিল্পাঞ্চল—মোটা কথায় কাঁথির প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে নদ-নদী সমুদ্র, খাল বিল ও জলাঞ্চল। মাছ এখানকার সম্পদ। এবং যেহেতু মাছেভাতে বাঙ্গালী, প্রাকৃতিক সম্পদের এই দিকটি আদৌ উপেক্ষনীয় নয়। মহকুমার প্রায় দশ শতাংশ অধিবাসী কোন না কোন দিক দিয়ে মৎস্যশিল্প ও মৎস্য ব্যবসায়ের সঙ্গে সংযুক্ত। পশ্চিমবাংলায় মোট মাছেব চাহিদা বছবে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার মেট্রিক টন। উৎপাদন হয় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন। ফলে সারা বছর ধরেই ঘাটতি থাকে মাছের। এদিক থেকে এ জেলার চেহারা আরও দীন। এখানে প্রতিদিন মাছের চাহিদা দুশো ছাব্বিশ মেট্রিক টন। অথচ যা উৎপাদিত হয় তাতে শতকরা প্রায় সত্তব ভাগের মত ঘাটতি থেকে যায়। যদিও এখানে মাছ চাষের এলাকা একেবারে কম নয়।[৮]

মাছেব চাহিদা প্রতিদিন ২২৬ মেট্রিক টন অর্থাৎ বছুবে ৮২,৪৯০ মেট্রিক টন। উৎপাদন ২৫,৩০০ মেট্রিক টন। ঘাটতি ৫৭,১৯০ এম. টি বা ৬৯·৩২%। মোট মাছ চাষেব এলাকা ২,৭৪,৩০৪ হেক্টব। এব ভেতব পুকুব বা ট্যাঙ্ক ফিসাবি ৪৪,২৪০ হেঃ, বিল বাঁওড় খাল নদী ৪০,৮০০ হেঃ, বন্যায নদী মুখে ফিসাবি ৫২,০০০ হেঃ, ভাসাবাদা ফিসাবি ৮১,৬৬৪ হে।

—Integrated Tribal Development Plan for Four I T.D P. Areas in Midnapore Dist. West Bengal. Agriculture Information Cuntre. Bidhan Chandra Krishi Viswa Vidyalaya. (Monograph)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে মাছের চাষ হয় রামনগর ও দীঘা থানা এলাকায়। মিষ্টি ও আধা মিষ্টি জলের মাছ যাতে বেশী উৎপাদিত হতে পারে সেজন্য সরকারি মৎস্য প্রকল্প চালু হয়েছে জুনপুট ও দীঘায়। এ ছাড়া গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, মাছ ধরার সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ ও উপযুক্ত দামে বিক্রীর জন্য কতকগুলি প্রাথমিক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।[১] সাতাশটি প্রাথমিক সমিতির কাজকর্ম সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবি সমিতিও গঠিত হয়েছে। রামনগর থানার তেরটি গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে মাছ ধরার একটি বড প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন। এতে খরচ হবে আটষট্টি লক্ষ টাকা। উপকৃত হবেন সতেরশো জেলে পরিবার। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে এই অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

মাছ ছাড়াও এক সময় কাঁথির সমুদ্র উপকূলে বিশিষ্ট শিল্প ছিল লবণ তৈরি। কাঁথির যে মহকুমা সদর কার্যালয় সেটি একসময় ছিল সলট্ এজেন্সীর হেডকোয়াটার্স। জালপাই জঙ্গলগুলি পরবর্তীকালে বণ্টিত হয়েছিল চাষের জমি হিসাবে। সম্প্রতি আবার লবণ শিল্প এ অঞ্চলে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে। সমুদ্র তীরে রূপসী দীঘা কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বছরে প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশী পর্যটক আসেন দীঘায়। এই সব কিছু একত্রিত করে পরিকল্পনার মাধ্যমে এখানে অনায়াসে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যায়। বরফের অভাবে ঠাণ্ডা পানীয়ের এখানে যথেষ্ট অভাব। অথচ পর্যটকদের সৌখিন পানীয় বলতে এটাই। কাঁথি সহরে যে বরফের কল আছে চাহিদার তুলনায় তার যোগান দেবার ক্ষমতা সীমিত। সামুদ্রিক মাছ পচন থেকে সংরক্ষণের জন্য হিমঘরেরও প্রয়োজন। এ জেলায় যত মাছ ধরা হয় তার প্রায় শতকরা পঞ্চাশভাগ ধরা পড়ে রামনগর ও দীঘা থানা এলাকায়। কাজেই মাছ মাঝখানে রেখে অনেকগুলি শিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে। যেমন, মাছ ধরার জাল তৈরি, মাছ সংরক্ষণ, ফিস ক্যানিং, নৌকা তৈরি ও মেরামত ইত্যাদি। এ ছাড়া নারকেল গাছ এখানে প্রচুর। নারকেল ছোবড়া থেকে কয়ারশিল্প এখানে গড়ে উঠতে পারে। এক সময় এখানে বেতের কাজ ছিল প্রশংসনীয়। সেই ধারাটিকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়। স্থানীয় চাহিদা অনুসারে ক্যাটলফিড, অভ্যাক্ষ তৈল, করাত কল, ইট ও টালী তৈরি, কাজুবাদাম জাত শিল্প এসব তো আছেই।

---

১. বর্তমানে (১৯৭৬) এ ধরণের প্রাথমিক সমবায় সমিতি কাজ করছে ৪৪টি।

হলদিয়া শিল্পাঞ্চল

> "The Nucleus of the Haldia complex at the confluence of rivers Hoogly and Haldi about 100 kms from Calcutta is a new port town .. Haldıa as a major port in the Eastern Region has become a potential town in the state's economic geography."– Prindent's speech : Seminar on the Prospect & Posibilities of Small Scale Chemical Industries at Haldia. (21.1.1977).

হুগলী ও হলদী নদীর সঙ্গমমুখে এই জেলা ও সারা পশ্চিমবঙ্গের যে রূপরেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তারই নাম হলদিয়া। মাত্র কয়েক বছর আগেও এখানে ছিল ধূ ধূ ধানক্ষেত। গ্রাম্য চেহারা সর্বাঙ্গে জড়ানো। নদী পথ ছাড়া কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চল ছিল এ জেলার অন্যান্য এলাকার মতই অনুন্নত।

বহুদিন থেকেই বিশেষজ্ঞেরা বলাবলি করছিলেন পলির দৌরাত্মে হুগলীর বুক ভারী হয়ে উঠেছে। বড় বড় জাহাজ চলাচল করা বিপজ্জনক। বাঁকগুলি যেন জাহাজ গেলার হামুখ। কলকাতা বন্দর যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় কাছাকাছি বিকল্প বন্দরের ব্যবস্থা করা দ্রুত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ঠিক করেন সহায়ক বন্দর হবে একটি।[১] জায়গা ঠিক হয় হলদিয়া।

সি লেভেল বা সাগরাঙ্কের তুলনায় সাত থেকে এগারো ফুট উঁচু। আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। বছরে গড় বৃষ্টিপাত পঞ্চাশ থেকে বাষট্টি ইঞ্চি। কলকাতা থেকে এমন কিছু দূরেও নয়। সাগরমুখী নিম্নস্রোতে ছাপান্ন নটিক্যাল মাইল। হলদিয়া যেন এই গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেবার জন্য নিঃশব্দে দিন গুনছিল।

---

১. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সিদ্ধান্ত নেন ১৯৫৯ সালে। এ বিষয়ে ভারত সরকার একটি স্টাডি টীম বা সমীক্ষক দল গঠন করেন ১৯৬৪ সালে। তারা রিপোর্ট দেন ১৯৬৫-তে। জানান ১৯৭৫-৭৬ সালে কলকাতা-হলদিয়া পথে মাল চলাচলের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৯ মিলিয়ন টন। পরে মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্টের ট্রান্সপোর্ট রিসার্চের ডিরেক্টর ডঃ ভাটিয়া জানান ১৯৮৫-৮৬ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৫ মিলিয়ন টন।—An Outlıne Development Plan for Haldıa Industrıal Urban Complex—Dev & Planding (T & CP) Deptt (1975).

বন্দরের সাথে সাথে তৈল শোধনাগার ও সার তৈরির কারখানা করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উনশি শো তেষট্টি-চৌষট্টি সালে স্থুরু হয় বন্দর ও তৈল শোধনাগারের কাজ। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্ল্যানিং কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। মেদিনীপুর এমনিতেই শিল্পের দিক থেকে অনুন্নত জেলা। হলদিয়া সহ সমগ্র জেলাটিকে অনুন্নত হিসাব ঘোষণা করেন।

রাজ্য সরকার এ রাজ্যে আটটি গ্রোথ সেণ্টার বা শিল্প কেন্দ্রাভিগ অঞ্চল স্থাপন করতে প্রয়াসী ছিলেন। যাতে কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলার ওপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমিয়ে এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এমনি একটি গ্রোথ সেণ্টার হিসাবেও নির্বাচিত হয় হলদিয়া।

অনুন্নত জেলা হিসাবে ঘোষিত হবার ফলে মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এখানে কয়েকটি স্থযোগ স্থবিধা সহজ লভ্য। ফলে ছোট বড মাঝারি অনেক শিল্প সংস্থাই এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গডে তুলতে আগ্রহী। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জেলাটি শিল্প সমৃদ্ধিতে যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে তারই প্রাথমিক কার্যকলাপ এখন পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হতে স্থুরু করেছে।

হুগলী ও হলদী নদীর মোহনায় হলদিয়ার হৃদ্‌পিণ্ড বন্দরটি। বন্দর পাশে রেখে গডে উঠেছে বন্দর উপসহর। এলাকা সাডে চৌদ্দ বর্গমাইল। মূল দুটি শিল্প সংস্থা তৈল শোধনাগার ও সার প্রকল্প এই উপসহরের অন্তর্ভুক্ত। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য মূলধন বিনিয়োগ হবে চারশো পঁচাত্তর কোটি টাকা। কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কিছু কিছু শেষ হবার মুখে। যেমন হলদিয়া ও বারাউনির ভেতর পাইপ লাইন বসানো, পাঁশকুডা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত রেলপথ, তেল জেটি ও কোলাঘাট এবং মেচেদার ভেতর জাতীয় সডক একচল্লিশের আংশিক নির্মাণ। এখনই এই উপনগরীর জনসংখ্যা ষাট হাজারের কাছাকাছি।

বন্দর উপসহর মাঝখানে রেখে আরও দুটি উপসহর অদূর ভবিষ্যতে দুদিকে গড়ে উঠবে। একটি হলদী অপরটি দুর্গাচক। যেন ডাম্বেলের দুদিকে দুটি নব। বন্দর উপসহর বা পোর্ট টাউনের গা ঘেঁষে হবে হলদী টাউন। আয়তন তিন হাজার তিনশো পনের একর। একদিকে হলদী নদী অন্যদিকে জাতীয় সডক একচল্লিশের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে হবে এই সহরের ব্যাপ্তি। উপসহরের মূল

এলাকা একশো একর। সেখান থেকে পোর্ট টাউন ও দুর্গাচক সহরে যাবার পথ থাকবে সুবিন্যস্ত। এক লক্ষ আশি হাজার মানুষের বসবাসের মত জায়গা থাকবে এই সহরে। এখানেও থাকবে একটি শিল্পাঞ্চল। যার এলাকা ১৯৬.৫ একর।

তিনটি টাউনশিপের ভেতর দুর্গাচক টাউনশিপের আয়তনই সব থেকে বড। সুতাহাটা থানা এলাকায় এই উপসহরের অধিষ্ঠান। আয়তন হবে সাত হাজার পাঁচশো পনের একর। এখনই লোকসংখ্যা তিরিশ হাজার। গ্রামে গ্রামে ছডিয়ে ছিটিয়ে এদের বসবাস। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা দাঁডাবে দু লক্ষ উনতিরিশ হাজার। টাউনশিপের মূল কেন্দ্র হবে একশো ষাট একর এলাকা জুডে। শিল্পাঞ্চলও থাকবে একটি। তার এলাকা ১,৬৮৫.৫ একর। সুতাহাটা-দুর্গাচক সডকই যাতায়াতের প্রধান উপায়। এ ছাডা আছে পাঁশকুডা-হলদিয়া রেলপথ। এখন এই রেলপথ শুধু মাল চলাচলের জন্যেই উন্মুক্ত। ভবিষ্যতে যাত্রী যাতায়াতের জন্য বিদ্যুতের সাহায্যে চলবে বলে প্রত্যাশা। একটির বদলে লাইনও হবে দুটি। এখানেই হলদিয়া প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যেসব পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলছে। সডক ও রেলপথ ছাডাও নদীপথে ডায়মণ্ডহারবার এখান থেকে খুব কাছাকাছি।

শিল্প সংস্থাগুলির ভেতর তৈল শোধনাগার পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন স্বরু করে দিয়েছে। প্রাইভেট সেকটরে মেসার্স পেট্রোকার্বণ ও ইউরেকা কেমিক্যালস্ সংস্থা দুটিও স্বরু করেছে উৎপাদন। এছাডা আরো একটি সংস্থা এখানে প্রতিষ্ঠান গডে তোলার কাজ চালাচ্ছে।[২]

হলদিয়ায় শিল্পাঞ্চল গঠন ও রূপায়ণের দায়িত্ব ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভঃ করপোরেশনের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃত্বাধীন এই সংস্থাটিরও বয়স বেশী দিন নয়। শিল্প সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুবিধা

২. তৈল শোধনাগারের পরীক্ষামূলক উৎপাদন সুরু হয়েছে ১ জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে। মোট তিনটি সংস্থা এখনও পর্যন্ত প্রাইভেট সেকটরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথা, মেসার্স পেট্রোকার্বণ, ইউরেকা কেমিক্যালস ও মেট্রোআর্ক প্রাঃ লিঃ। লেটার অব ইনটেণ্ট পেয়েছেন ১৩টি সংস্থা। আবেদন বিবেচনাধীন আছে ৪টি সংস্থার। —Functions and activities of the Corporation in respect of the Haldia Growth Centre—A Brief Resume ; R. M. Mitra, C. E. O., W. B. I. I. D. C. (1977)

অসুবিধা থেকে সুরু করে হলদী ও দুর্গাচক উপসহর দুটির নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বিন্যাস সবই সংস্থাটির কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের উপনিবেশ গড়ে তোলাও এর কাজ। এক কথায় বলতে গেলে হলদিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্বাণ কমপ্লেক্স বা হলদিয়া শিল্প সহরাঞ্চল গড়ে তোলার মুখ্য ভূমিকা এই করপোরেশনের।

বিশ্ব জুড়ে তৈলাভাবের কথা স্মরণ রেখে হলদিয়ায় একটি পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরির প্রস্তাব ওঠে ১৯৬৪ সালেই। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার এটি অনুমোদন করতে ইতস্তত করেন। ফলে প্রস্তাবটির ভবিষ্যত নথিবদ্ধ হয়ে থাকে দীর্ঘকাল। হলদিয়ায় এই সংস্থা স্থাপিত হলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বহুবিধ ছোট ছোট ও আনুষঙ্গিক শিল্প সংস্থা গড়ে উঠবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আবার যোগাযোগ সুরু করেছেন। হলদিয়ায় পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।[৩] এই প্রকল্পে মোট মূলধন বিনিয়োগ হবে একশো ষাট কোটি টাকা। প্রত্যক্ষভাবে চাকুরির সংস্থান হবে চার হাজার লোকের। এছাড়া আর যেসব শিল্প এই সংস্থা কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে তাতে পরোক্ষভাবে চাকুরির সম্ভাব্য সংস্থান এক লক্ষ ষাট হাজার।

হলদিয়া এ জেলার ভবিষ্যত। যেন এক প্রতিভাময় কিশোর। যৌবনে যার কর্মকাণ্ডের প্রভাব এ জেলার ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে এরই কাছাকাছি এক সময়কার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র তাম্রলিপ্তের স্মৃতি তখন নতুন করে জেগে উঠবে।

৩ কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যালসের মন্ত্রী শ্রী এইচ. এন বহুগুণা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সাথে হলদিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ২৩ আগষ্ট ১৯৭৭। এই সংস্থা এখানে প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্বাস দেন।

ঘ. বাণিজ্য কেন্দ্র

উনিশ শতকের মাঝামাঝি[1] মেদিনীপুর জেলার বাণিজ্যিক দ্রব্য বলতে ছিল ধান, চাল, নীল, চিনি, আখের পাটালি, চামড়া, মাদুর, রেশম বস্ত্র ও তসর। সহর ও গ্রামে বাণিজ্যিক কেন্দ্র বলতে ছিল মেদিনীপুর সহর, কালিঘাই, পাঁশকুড়া, তমলুক, চন্দ্রকোণা, কুকড়াহাটি, ঘাটাল, কেসিয়াড়ী ও নওদা। এ ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে বড় বড় মেলা বসত। সেখানেও বেচাকেনা হত যথেষ্ট পরিমাণে। এদের ভেতর উল্লেখযোগ্য ছিল কালিঘাই নদীর তীরে তুলসি চৌরা, নারায়ণগাও পরগণায় গোপীবল্লভপুর (ঝাড়গ্রাম), মহিষাদল, এগরা, আঁধিরি, ঝারিপুর ও কুতুবপুর। জেলার বাইরে চালান যেত ধান, রেশম ও চিনি। আসত সুতীবস্ত্র ও সুতা-গুটি।

বিশ শতকের প্রথমে[2] দেখা যায় বাণিজ্য কেন্দ্র নতুন করে বাড়েনি। কিন্তু রপ্তানী দ্রব্য বেড়েছে অনেক। যেমন, আগে যা ছিল তার সাথে যুক্ত হয়েছে গুড়, পাট, তৈলবীজ, ছোলা, ডাল, কাঁচা কয়লা, পিতল ও কাঁসার বাসন, কাঠ, সুতীবস্ত্র, মাটির পাত্র ও শবজি। আমদানী দ্রব্যও বেড়েছে যেমন কয়লা ও কোক, কেরোসিন তেল, পাটের বস্তা, তামাক, আলু, এনামেলের তৈজসপত্র ও পেরেক। ডায়মণ্ডহারবারের উল্টো দিকে কুকড়াহাটির হাট ছিল ধান চালের সব চেয়ে বড় বাজার। হলদী নদীর ওপর, গেঁওয়াখালি থেকে বারো মাইল দূরে হরিখালির হাট জালামুঠা পরগণার অন্তর্গত না হলেও, এই পরগণার অধিবাসীদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উত্তরাঞ্চলে কল্যাণপুর পরগণায় দহিজুড়ির হাট সাঁওতালদের বড় হাট। তাদের কাছে হাটের দিন মানেই উৎসবের দিন। সাঁওতাল নরনারীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষত সস্তা ও শৌখিন সামগ্রীর চাহিদা এখানে খুব। খড়্গপুরের কাছকাছি টেঙরা হাট বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে খড়্গপুর রেল স্টেশনের জন্য। এই হাটটি প্রধানত পশুপক্ষী বিক্রীর জন্য প্রসিদ্ধ। গরু, ছাগল পাঁঠা, ভেড়া, মুরগি, পায়রা ও সবজি এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়।[3]

হাণ্টার সাহেবের সময় : A Statistical Account of Bengal, Vol III.
Bengal District Gazetteers—L. S S O'Malley. (1911)
Final Report on the Survey and Settlement, Dist of Midnapore (1903—1911) Ramapada Chatterjee.

সম্প্রতি পান কেন্দ্র করে যে কয়েকটি আড়ত ও বাজার গড়ে উঠেছে তাদের ভেতর কাকটিয়া, নন্দকুমার, চৈতন্যপুর ও তমলুক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঘাটাল, দুধকুমরা, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, মেদিনীপুর, বালিচক, আমলাগোড়া সি. কে. রোড ও বেলদা বর্তমানে বড় বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।[৪]

৪. Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District – U.B.I. (1971).

৬. লোক শিল্প বা সামাজিক শিল্প :[১]

"The handiwork of craftsmen finds its best and natural market in the innumerable fairs and melas of the country."
—A. Mitra, I. C. S.

পূজা পার্বন ও গ্রাম্য উৎসব কেন্দ্র করে প্রায় সারা বছর ধরেই লোক জমায়েত হয় ও মেলা বসে গ্রামে। মেলাগুলির যেমন নানা বৈচিত্র্য প্রাচুর্যও তেমনি। সহরে অ-কৃষিজীবি মানুষ ও গ্রামের কৃষিজীবি মানুষের ভেতর অভ্যাস, চাহিদা ও রুচির দিক থেকে যে কতখানি ফারাক, গ্রামের মেলাগুলি ঘুরলে তা স্পষ্ট করে চোখে পড়ে।

গাঁয়ের মানুষের বিত্ত কম। তাদের দৈনন্দিন কাজের সাজ-সরঞ্জামগুলিও সহরে মানুষের চাহিদার সাথে মেলে না। ফলে এগুলি যোগান দেবার জন্য গাঁয়েই গড়ে উঠেছিল কতকগুলি সম্প্রদায় যাদের জাতিগত পেশা ছিল এসব তৈরি করা। এখনও বাংলার গ্রামে এমন নটি সম্প্রদায়ের[২] হদিস পাওয়া যায়। কৃত্রিম বিকল্প দ্রব্য অঢেল পরিমাণে আমদানীর ফলে এইসব সম্প্রদায়ের অনেকেই জাতিগত পেশা ছেড়ে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। তবু ক্ষীণভাবে এখনও টিকে আছে এই ধারা।

লম্বা ফালি কাগজ বা কাপড়ের ওপর যারা ছবি আঁকেন এবং সেসব ছবি বা পটের মাধ্যমে যারা ব্যক্ত করেন রামায়ণ, ভাগবত বা মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলি, তাদের বলা হয় চিত্রকর বা পটুয়া। চিত্রকর পরিবারগুলি গ্রাম বাংলার প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। পশ্চিমবাংলায় যেসব পরিবার আছে স্বর্গীয় সুধাংশু কুমার রায়[৩] তাদের দুটি গোষ্ঠী বা স্কুলে ভাগ করেছেন। এক, তমলুক—কালিঘাট—ত্রিবেনী সামাজিক গোষ্ঠী বা স্কুল। দুই, বীরভূম—কান্দি—কাটোয়া

১. বিশদ বিবরণের জন্য "The Artisan Castes of West Bengal and Their Crafts—Sudhansu Kumar Roy"—দ্রষ্টব্য।
লোক শিল্প বলতে গ্রামীণ ও হাতে তৈরি শিল্প সামগ্রীই বোঝান হয়েছে।

২. স্বর্গত সুধাংশু কুমার রায় তার উল্লিখিত নিবন্ধে যে নটি সম্প্রদায়ের হদিস দিয়েছেন, তারা হল, (১) সূত্রধর (২) কর্মকার (৩) তন্তুবায় (৪) কুম্ভকার (৫) কাংসকার (৬) স্বর্ণকার (৭) শঙ্খকার (৮) চিত্রকর ও (৯) মালাকার।

৩. "The Artisan Castes of West Bengal and Their Crafts—S. K. Roy.

সামাজিক গোষ্ঠী। দুই গোষ্ঠীর ঘরানাও আলাদা। হাতে তৈরি কাগজের ওপর সাধারণত ছবিগুলি আঁকা হয় ওপর থেকে নিচে। কাগজ পাতলা হলে আঠা দিয়ে নিচে কাগজ জুড়ে মোটা করা হয়। প্রয়োজন মত লম্বাও করে নেওয়া হয় কাগজ জুড়ে জুড়ে। যেসব রঙ ব্যবহার করা হয় পটে, গ্রাম্য প্রথায় গাছগাছড়ার ফুল, ফল ও পাতা থেকে তা তৈরি করে নেওয়া হয়। পট ছাড়াও পোড়া মাটির নানা রঙের পুতুলও এরা তৈরি করেন। এ জেলায় সুতাহাটা থানার আকবরপুর, চৈতন্যপুর, কেশবপুর, দেউলপোতা, দাসপুর থানার বাসুদেবপুর ও নাড়াজোল, নন্দীগ্রাম থানার নানকর চক ও কুমীরমারা সুদ্দি, তমলুক থানার সিরুই পাঁশকুড়ার কেশবপুর থানার মাগুরাতে প্রধানত চিত্রকরদের বাস।

চিত্রকর ছাড়াও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সরপুর (খাঁড়পুর)-বিনপুরে ও রোহিনীতে আর এক শ্রেণীর পটুয়া আছেন। তাদের বলা হয় যাদু-পটুয়া। সাঁওতাল পরিবারে কেউ মারা গেলে মৃতের আত্মার ছবি এঁকে এবা তাতে চক্ষুদান করেন। এ ছাড়া সাঁওতাল পরিবারগুলির নানা সংস্কারও এসব পটে স্থান পায়।

কুম্ভ শব্দের অর্থ কলস। কার মানে যিনি তৈরি করেন। কলস ছাড়াও কুম্ভকারেরা মাটির আরও নানা পাত্র, খেলনা পুতুল, টেরাকোটার মূর্তি ইত্যাদিও তৈরি করেন। প্রধানত কুমোর বাড়ির মেয়েদেরই কাজ এটা। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজে হাত লাগায়। এ জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও ঘাটাল মহকুমাতেই কুম্ভকারেরা সংখ্যায় বেশী। অবশ্য কেশবপুরে চিত্রকরেরাও এই কাজ করে থাকেন।

কাঠ নিয়ে যারা কাজ করেন ও কাঠের ওপরে ছেনি বাটালি দিয়ে নতুন রূপ ফুটিয়ে তোলেন তারাই সূত্রধর নামে পরিচিত। কাঠ খোদাই, কাঠের আসবাব তৈরি, ঘরের কাঠামো বাতা, গরুর জাবনা দেবার পাত্র ইত্যাদি গ্রামের মোটা আকারের চাহিদা এরাই সাধারণত মিটিয়ে থাকেন। বাড়ি তৈরির ব্যাপারে, বিশেষত মটকার গঠন কাঁসাইয়ের পূব ও পশ্চিমদিকে যে দুই রকমের দেখা যায় সে এদেরই জন্য। তমলুক-কাঁথি ধারায় যেসব মটকা তৈরি হয় তাদের উপরিভাগ সমতল। বিশেষত দোতলা মাটির বাড়িগুলির। এ জেলায় সূত্রধরদের মূলকেন্দ্র প্রধানত দাসপুর থানায় ও পাঁশকুড়ায়।

ধাতু দিয়ে যারা জিনিষপত্র তৈরি করেন তাদের ভেতর তিনটি ভাগ।

কর্মকার বা লোহাগড়া কামার, স্বর্ণকার ও কাংসকার। চাষের কাজে যেসব দ্রব্য ব্যবহৃত হয় যেমন কোদাল, কুড়ুল, লাঙলের ফাল, দা ইত্যাদি; ঘরের কাজের জিনিষপত্র যেমন বটি, খুন্তি, জাঁতি, কড়াই ইত্যাদি; মাছধরার দ্রব্যাদি যথা কাঁটা, বড়শি, কাঠি এসব কর্মকারেরাই তৈরি করে গ্রামের প্রধান চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। মেদিনীপুর জেলায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে এদের দেখা মিললেও ঘাটাল সহরই এদের মূল কেন্দ্র। খড়ার, ঘাটাল ও তমলুকে এক সময় কাংসকারদের আধিপত্য ছিল খুব। পারিবারিক দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার ও পূজার সময় কাজে লাগে এমন বহু জিনিষ এরা তৈরি করে থাকেন। এদের ভেতর থালা বাটি খুরি ফেরো হাঁড়ি হাতা খুন্তি কলসি ডাবর ডিবা, পূজার কাজের জন্য পুষ্প পাত্র সাজি কোশাকুশি প্রদীপ পিলসুজ ঘট কুণ্ড সিংহাসন প্রধান। সোনার রূপার অলংকার তৈরি করেন স্বর্ণকারেরা। গ্রাম বাংলায় মেয়েদের সাধ আহ্লাদ ও সঞ্চয়ের মূল ধারা এদের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

এ ছাড়া আর যে দুটি ছোট শিল্পী গোষ্ঠী আছেন তারা হলেন মালাকার ও শঙ্খকার। মালাকারদের কাজ প্রধানত শোলা নিয়ে। ডাকের সাজ, ঝারা, চাঁদমালা মণ্ডপ বা রাসমঞ্চ সাজান, খেলনা, বিয়ের টোপর ইত্যাদি তৈরি করেন মালাকারেরা। সহরগুলিতেই প্রধানত এসবের চাহিদা। তাই তমলুক, মেদিনীপুর, গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা সহরে এদের কাজকর্ম ও ব্যবসা। শঙ্খকারেরা শঙ্খ বা শাঁখ থেকে নানা রকম দ্রব্য তৈরি করেন। এদের ভেতর বিবাহিত মেয়েদের হাতে পরার শাঁখা ও শঙ্খের অলংকার প্রধান। তমলুক ও কাঁথি মহকুমা ছাড়া এ জেলায় শঙ্খকারদের বেশী দেখা যায় না।

তাঁত শিল্প যাদের জাতিগত পেশা তাদের বলা হয় তন্তুবায়। তাঁত শিল্প সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। গ্রাম বাংলায় এইসব প্রাচীন শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করে ঢেলে সাজান প্রয়োজন। যে বিপুল জনসংখ্যা তাদের জাতিগত ও পুরনো রোজগারের উপায় থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন ও কৃষি অর্থনীতির ওপর ভিড় করে আছেন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নতি কখনই সম্ভব হবে না।

ভূমিস্বত্ব ও ভূমিরাজস্ব

> "The rights which now exist in land in the Lower Provinces of Bengal are nearly all of recent creation, dating from or after the Permanent Settlement."—(Field's Introduction to the Regulations Sections 32)

মেদিনীপুরে ভূমিস্বত্ব ও ভূমিরাজস্বের মোটামুটি যে বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, সময় নির্দেশ করতে গেলে মুসলমান বিজয়ের সময় থেকেই তা সুরু। এই অঞ্চল তখন ছিল উৎকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ফলে একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে উৎকলের ভূমিস্বত্ব ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা মুসলমান বিজয়ের অনেক আগে থেকেই এখানে প্রচলিত ছিল। আফগান ও পরে মোগলেরা তারই ওপর নিজেদের রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থাও এদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়।

উড়িষ্যার মাদল্ পঞ্জী অনুসারে জমিজমা ও রাজস্ব আদায়ের নিম্নতম একক ছিল গাঁ বা গ্রাম। কতকগুলি গাঁয়ের সমষ্টিকে বলা হত বিশি বা চৌর। এদের কোথাও কোথাও খণ্ড বা ভূমও বলা হত। যেমন, ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম বা এগরাচৌর, ময়নাচৌর ইত্যাদি।[১] বিশি বা খণ্ডের আয়তন পরবর্তীকালে প্রবর্তিত পরগণার আয়তনের প্রায় সমান ছিল। গ্রামে রাজস্ব আদায় ও শাসন সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকত পধান বা প্রধানের ওপর। বিশি বা খণ্ডে যে রাজ কর্মচারী থাকতেন তাকে বলা হত খণ্ডপতি। ভুঁইমাল নামে আর একজন কর্মচারী হিসাব দেখতেন। কতকগুলি বিশি বা খণ্ড নিয়ে ছিল একটি বড় বিভাগ। নাম দণ্ডপাঠ। দণ্ডপাঠের প্রধান রাজ কর্মচারীকে বলা হত দেশাধিপতি।

আফগান রাজা স্থলেমান করনানীর সময় বিজিত হয় উড়িষ্যা। তখন বাংলার সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত।[২] টোডরমল্লের রাজস্ব

১. Final Report on the Survey and Settlement Operations, Midnapore, 1918—A. K. Jameson I C. S.

২. সময় ১৫৬৮ খ্রীঃ। Ibid। ১৫৯২ খ্রীঃ এই অঞ্চল মুঘল অধিকারে আসে।

বিভাগে উড়িষ্যা পাঁচটি সরকার ও উনআশিটি মহালে বিভক্ত ছিল।[৩] নামেমাত্র অধীন ছিল সুবা বাংলার। উড়িষ্যার পাঁচটি সরকারের ভেতর সরকার জলেশ্বর ছিল অন্যতম। সরকার জলেশ্বরে ছিল মোট আঠাশটি মহাল। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই ছিল তখন সরকার জলেশ্বরের ভেতর। শুধু এখনকার ঘাটাল মহকুমার কিছুটা অংশ, চেতুয়া ও বরদা পরগণা এবং চন্দ্রকোণা ছিল মেদিনীপুরের বাইরে ও বাংলার মূল অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। মোটামুটি ভাবে সীমানা ছিল শিলাই নদী, নাড়াজোল পর্যন্ত। এর পরবর্তী অংশের সীমানা কাঁসাইয়ের উত্তর শাখা।[৪]

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে রাজস্ব ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল ঘটে। সরাসরি দিল্লী থেকে প্রেরিত একজন প্রতিনিধি আগে উড়িষ্যার শাসনকার্য দেখাশুনা করতেন। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজা যখন বাংলার শাসন কর্তা হন, উড়িষ্যা সুবা বাংলার সাথে সংযুক্ত হয়। সুবা বাংলার আয়তন ছিল তখন, বিশাল। পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে ভাগলপুর পর্যন্ত। উত্তরে হিমালয় ও কোচবিহার থেকে দক্ষিণে ঝাড়খণ্ড ও কটক পর্যন্ত।[৫]

পরবর্তীকালে যখন সুবা উড়িষ্যার সৃষ্টি হয়, তার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল মেদিনীপুর। পাঁচটি সরকার নিয়ে ছিল সুবা উড়িষ্যার আয়তন। যথা, সরকার জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গদণ্ডপাঠ বা সিয়াখোল ও রাজমহেন্দ্রী। মুর্শিদকুলি খাঁ বা জাফর খান সরকারগুলিকে পুন-নির্ধারিত করে আরও বড় ভূখণ্ডে রূপান্তরিত করেন।[৬] নাম দেন চাকলা। মহালগুলি রূপান্তরিত হয় পরগণায়। এই চাকলা ও পরগণা বিভাগ ইংরেজ আমলেও বহুদিন পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। বর্তমান জেলাগুলি মুর্শিদকুলির এই চাকলা থেকেই উদ্ভূত। তখনকার চাকলা হিজলীর প্রায় সমস্ত অংশই বর্তমান মেদিনীপুরের

---

৩. ১৫৯৪-৯৫ খ্রী: পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় ছিল। Ibid ১।
যোগেশবাবু লিখেছেন ৯৯টি মহাল (পৃ: ১৮২)। The Revision of the Boundary Commisseioners Lists—Rowland N. L. Chanda (1907)-এ ৯০টি মহাল।

৪. A. K. Jameson, I C S Ibid ১.

৫. The Revision of the Boundary Commissioners' Lists—Rowland N. L. Chanda (1907)

৬. ১৭২২ খ্রী:

অন্তর্গত।[৭] চাকলা বালেশ্বরের কিছুটা মেদিনীপুরে, কিছুটা গেছে বর্তমান বালেশ্বর জেলায়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম যখন চট্টগ্রাম ও বর্ধমানের সাথে মেদিনীপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করেন, চাকলা মেদিনীপুরের আয়তন তখন ছিল ৬,১০২ বর্গ মাইল।[৮] বর্তমান মেদিনীপুরের সাথে চাকলা মেদিনীপুরের[৯] অমিল ছিল যথেষ্ট। স্থূলভাবে বললে চাকলা বা ফৌজদারী হিজলীর ভেতরে ছিল বর্তমান তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অনেকখানি। মেদিনী-পুরের বাইরে ছিল এই অংশ। মারাঠাদের অধীন ছিল পটাশপুর, কামারডিচৌর ও ভোগরাই। বর্তমান ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা, শালবনি ও কেশপুর থানার কিছু অংশ ছিল বর্ধমানে। এদিকে বালেশ্বরের কিছু অংশ, প্রধানত সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরদিকের ভূভাগ, ধলভূম, বরাভূম, মানভূম, মানভূমের জঙ্গলমহাল, বাঁকুড়ার ছাতনা ও অম্বিকানগরের জঙ্গল মহাল ছিল মেদিনীপুরের অন্তর্গত।[১০] হিজলী ছিল নবাবের খাসদখলে। মহিষাদল ও তমলুকের কিছু অংশ ছিল হুগলীর ভেতর।

৭. চাকলা হিজলী গঠিত হয়েছিল সরকার মাল্‌ঝট, জলেশ্বর ও মুজাফি নিয়ে। মোট পরগণা ছিল ৩৫টি।—Chanda.

৮ Census 1961. District Census Hondbook, Midnapore

৯. হস্তান্তরের সময় চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল ৫৪ টি পরগণা নিয়ে। যথা, (১) কাশিজোড়া (২) কিসমৎ কাশিজোড়া (৩) সাহাপুর (৪) মেদিনীপুর (৫) সবঙ্গ (৬) খান্দার (৭) ময়নাচৌর (৮) তুরুকপুর (৯) কেদারকুণ্ড (১০) গাগনাপুর (১১) পুরুষোত্তমপুর (১২) খড়্গপুর (১৩) নাড়াজোল (১৪) মাৎকদপুর (১৫) গগনেশ্বর (১৬) জামনা (১৭) নারায়ণগড় (১৮) বলরামপুর (১৯) কিসমৎ বলরামপুর (২০) জুলকাপুর (২১) ধারেন্দা (২২) ছাতনা (২৩) পটনগর (২৪) শাপুর (২৫) মীরগোদা (২৬) ভুরকাচৌর (২৭) কুড়ুলচৌর (২৮) লাঙ্গলেশ্বর (২৯) দাঁতনচৌর (৩০) এগরাচৌর (৩১) নাপোচোর (৩২) কাকরাচৌর (৩৩) হাভেলী জলেশ্বর (৩৪) ভেলোরাচৌর (৩৫) রাজগড় (৩৬) চক্ ইসমাইলপুর (৩৭) কোশবাড়ী (৩৮) নারঙ্গাচোর (৩৯) কাকরাজিত (৪০) ফতেয়াবাদ (৪১) জলেশ্বর (৪২) অমর্শী (৪৩) ভুঞামুঠা (৪৪) প্রতাপভান (৪৫) দেবমুঠা বা দণ্ডমুঠা (৪৬) উত্তর বিহার (৪৭) চিলিয়াপুর (৪৮) বজরপুর (৪৯) বীরকুল (৫০) বালিসাই (৫১) কামার্দাচৌর (৫২) কিসমৎ কামার্দাচৌর (৫৩) মাৎকাবাদ ও (৫৪) ঔরঙ্গাবাদ (সম্ভবত সাহাবন্দর)—যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস।

১০. District Census Handbook, 1961.

ভূমি স্বত্ব ছিল সাধাসিধে। পূর্ব বাংলার মত ঘোরপ্যাচ ছিল না। মধ্যস্বত্বাধিকারী বা অ-কৃষিজীবির হাত ফেরতা হয়ে জমি যেতনা চাষীর কাছে। বেশীর ভাগ জমিদার ও তালুকদারেরা ছিলেন স্থানীয়। ফলে রায়তেরা সরাসরি তাদের কাছেই খাজনা দিতেন। যেসব বড় বড় জমিদার ছিলেন যেমন, মহিষাদল, সুজামুঠা, নয়াগ্রাম বা বর্ধমান রাজ (জমিদারী ছিল ঘাটাল মহকুমায়) সেক্ষেত্রে হয় জমিদারকেই খাজনা দিতেন অথবা যেসব জমি পত্তনি প্রথায় বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল সেখানে পত্তনিদারকে দিতেন খাজনা।

মুসলমান আমলে ছোট ছোট জমিদারী ও তালুকদারী মহালগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। হুজুরী বা স্বাধীন তালুক, মজকুরী বা পরাধীন তালুক। যেসব জমিদার সরাসরি রাজ সরকারে রাজস্ব দিতেন তারা ছিলেন হুজুরী। অন্য বড় জমিদারের মাধ্যমে যারা রাজস্ব দিতেন তারা ছিলেন মজকুরী বা শিকমি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বেশ কিছু মধ্য সত্বাধিকারী গজিয়ে ওঠে। তবু তাদের সংখ্যা ও প্রকার বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত নয়। এর একটি কারণ বোধহয় এখানে চতুর ও অকৃষিজীবি শ্রেণী সংখ্যায় বেশী ও প্রভাবশালী ছিল না। পশ্চিমের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল যখন পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য করা হয়, তখন সেখানে মধ্য সত্বাধিকারীদের গজিয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সেটা যে সম্ভব হয়নি তার প্রধান কারণ জঙ্গল সর্দারেরা নিজেরাই জঙ্গল কাটিয়ে আবাদ যোগ্য করে তুলেছিলেন। দশশালা বন্দোবস্তে তমলুক ও মহিষাদল এষ্টেটের রাজস্ব খুব উচু হারে স্থির হয়েছিল, তবু দুটি এষ্টেটই টিঁকে যায়। মাজনামুঠা ও জালামুঠা জমিদারী মালিকানা ভাতার বদলে কোম্পানীকে অর্পন করা হয়। কাশীজোড়া ও ময়নাচৌর জমিদারী ছোট ছোট তালুকে ভাগ করে বেনামদারের মাধ্যমে জমিদারেরা নিজেদের অধীনে রাখেন। ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না তা নয়। কাঁথিতে রায় রাধাশ্যাম দাস অধিকারী ও গোপীবল্লভপুরের মোহান্তদের এষ্টেটে মধ্য স্বত্বাধিকারী কম ছিলনা। গড়বেতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চল সমূহে ভূমিস্বত্ব জেলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় জটিল ছিল যথেষ্ট। এর অন্যতম কারণ আয়মাদারেরা নিজেরা জমি দেখাশুনা করতেন না। উকিল, এ্যাডভোকেট, কেরানী, ঋণদানকারী মহাজন এরাই ছিলেন জমির মালিক।

দাঁতন ও ঘাটাল অঞ্চলে আর একটি প্রবণতা ছিল। ছোট ছোট ভূস্বামীরা জমি থেকে পারিবারিক ভরণপোষণে অপারগ হয়ে অপরের সাথে উপ স্বত্বে বন্দোবস্ত করতেন ও জীবিকার জন্য অন্য পেশায় নিয়োজিত হতেন।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন চালু হবার আগে যেসব রাজস্ব প্রদানকারী মহাল এ জেলায় বর্তমান ছিল তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, পুরনো জমিদারী। কালেকটরেটের রেকর্ড অনুসারে তাদের সংখ্যা ছিল উনত্রিশটি। দুই, তালুকদারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যাদের জমিদারী বলে গণ্য করা হয়। তিন, অন্যান্য মহাল।

প্রচলিত স্বত্বগুলির বেশীর ভাগ সৃষ্টি হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। মোগল আমলে জমিদাররা নিজেদের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বিনা রাজস্বে যেসব জমি ভোগ করতেন তাদের বলা হত নানকার মহাল। মেদিনীপুরে এ ধরণের দুটি মহাল ছিল। একটি মেদিনীপুরেই নানকার বল্লভপুর, অপরটি মাজনামুঠা। এছাড়া আর একটি মহাল ছিল পটাশপুরে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রথম দুটি মহালের ওপর রাজস্ব ধার্য হয়। অস্থায়ীভাবে হয় পটাশপুর।

এ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কাঁথি ও তমলুক মহকুমার ভেতর কিছু অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কোম্পানী আমলের বহু আগে থেকেই মলাঙ্গীরা এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে লবণ সংগ্রহ করতেন। এসব জমিকে বলা হত খালাড়ী। খালাড়ী থেকে সংগৃহীত লবণ দেশী প্রথায় পরিস্রুত করে নেওয়া হত। জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হত এ জন্য। জালপাই জঙ্গল ছিল এই জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্র। জালপাই জমির জন্য খাজনা দিতে হত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবণ ব্যবসা একচেটিয়া করে নেবার পর সাবেক জমিদারদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা হয়। এই ভাতার নাম ছিল মুশাহারা।

মুসলমানদের ভেতর জ্ঞানী গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের বিনা খাজনায় বা কম কুইট রেণ্টে জমি ভোগ করতে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একে বলা হত আয়মা। মেদিনীপুরে বলরামপুর জমিদারীতেই এ ধরনের আয়মার প্রচলন ছিল। তবে প্রধানত দেওয়া হয়েছিল জঙ্গল কেটে কৃষিযোগ্য করার জন্য। জঙ্গল কেটে কৃষিযোগ্য করার জন্য এক ধরনের খাজনা চালু ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে। তাকে বলা হত কমদরা। প্রচলিত খাজনার চেয়ে কম ছিল এই খাজনার হার। পঞ্চকী ছিল এ ধরণের আর এক জাতীয় খাজনা।

পাটনি বা পত্তনি তালুক প্রধানত প্রচলিত ছিল বর্ধমান রাজের জমিদারী এলাকায়। যারা এই পত্তনি নিতেন তাদের বলা হত পত্তনিদার। পত্তনিদার আবার উপস্বত্বে এই জমি ইজারা দিতে পারতেন। যারা নিতেন তাদের বলা

হত দর পত্তনিদার। দর পত্তনিদার যে ইজারা দিতেন তাকে বলা হত সেপত্তনি।

স্থায়ী খাজনায় কৃষি জমির যে ইজারা দেওয়া হত তাকে বলত ইস্তমারি তালুক। মধ্য স্বত্বভোগী যে কোন বন্দোবস্তকে স্থূলভাবে ইজারা বলা হয়। ইজারাদার যে উপ স্বত্বভোগীর সৃষ্টি করতেন তাকে বলা হত দর ইজারাদার। আগাম টাকা নিয়ে যে অস্থায়ী ইজারা দেওয়া হত তাকে বলত ইজারা জারপেশগি। বকেয়া খাজনার ইজারার নাম ছিল কঠিন ইজারা।

জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরি উৎসাহিত করতে এ জেলায় এক বিশিষ্ট প্রথা গড়ে ওঠে। নাম মণ্ডলী প্রথা। এই প্রথাটি এ জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জমিদারেরা এককালীন কিছু অর্থের বিনিময়ে রায়তদের জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরি করতে অনুমতি দিতেন। আবাদকারেরা কৃষিযোগ্য করতেন জমি, জনবসতি স্থাপন করতেন, সাধারণত নিজেদের নামে বা ইচ্ছানুযায়ী নাম দিতেন গ্রামগুলির। এ কাজে মুখ্য ব্যক্তি মণ্ডল নামে পরিচিত হতেন। পরবর্তীকালে জমিদার ও মণ্ডলদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী এই সব অঞ্চলে উপ-স্বত্বভোগী বসাতেন।

এ ছাড়া এ জেলায় নানা ধরনের রাজস্বহীন বা নিষ্কর জমি বা মহাল ছিল। প্রধানত এদের বলা হত বাহালী লাখেরাজ বা লাখেরাজ। যে সব বাহালী লাখেরাজ ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে উৎসর্গীকৃত ছিল তাদের উদ্দেশ্য ও রকম অনুযায়ী নাম ছিল দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ওয়াকৃফ ইত্যাদি।

এ ছাড়া আর যেসব নিষ্কর জমি ছিল তাদের ভেতর বৈষ্ণবোত্তর যা বৈষ্ণব ভক্তদের দেওয়া হত, মহাত্রাণ সম্মানীয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট, বাস্তু ভিটের জন্য খুশবাশ, চারণ বা ভাটদের জন্য ভাটোত্তর, গণকদের জন্য গণকোত্তর ও সংসার ত্যাগীদের জন্য সন্ন্যাসোত্তর প্রধানত উল্লেখ্য।

রাজা ও জমিদারদের অধীন কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ মাহিনার বদলে সম্পূর্ণ নিষ্কর বা সামান্য রাজস্বের বিনিময়ে ভূমি বা জায়গীর ভোগ করতেন। এদের ভেতর পাইকান জায়গীর, পাটোয়ারী জায়গীর, দপ্তরী জায়গীর ও মাদুর জায়গীর[১১] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ব্যতীত

১১, নবাব আলীবর্দী ১৭৩৪ খ্রী: কুড়া, সবং ও কুয় চৌধুরীকে যে সনদ দেন তাতে বলা ছিল নবাবের কাছারিতে যত মাদুর দরকার হবে সব তারাই যোগান দেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাদুর তৈরর জন্য বিখ্যাত ছিল মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চল

বেহারা জায়গীর, নাপিত জায়গীর, কুমার জায়গীর, কামার জায়গীর, মালাকার জায়গীর ইত্যাদিও ছিল। নাম শুনেই বোঝা যায় কি কি কাজের জন্য এইসব জায়গীর প্রদান করা হত।

পাইকান জায়গীর[১২] ইংরেজ আমলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। কারণ একে কেন্দ্র করেই চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহের সূত্রপাত। পাইকরা ছিলেন জমিদার বা রাজার অনিয়মিত সীমান্ত রক্ষী ও সেনাবাহিনী। বহিরাক্রমণ রোধ ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাদের। এই জন্যেই পাইকান জমি ভোগ করতেন। ইংরেজ আমলে এই অধিকার খর্ব হলে তারা বিদ্রোহ করেন।

পেয়াদা জায়গীর মেদিনীপুর কালেকটরীর বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলমান আমলে মেদিনীপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা আমলী, চোবদারের কাজ করার জন্য কয়েকজনকে নিষ্কর জমি ভোগ করার সনদ দিয়ে যান। কোম্পানীর আমলে ইয়ং সাহেব সেই ব্যবস্থা কায়েম রাখেন ও চোবদার বা পেয়াদাদের কালেকটরের অধীন করেন। পরবর্তীকালে এই প্রথা বাজেয়াপ্ত করেন বোর্ড অব রেভেনিউ[১৩]।

জমিদার, লাখিরাজদার, মধ্য স্বত্বাধিকারী ও জায়গীরদার ছাড়াও স্থিতিবান, দখল স্বত্ব বিশিষ্ট, দখল স্বত্বশূন্য, খোদকস্ত, পাইকস্ত, কোর্ফা, দরকোর্ফা, ভাগ, সাজা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রায়ত ছিলেন।

স্বাধীনতার পরে ভূমি বিষয়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন[১৪] পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও ভূমি সংস্কার আইন। প্রথম আইনে মধ্য স্বত্বাধি-

নবাবী আমল থেকে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। বাজস্বও দেওয়া হত মাদুরে বিশেষত কণকপুর মহালের। মাদুরের বাজার দাম অনুসারে মাদুরের সংখ্যার হেরফের হত।

১২. পাইকান জায়গীরের সাধারণত পরিমাণ থাকত ২ থেকে ১৩ একর। ১৭৯৬ সালের এক হিসাবে দেখা যায় এ জেলায় পাইকান জমির মোট পরিমাণ ছিল ৫৩,৩৫০ একর।

১৩. আমলী সনদ দেন ১০৯৫ সালে। ইয়ং বহাল রাখেন ১৭৮৫ সালে। বাজেয়াপ্ত হয় ১৮৪২ সালে। মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৩৮ একর। অবস্থিতি কুজাপুর ও মেদিনীপুর পরগণায়।

১৪. West Bengal Estate Acquisition Act, 1953. (Act 1 of 1954) West Bengal Land Reforms Act, 1955

কারীদের জমির ওপর যাবতীয় স্বত্ব যথা, মধ্যস্বত্ব, অন্তর্ভূমি স্বত্ব, সৈরতী স্বত্ব অর্থাৎ হাট-বাজার ফেরী ইত্যাদির স্বত্ব, উদ্বৃত্ত খাস জমির স্বত্ব, বনের স্বত্ব প্রভৃতি পয়লা বৈশাখ বাংলা ১৩৬২ সন (ইং ১৫ ৪.১৯৫৫) থেকে সরকারে বর্তায়। ফলে ভূমির ওপর পুরনো স্বত্বগুলি বাতিল হওয়ায় অনেক সহজ ও সরলীকৃত হয়ে আসে ভূমি ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রায়ত ও প্রকৃত চাষীর ভেতর ভূমি সংক্রান্ত সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করা ও চাষী সে আধি, ভাগ বা বর্গাদার যাই হোক না কেন তার স্বার্থ সুরক্ষিত করা। আইন দুটি যথাযথ ও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হলে ভূমি বিষয়ক অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

ভূমি স্বত্ব ও রাজস্বের সাথে যে কাজটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে তা সার্ভে বা জরিপ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতই এ জেলায় সার্ভে সুরু হয় জেমস রেনেলের সময়[১৫]। এই জরিপের ভিত্তিতে ম্যাপও তৈরি হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে টিকেল সাহেব এ জেলার একটি মানচিত্র তৈরি করেন। তবে তা ছিল আংশিক। প্রথম রাজস্ব জরিপ হয় তার পরে[১৬]। রাজস্ব জরিপ বা রেভেনিউ সার্ভের আগে থাক্ সার্ভে[১৭] করিয়ে নেওয়া হত। থাক্ সার্ভের একক থাকত মহাল, রাজস্ব সার্ভের মৌজা বা গ্রাম। রাজস্ব সার্ভের মূল উদ্দেশ্য ছিল জালপাই জমির সীমানা নির্ধারণ। থাক সার্ভে থেকে প্রিজমিটিক কম্পাসের সাহায্যে তৈরি হত মানচিত্র। তাতে স্কেল থাকত চার ইঞ্চি থেকে চব্বিশ ইঞ্চি পর্যন্ত এক মাইল। এই জরিপের সময় জমির যে বিবরণ লেখা হয়েছিল তাকে বলে রোয়েদাদ।

পটাশপুরের অস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন আবার বন্দোবস্তের জন্য নেওয়া হয়, তখন সেখানে প্রথম সুরু হয় কাডাস্ট্রাল সার্ভে। জেলায় ব্যাপকভাবে এই সার্ভে হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে[১৮]। প্রকৃতপক্ষে সেটেলমেণ্ট্ দপ্তরে যে সব মানচিত্রের নক্সা এখনও চালু তা এই সার্ভের ভিত্তিতে প্রস্তুত। সাধারণত

১৫. ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত। করেন, মিঃ কার্টার, ডগলাস, কল, পোর্টস্ মাউথ, মার্টিন, রিচার্ডস ও রেনেল স্বয়ং।

১৬. ১৮৩৮-১৮৪৪ সালে। পরে রাজস্ব জরিপ হয় ১৮৭০-৭৫ সালে।

১৭ এই জরিপে মহালের সীমানা নির্দিষ্ট করার জন্য মাটির স্তূপ বা থাক দিয়ে চিহ্নিত করা হত। সেজন্য একে থাক সার্ভে বলে।

১৮. পটাশপুরে সার্ভে শুরু হয় ১৮৯২-৯৩ সালে। জেলায় ১৯১০-১১ সালে।

কাডাস্ট্রাল ম্যাপ থেকে জেন্টাগ্রাফ মেশিনের সাহায্যে প্রতিটি থানার দুই রকম ম্যাপ তৈরি করা হয়। একটি চার ইঞ্চির সমান এক মাইল অপরটি এক ইঞ্চির সমান এক মাইল। শেষের ম্যাপকে ইনডেক্স ম্যাপ অব জুরিসডিক্শন লিষ্ট অব পুলিশ স্টেশন বলে। প্রথমোক্ত ম্যাপে মৌজার সীমানা, রাস্তা, রেল লাইন, নদী, বসতি, জঙ্গল, পোষ্ট অফিস, থানার অবস্থান, হাট বাজার ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলি দেখান থাকে।

নিখুঁত ও ব্যাপক জরিপ যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে ভূমি সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

—

॥ আধুনিক মেদিনীপুর ॥ [১]

"Bankura and Midnapore districts in South-West Bengal with Manbhum and Dhalbhum areas adjoinding them, form the outer projections of the Bengal plains."—Memorandum (Supplement) before States Reorganisation Commission (1954)

মীরকাশিম যখন আরো দুটি চাকলার সাথে মেদিনীপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তরিত করেন তখন থেকেই আধুনিক মেদিনীপুরের সূত্রপাত। সে সময় এই ভূখণ্ডের অনেকখানি অংশ ছিল জঙ্গলে ঢাকা। পথঘাট যাতায়াতের ব্যবস্থা একেবারে যে ছিল না তা নয়। তবে আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। শহরাঞ্চল একেবারে অনুপস্থিত। সমৃদ্ধ স্থান বলতে ছিল বড় বড় গ্রাম। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল রাজা জমিদার ও ও তালুকদারদের ওপর। নিজের নিজের এলাকায় এ বিষয়ে তারা ছিলেন সর্বেসর্বা। সামন্ততন্ত্রের নড়বড়ে কাঠামোটি তখনও পর্যন্ত কোন মতে টিঁকে ছিল।

প্রবল ব্রিটিশ তরঙ্গ এ জেলার ওপর আছড়ে পড়তেই সামন্ততন্ত্রের নড়বড়ে কাঠামোটি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। শুধু জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলির উপজাতি সর্দারেরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাদের সাথে ব্রিটিশ শক্তির যে পাঞ্জাকষা চলে সে ইতিহাস এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত মর্যাদার সাথে লিপিবদ্ধ হয়নি।

১৮০১ সালে ভারতের তখনকার গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলী দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে জানবার জন্যে বড় বড় জেলার প্রধানদের কাছে চল্লিশটি প্রশ্ন করে পাঠান[২]। মেদিনীপুরে প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন এইচ. স্ট্রেচী। এ জেলার তৎকালীন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে কি অবস্থা ছিল উত্তরগুলি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

১. আধুনিক শব্দটি বিভ্রান্তিকর। শব্দটি কোন সময় বা অবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে না। এখানে 'আধুনিক' শব্দটি এ জেলায় সহরে সুযোগ সুবিধা কতখানি প্রসারিত হয়েছে, সেদিকেই ইংগিত করেছে।

২. Fifth Report, Firminger VOL—II.

স্ট্রেচী বলেছেন উনিশ শতকের গোড়ায় এ জেলায় জনসংখ্যা ছিল পনের লক্ষ। এর ছয়ভাগ হিন্দু একভাগ মুসলমান[৩]। বেশীরভাগ লোক অল্পেতেই তুষ্ট। বছরে ছয়মাস খেটে রায়তেরা অক্লেশে ষোল বিঘা জমি আবাদ করতে পারতেন। যে ফসল হত খাজনা দিয়ে চার পাঁচ জনের সংসার চলে যেত সাদামাঠা ভাবে। মেদিনীপুরে তখন ইমারত বলতে তেমন কিছু ছিল না। অর্থসঙ্গতি হলে পাকা বাড়ি বা মন্দির না বানিয়ে লোকে পুকুর কাটতেন। মনে করতেন পুণ্যের কাজ এটাই। এ জন্যেই জেলার নানা জায়গায় বড় বড় পুকুর দেখা যায়।

জনসংখ্যার চাপে ক্রমশ জঙ্গল কেটে তৈরি হতে স্বরু করে আবাদ। অত্যাচার, জুলুম, নৃশংসতা এসব তখন বেশী ছিল না। ইংরেজ আমলে জাল, জুয়াচুরির সংখ্যা বাড়ে। মদ খাওয়া, বেশ্যাবৃত্তি কম ছিল তবে তার প্রবণতা বেশী করে দেখা দিয়েছিল। জেলার বেশীরভাগ মানুষ আগেকার সরলতা ও নিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্বই ছিল এই গুণগুলি। সকল শ্রেণীর লোকেরাই ইংরেজদের অবিশ্বাস করতেন। তবে এই অবিশ্বাস উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত হয়ে বিদ্রোহের আকার ধারণ করেছে কদাচিত।

বর্তমান মেদিনীপুর পাঁচটি প্রশাসনিক মহকুমায় বিভক্ত। মেদিনীপুর সদর, তমলুক, ঘাটাল, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম। মেদিনীপুর সদর মহকুমার আয়তন এত বড় যে তদারকির জন্য দুটি উপভাগে ভাগ করতে হয়েছে। সদর উত্তর মহকুমা ও সদর দক্ষিণ মহকুমা। দুটি মহকুমারই কার্যালয় মেদিনীপুর সহরে অবস্থিত।

তমলুক মহকুমার এলাকাধীন অঞ্চলেই গড়ে উঠছে হলদিয়া নগরী। এখানে প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য একজন অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। কার্যালয় হলদিয়াতেই। তমলুক, কাঁথি ও ঘাটাল মহকুমা তিনটির কাজকর্ম তদারকি করেন তমলুকের অতিরিক্ত জেলা শাসক। তার দপ্তর তমলুকে।

সাংবাদিক শ্রীঅসীম রায় লিখেছেন, "The town (Midnapore) has perhaps the largest concentration of Muslim population among the district towns More muslims work in the District Collectorate than members of any other Community"। উল্লিখিত দুটি মন্তব্যই সম্পূর্ণ ভুল। ১৮৭২ সালে প্রথম লোকগণনায় হিন্দু ছিল মেদিনীপুর থানায় ১৪৮,৮৬৭ মুসলমান ১৯,৬৪৬, ১৯১১ সালে মেদিনীপুর সহরে হিন্দু ছিল ২৬,০৯১ মুসলমান ৬,৫৭২

১৮৭২ সালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম যে লোকগণনা বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়, সে রিপোর্টে দেখা যায় তখন মহকুমা ছিল চারটি। সদর, তমলুক, কাঁথি ও গড়বেতা[৪]। ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম নামে কোন মহকুমা ছিল না। ঘাটাল থানা ছিল গড়বেতা মহকুমায় ও ঝাড়গ্রাম থানা ছিল সদর মহকুমায়। চারটি মহকুমা মিলে থানা ছিল মোট পঁচিশটি। এখন উনচল্লিশটি। সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা বা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকের অস্তিত্ব ছিল না তখন। এখন ব্লকের সংখ্যা এ জেলায় বাহান্নটি। সহরাঞ্চল বলতে ছিল মেদিনীপুর, তমলুক, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল[৫]। বর্তমানে সহরাঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনিশটি[৬]। এদের ভেতর নটি মিউনিসিপাল সহর। বাকি দশটি পৌর সংস্থা বিহীন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর সাত বছর কোম্পানী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত তেমন রদবদল করেন নি। প্রতি জেলায় একজনের বেশী ইউরোপীয় অফিসার দেওয়াও তখন সম্ভব ছিল না। দরকারও ছিল না। তিনি শুধু কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখতেন। মেদিনীপুরে জমিদারদের কাছে তিনিই ছিলেন কোম্পানীর প্রতিনিধি। ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালতের কাযকলাপ তদারকি করাও ছিল তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তাকে বলা হত কর্মাসিয়াল রেসিডেণ্ট।

মাঝে কিছু কালের জন্য বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল থেকে সরাসরি পরিচালিত হতে থাকে এ জেলার প্রশাসন। ১৭৭৭ সালে সৃষ্টি হয় কালেকটরের পদ। জন পিয়ার্স এ জেলার প্রথম কালেকটর[৭]। মেদিনীপুর ছাড়া জলেশ্বর ও

(ও হ্যাপি]; ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে মাত্র দশ শতাংশের কিছু বেশী মুসলমান। এখনও তাই। কালেক্টরেটে মুসলমান কর্মীর সংখ্যা কখনও চল্লিশ শতাংশের বেশী ছিল না। শ্রীঅসীম রায়ের নিবন্ধটি 'The Statesman' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হয় 'মেদিনীপুর প্রদর্শনী ও মেলা (৭৬)' স্মারক গ্রন্থে।

৪. Report on the Census of Bengal, 1872—H Beverley,
এর আগে (১৮৪৫) ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা যখন হুগলী জেলার ভেতরে ছিল, এই দুটি ও হুগলী জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল ক্ষীরপাই মহকুমা। এটি হুগলী জেলারই একটি মহকুমা ছিল।

৫ লোকসংখ্যা ছিল মেদিনীপুরে ৩১,৪৯১ তমলুকে ৫,৮৪৯ চন্দ্রকোণায় ২১,৩১১ ঘাটালে ১৫,৪৯২। Ibid ৪।

৬. Census of India, 1971 ; Series 22, West Bengal. Part II—A

৭. বর্ধমান প্রভি-কাউন্সিল থেকে প্রশাসন পরিচালিত হত ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৭ পর্যন্ত।

ছিল তার এলাকাধীন। কালেকটরের মূল কাজ তখন ছিল রাজস্ব আদায় করা পরবর্তীকালে বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল উঠে গেলে তার সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয় কলকাতার কমিটি অব রেভেনিউতে।[৮]

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর এ জেলার প্রধান সহর বলে ঘোষিত হয়। জেলার প্রধান কার্যালয় বরাবরই ছিল এখানে। জেলার হেড কোয়াটার্স হিসাবে ক্রমশ এই সহরের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। জনবসতিও বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মেদিনীপুর জেলা ও সহর গড়ে তুলেছে ইংরাজেরা। রূঢ় হলেও একথা সত্য। বড় বাজার নামে ব্যবসা বাণিজ্যের যে বড় কেন্দ্র মেদিনীপুর সহরে অবস্থিত, সেটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৭৬৩ সালে। দুর্গ তৈরি করে ইংরাজেরা। বার্ডেট ছিলেন রেসিডেন্ট। কয়েক বছর পরে এক রেজিমেণ্ট সিপাহি বা সৈন্য এখানে মোতায়েন করা হয়। ফলে গড়ে ওঠে সিপাহি-বাজার। ছোট বাজার যা বিবি বাজার নামেও পরিচিত, গড়ে উঠেছিল ১৭৬৬ সালে। রেসিডেন্ট ছিলেন গ্রাহাম। মিসেস গ্রাহামের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য নাম হয় বিবি বাজার। ভ্যানসিটার্ট পত্তন করেছিলেন পাটনা বাজার (১৭৬৮)। কর্নেল গোলা, করপোরাল বাজার, কেরাণিটোলা নামগুলিও ইংরাজ শাসনের স্মৃতিবহ[৯]। মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়েছিল কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের একশো বছর পরে। যদিও আইন-ই-আকবরীতে সরকার জলেশ্বরের ভেতর মেদিনীপুর একটি বড় জায়গা বলে উল্লিখিত আছে, সম্ভবত তখন এর চেহারা ছিল গঞ্জের মত।

মেদিনীপুর সহরটিকে এক কল্পিত রেখায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। পূব ও পশ্চিম। ভাগ দুটি নিয়ে পৌর সহরের মোট এলাকা সাড়ে দশ বর্গ কিলো-মিটারের কাছাকাছি। পশ্চিমদিকে মাটির রঙ লাল, প্রকৃতি পাথুরে। এদিকেই প্রধানত বড় বড় সরকারী অফিস। কালেকটরেট, জেল, হাসপাতাল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারদের কার্যালয়, পুলিস সুপারের অফিস। রেল স্টেশন

পিয়াসের বেতন ছিল বারো শো সিক্কা টাকা। বাড়ি ভাড়া পেতেন তিনশো সিক্কা টাকা।—J. C. Price-Notes on the History of Midnapore.

উঠে যায় ১৭৮১ সালে। কমিটির এখনকার নাম বোর্ড অব রেভনিউ।

Final Report on the Survey and Settlement Operations—A. K. Jameson.

দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রান্ত সীমা। পূর্ব দিকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রগুলি। বাজার থানা, টাউন স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন ও পুরনো বসতি। ফলে এদিকটা ঘিঞ্জি বেশী। কাঁচা নর্দমা, কুঁড়ে ও পাকা বাড়ি, সরু পথ ও গলি। সহরটি প্রাচীন হলেও দর্শনীয় পুরনো ইমারত ও সৌধ সংখ্যায় খুবই কম। হাল আমলে তৈরি মীরবাজারে মল্লিকদের প্রাসাদটি সুন্দর। ভেতরে যে রাসমঞ্চ আছে সেখানে প্রতি বছর রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহরে যে জোড়া মসজিদটি আছে সেটি চারশো বছরের পুরনো বলে কথিত। আওরঙ্গজেব উড়িষ্যা যাবার পথে নাকি এখানে রাত্রি যাপন করেছিলেন। প্রতি বছর উরস উৎসবের সময় ভারতের নানা জায়গা থেকে মুসলমান ধর্মার্থীরা এখানে আসেন ও উৎসবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ থেকেও আসেন যাত্রীরা।

জনসংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় সহরের সাবেক চৌহদ্দির ফাঁকা জায়গাগুলিতে ক্রমশ টান পড়ছে। যেখানে যেখানে পরিত্যক্ত খোলা মাঠ ছিল, নিত্য নতুন বসত বাড়ির সৌষ্ঠবে চেহারা পালটাচ্ছে। এদিক থেকে স্টেশনের কাছাকাছি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটি চোখে পড়ার মত। সম্প্রতি সহরের চেহারাও বদলেছে অনেক। বড় বড় রাস্তাগুলি কিছুটা চওড়া হয়েছে। যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য কেকোনা বা গোলাকার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে রাস্তার বাঁকগুলিতে। জেলা শাসকের অফিসের কাছাকাছি তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যাণ্ড। স্থাপিত হয়েছে অরবিন্দ স্টেডিয়াম। ছোটদের জন্য পার্কও তৈরি হয়েছে একটি। এ ছাড়া সুইমিং পুল ও এ জাতীয় আরো অনেকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে[১০]।

খড়্গপুর এ জেলার ভেতর সবচেয়ে বড় সহর। উনিশশো একষট্টি সালে লোক গণনার সময় রাজ্য সরকার এটিকে নগর হিসাবে চিহ্নিত করেন। প্রকৃতপক্ষে চারটি সহর নিয়ে এই নগরের ব্যাপ্তি[১১]। খড়্গপুর রেলওয়ে

১০. এ জন্যে শ্রীদীপক ঘোষ, আই. এ. এস জেলা শাসক (১৯৭৩—৭৬) মেদিনীপুর সহরের অধিবাসীদের কাছে ধন্যবাদার্হ।

১১. খড়্গপুর নগর এলাকা ৩৩·৩৮ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১,৬১,৩৫৭। সহর চারটি ; খড়্গপুর রেলওয়ে সেটেলমেণ্ট, লোক সংখ্যা ৭২,৪৩৫ খড়্গপুর পৌর সহর, লোকসংখ্যা ৬১,৭৮৩ পৌর এলাকার বাইরে সহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ১৮,৭১৮ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি এলাকা, লোকসংখ্যা ৭,৩২১ —Census of India 1971 ; West Bengal Series 22 Part II—A.

সেটেলমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি এলাকা, খড়্গপুর পৌরসহর ও পৌর এলাকার বহির্ভূত সহরাঞ্চল। উনিশ শতকের সুরুতে যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে খড়্গপুরের পত্তন হয়, তখন থেকেই খড়্গপুর সহর গড়ে ওঠার সূচনা। হলদিয়া যেমন এখন গ্রামীণ পরিবেশের ওপর ধীরে ধীরে সহরের রূপ নিতে সুরু করেছে, খড়্গপুরও তেমনি ধূ ধূ ডাঙ্গা ও গ্রাম্য পরিবেশে যাত্রা সুরু করেছিল। জীবিকার তাগিদে ভারতের নানা রাজ্যের অধিবাসীরা এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। ফলে ভাষা ও রুচি, চাহিদা ও সংস্কৃতি, জীবনধারা ও বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জওহরলাল নেহরুর ভাষায় যাকে বলা চলে 'মিনিয়েচার' ইণ্ডিয়া।

স্বাধীনতা লাভের পর কারিগরী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের প্রথম প্রতিষ্ঠানটি এখানে স্থাপিত হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে তাকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল উপসহর। রেলপথ ও জাতীয় সড়ক হাতের গোড়ায় থাকায় এখানে রুজি-রোজগার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বেশী। জনসংখ্যাও তাই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। দশ বছর আগেও খড়্গপুরের যে ছাড়া ছাড়া পরিচ্ছন্ন-ভাব ছিল, এখন তা অনেকখানি বিলুপ্ত। রেলের উপনিবেশ চতুর্দিকে জন-বসতির চাপে বন্দী হয়ে পড়েছে। গা ঝাড়া দিয়ে বেড়ে ওঠার জায়গা নেই বললেই চলে। ইনষ্টিটিউটের সহরটি এখনও পরিচ্ছন্ন। রাস্তা চওড়া, জল নিকাশের ব্যবস্থা ভাল, এলোমেলোভাবে বাড়ি তোলার প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে কম। নাগরিক সুযোগ সুবিধার দিক থেকে এই সহরটি প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ।

রেলওয়ে ওয়ার্কশপের অনেক কর্মী অবসর নেবার পর খড়্গপুরেই বাড়ি তুলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। সাধারণত তারা বেছে নেন পৌর এলাকার দিকটা। পৌর সহরের রাস্তাঘাট, জল নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। ফলে বর্ষার সময় দুর্ভোগ ভুগতে হয় সবাইকে। সম্প্রতি পৌর সংস্থা মাষ্টার প্ল্যান বা বড় পরিকল্পনার মাধ্যমে সহরটি ঢেলে সাজাবার কথা ভাবছেন।

জাতীয় সড়ক বম্বে হাইওয়ে তৈরি হবার পর খড়্গপুর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় সড়কের দুপাশে, খড়্গপুরেরই কাছাকাছি নিমপুরায়, একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। এর পরিকল্পনা ও বিন্যাসের দায়িত্ব ওয়েষ্ট বেঙ্গল

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভঃ করপোরেশনের। এটি রূপায়িত হলে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে খড়্গপুর হবে দ্বিতীয় কলকাতা।

কংসাবতীর ওপর সেতুটি চালু হবার পর মেদিনীপুর ও খড়্গপুর সহর দুটির ভেতর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দুই সহর হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের মত দুটি যমজ সহরে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

সদর দক্ষিণ মহকুমার কার্যালয় মেদিনীপুর থেকে উঠিয়ে খড়্গপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব দীর্ঘকাল ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বহুবার এটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এই স্থানান্তর প্রশাসনিক প্রয়োজনে এখন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

মেদিনীপুর সহর থেকে বত্রিশ মাইল উত্তরে গড়বেতা, সদর উত্তর মহকুমার একটি পুরনো সহর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন গড়বেতা মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল তখন থানার সংখ্যা ছিল তিনটি। গড়বেতা, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল। মহকুমার সদর কার্যালয় গড়বেতাতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন বগড়ী রাজাদের রাজধানী এই স্থানটি জেলার ভেতর স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির অন্যতম। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির ও বড় বড় পুকুরগুলি এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এখনও স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি গঠনশৈলী ও প্রাচীনত্বে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাজা গজপতি সিং-এর নির্মাতা বলে কথিত। কংসেশ্বর বা কামেশ্বর শিবের মন্দিরটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। রাধাবল্লভের মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১৬৯৭ সালে। দুর্জন সিং মল্লের রাজত্বকালে। সহর হিসাবে গড়বেতা বর্দ্ধিষ্ণু। জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এখানে পৌর সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গড়বেতা রেল স্টেশন ঘিরে যে জনবসতি সহরাঞ্চলের চেহারা নিয়েছে তার নাম আমলাগোড়া। গড়বেতা সহর এখান থেকে প্রায় চার মাইল। কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে আলু ও ধানের যথেষ্ট উৎপাদনের ফলে আগে থেকেই এখানে এইসব দ্রব্য বেচাকেনার একটি বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারিত হবার পর অনেকগুলি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘরও এখানে স্থাপিত হয়েছে। রাইস মিলও আছে কয়েকটি। সম্প্রতি ছোট আকারের একটি তেলকলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব মিলিয়ে ও পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আনুকূল্যের ফলে আমলাগোড়া জমজমাট হয়ে উঠেছে। সহরাঞ্চলের

মোট এলাকা ১০.৭০ বর্গ কিলোমিটার। সদর উত্তর মহকুমার অন্তর্গত গড়বেতা থানার ভেতরেই এর চৌহদ্দি।

সদর উত্তর মহকুমার অন্তর্গত আর একটি সাম্প্রতিক সহর বালিচক। বরাবরই এটি ছিল ধান-চালের বড আডত ও বাজার। একদিকে বালিচক রেল স্টেশন অন্যদিকে বম্বে হাইওয়ে বা জাতীয় সডক। এর মধ্যবর্তী এলাকা ৪.৬৬ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই সহরের বিস্তার। এখানে চালকলও আছে কয়েকটি। ডেবরা থানার সীমানার ভেতরেই বালিচক অবস্থিত।

এ জেলার পৌর সহরগুলির ভেতর তমলুক প্রাচীনতম। তার আগেই অবশ্য তমলুক মহকুমার সৃষ্টি হয়েছিল[১২]। তখন থানা ছিল পাঁচটি। তমলুক, পাঁশকুড়া, মসলন্দপুর[১৩], সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম। বর্তমানে থানার সংখ্যা আটটি। মসলন্দপুর নামে এখন কোন থানা নেই। মহিষাদল থানার ভেতর একটি গ্রাম মাত্র। এই মহকুমার ভেতরেই হলদিয়া নগরী গড়ে উঠছে। জনসংখ্যার দিক থেকে এই মহকুমা বর্দ্ধিষ্ণু।

তমলুক সহরেই তমলুক মহকুমার সদর কার্যালয় অবস্থিত। তাছাড়া মহকুমা সহরের প্রয়োজনীয় অফিসগুলি যথা, থানা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস জেল, ব্যাঙ্ক সবই এখানে আছে। এই সহরে বর্গভীমার মন্দিরটি উল্লেখ্য। যেমন প্রাচীন তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাচীন সহরগুলির মত তমলুকও পরিকল্পিত সহর নয়। রাস্তা সঙ্কীর্ণ, বাড়িগুলির গঠন ও বিন্যাস এলোমেলো, ঘিঞ্জি। জল নিকাশের ব্যবস্থাও সুষ্ঠু বলা চলে না। পনের বছর আগেও তমলুক সহর ছাড়া এই মহকুমায় সহরাঞ্চল বলতে আর কোন জায়গা ছিল না। এখন আরও তিনটি সহরাঞ্চল গড়ে উঠেছে। মহিষাদল, কোলাঘাট ও হলদিয়া[১৪]।

---

১২. তমলুক মহকুমা সৃষ্টি হয়েছিল নভেম্বর ১৮৫১ সালে। মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৪ সালে।

১৩. A Statisical Account of Bengal, Vol--III W. W. Hunter.

কৌতুকের বিষয় District Census Handbook, Midnapore বইয়ের ১৯৬১ সালের সংকলনেও মসলন্দপুরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে মসলন্দপুর থানার একটি গ্রাম হিসাবে।

১৪. ১৯৬১ সালের জেলা সেনসাস হ্যাণ্ড বুকে মহিষাদল সহর হিসাবে স্বীকৃত। তখন এলাকা ছিল ৩.৬৮ বর্গ কিলোমিটার। '৭১ সালে ৬.২২ বর্গ কি. মি.। কোলাঘাট ও হলদিয়া সহরাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত হয় ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানে। এলাকা যথাক্রমে ৬.৩৭ ও ২১.৫৯ বর্গ কিলোমিটার।

মহিষাদল এষ্টেট এক সময় এ জেলার বড় বড় এষ্টেটগুলির অন্যতম ছিল। শাহ্ সুজার রাজস্ব খতিয়ানে এটি ছিল সরকার মালঝিটার অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় এটিকে তমলুক জমিদারীর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। উপাধ্যায় উপাধিধারী সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘকাল এখানকার জমিদার ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাণী জানকীর সাথে কোম্পানীর বন্দোবস্ত হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই অঞ্চল সহরের রূপ নিতে সুরু করে। ঘন হয়ে ওঠে জন বসতি। এখন সহরাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। এখনও পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে ওঠে নি।

কিছুদিন আগেও কোলাঘাট ছিল খোলা মাঠ। মাথার ওপরে নীল আকাশ। পাশে রূপনারায়ণ নদ। সামনে জাতীয় সড়ক, বম্বে হাইওয়ে। শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার পক্ষে আদর্শ স্থান! পরিকল্পিত ভাবে শিল্পাঞ্চল গড়ে না উঠলেও যা গড়ে উঠছে শিল্প সংস্থাগুলির তা মেরুদণ্ড। কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র শুধু এই জেলা নয়, পশ্চিম বাংলায় আর্থিক কাঠামো বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রকল্প অনুযায়ী[১৫] এখানে তিনটি দুশো মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসান হবে। মোট খরচ আনুমানিক একশো সাড়ে পনের কোটি টাকা। প্রায় এক হাজার একর জমির ওপর এই প্রকল্পের একদিকে থাকবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কর্মীদের বসবাসের উপনগরী, অন্যদিকে ছাই ফেলার জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রতিদিন কয়লা পুড়িয়ে যে ছাই জমবে তার পরিমাণ সামান্য হবে না। প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে। উপনগরীও আংশিকভাবে গড়ে উঠেছে। এই সহরাঞ্চলের বয়স একেবারে কাঁচা। তবু জনসংখ্যা চোদ্দ হাজারের কাছাকাছি।

হলদিয়া শুধু মেদিনীপুর ও পশ্চিমবাংলা নয়, ভারতেরও ভবিষ্যত। পোর্ট টাউন, দুর্গাচক ও হলদী—তিনটি সহরের সমন্বয়ে গড়ে উঠছে হলদিয়া নগরী, আধুনিক নগরীর সাজসজ্জায় পূর্ব পরিকল্পিত, সবাধুনিকা। এখনই এর লোকসংখ্যা ষাট হাজারের ওপর। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেছেন আগামী কুড়ি বছরের ভেতর এর জনসংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে তিন লক্ষ।

মহকুমা হিসাবে তমলুক যেমন বর্দ্ধিষ্ণু ঘাটাল তেমনি ক্ষয়িষ্ণু। এই শতকের

১৫. রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পাঠান ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে কমিশন প্রকল্পটি অনুমোদন করেন।

দ্বিতীয় দশক থেকে এই মহকুমায় লোকসংখ্যার যে দ্রুত অবনতি ঘটে চলেছিল এখন তা অনেকখানি প্রশমিত। এ জেলার ভেতর মহকুমাটি ক্ষুদ্রতম। যদিও মেদিনীপুর জেলার নটি পৌর সহরের ভেতর পাঁচটিই[১৬] এই মহকুমায় অবস্থিত। ১৮৫০ সালে মহকুমাটির সৃষ্টি হয়। তখন মহকুমা দপ্তর ছিল গড়বেতায়। নাম ছিল গড়বেতা মহকুমা। পরে হুগলী জেলা থেকে চন্দ্রকোণা কেটে নিয়ে যখন এ জেলার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় তখন থেকেই ঘাটাল মহকুমার প্রধান সহর বলে গণ্য হয় নামও বদলে যায় মহকুমার। ঘাটাল সহর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলি এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ইংরেজ আগমনের আগে থেকেই ও ইংরেজ শাসনেও কিছুকাল এই অঞ্চল ছিল ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে জমজমাট। ফলে জনবসতিও এখানে ঘন হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দুর্দৈবই জন সংখ্যা হ্রাসের[১৭] কারণ বলে ইংরেজরা রায় দেন। এই রায় কতখানি গ্রহণ যোগ্য তা বিচার্য। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ আমলে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ওপর সুপরিকল্পিত আঘাতই এ বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে হয়।

ঘাটাল মহকুমায় থানার সংখ্যা তিনটি। ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও দাসপুর। পৌর সহরগুলির ভেতর ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা একই সময় ও ১৮৭২ বছরে পৌর সহর বলে ঘোষিত হয়েছিল। কাঁসা-পিতল, তসর, সুতী কাপড় ও মাটির পাত্রের জন্য ঘাটাল সহর বিখ্যাত ছিল। নদীপথে কলকাতার সাথে যোগাযোগের সহজ উপায় ছিল নৌকা ও স্টীমার। সাধারণত রূপনারায়ণের ওপর রাণীচক থেকেই ছাড়ত এইসব জলযান। বর্ষার সময় ঘাটাল থেকেই ছোট স্টীমার চলাচল করত। প্রকৃতপক্ষে ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমার প্রধান বন্দর ছিল ঘাটাল সহর। সম্ভবত ঘাটি (চৌকি বা আউট পোষ্ট) ও আল কথা দুটি থেকেই ঘাঁটাল শব্দের উৎপত্তি। শোভা সিংহের সময় অর্থাৎ সতের শতকের শেষ দিকে ঘাটালের অভ্যুদয় বলে অনেকে মনে করেন[১৮]।

---

১৬. পাঁচটি পৌর সহর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই, খড়ার ও ঘাটাল।

১৭. মহকুমার জনসংখ্যা ১৮৯১ সালে ছিল ৩,২৭,৯০২; ১৯০১ ও ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,২৪,৯৯১ ও ৩,১১,৩৮২। আগে (১৮৯১) জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৮৭৪ এখন (১৯৫১) ৮৪৫।—A. Mitra.

১৮. Bengal Dist. Gazetteers—L. S. S. O'Malley ও ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়।

ঘাটাল পৌর সহরের এলাকা দশ বর্গ কিলোমিটারের কিছু বেশী। বিশ শতকের সুরু থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত কম বেশী করে লোকসংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। এরপর থেকে দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে।

এই মহকুমার চন্দ্রকোণাও প্রাচীন সহর। সহরের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্ত পুরনো সৌধ ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখলে একথা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র হিসাবে বাজারও ছিল অনেক। যেমন, ভায়ের বাজার, খিড়কি বাজার, বড় বাজার, নতুন বাজার, সমাধি বাজার ইত্যাদি। এদের অনেকগুলিই এখন বিলুপ্ত। শুধু নামগুলিই প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি টেনে চলেছে। চন্দ্রকোণা নিয়ে পুরনো প্রবাদটি, "বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি, তবে জানবি চন্দ্রকোণা এলি' এখন কথার কথা মাত্র। পৌর সহরের এলাকা বেশ বড়। প্রায় সাড়ে ষোল বর্গ কিলোমিটার। এখানকার মাটি বাড়ি তৈরি করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। বড় বড় দোতলা বাস্তু বা কুঠি বাড়ি এই মাটিতে সহজেই তৈরি করা যায়। এবং এ ধরণের বহু বাড়ি চোখে পড়ে এই সহরে।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রকোণা ছিল সুতী বস্ত্র ও চিনি তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। বিলাত কাপড় আমদানীর ফলে বস্ত্র শিল্প যেমন একদিকে প্রায় উঠে যেতে বসে ছিল তেমনি লোকসংখ্যাও কমতে সুরু করেছিল ধীরে ধীরে। বিশ শতকের গোড়ায় পৌর সহরের যে জনসংখ্যা ছিল কমতে কমতে ১৯০১ সালে প্রায় আধাআধি হয়ে আসে। ষাটের দশক থেকে আবার লোকসংখ্যা বাড়তে সুরু করেছে।

চন্দ্রকোণার পুরনো নাম ছিল মানা। বগড়ীর উপকথায় দেখা যায় খয়রা মল্ল ছিলেন এখানকার রাজা। খয়রা মল্লকে পরাজিত করে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত কেতু বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সময় ছিল আনুমানিক পনের শতকের প্রথম ভাগ[১৯]। চন্দ্রকেতুর সময়েই চন্দ্রকোণা বিশিষ্ট শহর

১৯. খয়রা মল্লের সময় নিয়ে মতভেদ আছে। ও ম্যালি বলেছেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে খয়রা মল্ল ছিলেন এখানকার রাজা। তাকে পরাজিত করেন চন্দ্রকেতু।—**Bengal Dist. Gazetteers,**
যোগেশ বসু বলেছেন বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজারা খ্রীষ্টীয় পনের শতকের প্রথমভাগে এখানে রাজত্ব করতেন। তাদেরই শেষ রাজাকে পরাজিত করেন ইন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত ও কেতু বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।—মেদিনীপুরের ইতিহাস।

হিসাবে গড়ে ওঠে। এখনও যেসব সৌধ, মন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাদের বেশীরভাগ চন্দ্রকেতুর সময়েই নির্মিত।

ঘাটাল মহকুমায় বাকি তিনটি পৌর সহর রামজীবনপুর, খড়ার ও ক্ষীরপাই। চন্দ্রকোণা থেকে ন'মাইল উত্তরপূর্বে বর্ধমান-উড়িষ্যা রাস্তার ওপরেই অবস্থিত রামজীবনপুর। এটিও প্রাচীন সহর। সম্ভবত ভানরাজা হরিনারায়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায়ের নামে সহরের নামকরণ করা হয়েছিল[২০]। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের জন্য এই সহরটিও একসময় বিখ্যাত ছিল। ফলে বিশ শতকের প্রথমদিকে এখানকার জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। রামজীবনপুর সহরটি চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত।

খড়ার পৌর সভার সৃষ্টি হয় ১৮৮৮ সালে। ঘাটাল থানার অন্তর্গত এই সহরের দূরত্ব ঘাটাল টাউন থেকে ছ মাইল উত্তরে। চন্দ্রকোণার মত খড়ারের লোকসংখ্যাও বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে কমতে সুরু করে প্রায় আধাআধি এসে দাড়ায় ১৯৫১ সালে। এখন জনসংখ্যা বাড়তির দিকে। কাঁসা-পিতল শিল্পের অবনতিই জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ বলে মনে হয়।

চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ক্ষীরপাইও এক সময় সমৃদ্ধ সহর ছিল। সুতী বা তাঁত বস্ত্র ছিল এখানকার প্রধান শিল্প। আঠারো শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের রেশম ও সুতী বস্ত্র তৈরির কুঠি বা ফ্যাক্টরীও ছিল এখানে। ওলন্দাজেরা এখান থেকে মাল কিনতেন। কলে তৈরি বিলিতি কাপড়ের চাপে যখন থেকে তাঁত শিল্পের ওপর আঘাত পড়তে সুরু করে তখন থেকে সমৃদ্ধিও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। পুরনো বর্ধমান উড়িষ্যা সড়ক এই সহরের ভেতর দিয়ে গেছে।

এ জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল জুড়ে কাঁথি মহকুমা। বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর সীমানা অনেকখানি। বাকি অংশ হলদী ও রসুলপুর নদী দুটির অববাহিকা। এখানকার জমি উর্বর কিন্তু নিচু। ফলে বর্ষাকালে অনেক জায়গায় জল জমে জলাভ সৃষ্টি হয়। মহকুমার ভূ-প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একদিকে দিগন্তজোড়া সবুজ মাঠ অন্যদিকে বিশেষত রামনগর থানা এলাকায় শ্বেত বালিয়াড়ি। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলগুলি স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক পরিবেশও সুন্দর। এই অঞ্চলগুলির ভেতর কাঁথি থানার অন্তর্গত জুনপুট, দৌলতপুর ও দরিয়াপুর এবং রামনগর থানার চাঁদপুর, বীরকুল ও দীঘা

২০ ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়

উল্লেখযোগ্য। বীরকুলের নাম ছিল আগে থেকেই। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্ণর, সমুদ্রের কাছে এই মনোরম স্থানটিতে তিনি গরমের ছুটি কাটাতে আসতেন। দীঘার নামডাক হয়েছে সম্প্রতি। ১৯২৩ সালে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী পুরনো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে দীঘা পুনরাবিষ্কার করেন। লেখা লিখিও করেন বিস্তর যাতে স্থানটির উন্নতি হয়। কিন্তু সে উদ্যম ফলপ্রসূ হয়নি। পরে (১৯৩৪) মেদিনীপুরের জেলা শাসকও এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। নিষ্ফল হয় সে চেষ্টা। হলদিয়ার মত দীঘার রূপায়ণের জন্যেও প্রথম সার্থক উদ্যোগ নেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দেখতে দেখতে দীঘা একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পরিকল্পনার মাধ্যমে একে আরও সুন্দর ও জনপ্রিয় করার উদ্যোগ চলছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দীঘা কাঁথি মহকুমার দ্বিতীয় সহরাঞ্চলে পরিণত হবে।

কাঁথি মহকুমায় থানার সংখ্যা সাতটি। ১৮৫২ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনে যখন কাঁথি মহকুমার সৃষ্টি হয়, তখন মহকুমায় কোন সহরাঞ্চল ছিল না। এমনকি মহকুমার হেড কোয়াটার্স কাঁথিও ছিল একটি বড় গ্রাম। প্রকৃত পক্ষে সল্ট এজেন্সীর সদর দপ্তর ছিল এখানে। এখন যেটি মহকুমা শাসকের অফিস ও বাসগৃহ সেটিই ছিল হিজলী ভুক্তির লবন দপ্তরের কার্যালয়।

ইউরোপীয় বণিকদের আনাগোনায় কাঁথি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী তিনটি বড় বন্দর বালেশ্বর, পিপলী ও হিজলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কাঁথি থেকে ছিল সুবিধাজনক। রেভঃ জন ইভান্স ও ভালেনটাইন[২১] কাঁথিকে কেন্দুয়া বলে উল্লেখ করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অনুমান করেছেন কাঁথির কাছে বালিয়াড়ি বা বালির কাথ আছে বলে এই জায়গার নাম হয়েছিল কাঁথি[২২]। পৌর সহর হিসাবে কাঁথি স্বীকৃত হয়েছে স্বাধীনতার কিছু আগে। উনিশ শো একত্রিশ সালে। জনসংখ্যার দিক থেকে কাঁথি সহর বর্দ্ধিষ্ণু। এই মহকুমার ভেতর একমাত্র কাঁথি সহরই সহরাঞ্চল বলে স্বীকৃত।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার সৃষ্টি হয় ১৯২২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। তার আগে ঝাড়গ্রাম ছিল মেদিনীপুর সদর মহকুমার একটি থানা মাত্র। ঝাড়গ্রাম,

২১. রেভঃ জন ইভান্স বলেছেন Kendoa (1679)—W. Hedges 'Diary Vol—II ভ্যালেনটাইনের ম্যাপে Kindua.

২২. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭—'গ্রামের নাম" (যোগেশ)।

গোপীবল্লভপুর ও বিনপুর থানা নিয়ে যখন মহকুমা গঠিত হয় তখন মহকুমা হেডকোয়াটার্সও সহরাঞ্চল ছিল না। ১৯৫১ সালের লোকগনণার সময় ঝাড়গ্রাম সহর হিসাবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে থানার সংখ্যা ছটি। আগেকার তিনটি থানার সাথে আরও তিনটি থানা যুক্ত হয়েছে। সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও জামবনী। এই মহকুমার বেশীরভাগ অঞ্চলই জঙ্গলাকীর্ণ। আদিবাসী ও উপজাতি লোকসংখ্যাও এখানে বেশী। পথঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। বর্ষাকালে কোন কোন অঞ্চল অগম্য হয়ে ওঠে। জেলার পূর্বাঞ্চলের তুলনায় এখানকার ভূপ্রকৃতি, জলহাওয়া, মাটি, অধিবাসী ও অধিবাসীদের জীবনধারা সবই পৃথক। উঁচু উঁচু শাল ও সেগুণ গাছে পরিপূর্ণ বন্ধুর ভূভাগ। এখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর। মাটি শক্ত ও পাথুরে, রঙ লাল। বায়ু পরিবর্তনের জন্য রাজ্যের নানা জায়গা থেকে অনেক মানুষ আসেন ঝাড়গ্রাম, গিধনি, দহিজুড়ি শিলদা ও বেলপাহাড়িতে।

এই অনুন্নত মহকুমাটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একটি পর্ষদ গঠিত হয়েছে সম্প্রতি। ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে মহকুমার আভ্যন্তরীণ সম্পদের বিনিয়োগ, শিল্প সংস্থা স্থাপন ও ঝাড়গ্রাম সহরাঞ্চলের সুষ্ঠু রূপায়ন এই পর্ষদের মূল কাজ।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি মহকুমার ভেতর সদর ও তমলুক মহকুমার আধুনিক রূপায়ন পরিকল্পিত ভাবে ও প্রাকৃতিক তাগিদে ঘটে চলেছে। একদা সমৃদ্ধ অঞ্চল ঘাটাল মহকুমা লুপ্ত গৌরব ও ক্ষয়িষ্ণু। অনুন্নত ঝাড়গ্রাম মহকুমা আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে সুরু করেছে। কাঁথি মহকুমা এখনও গ্রাম্য বধূর মত লজ্জাশীলা, সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র কোলে নিয়ে দিন গুনছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়।

গ্রাম ঢেলে সহর সাজাবার উদ্যোগে এ জেলার প্রচেষ্টা তুচ্ছ করার মত নয়। জেলার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য যা এতদিন উপেক্ষিত হয়েছিল, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। ১৯০১ সালে সহরের সংখ্যা ছিল সাতটি। মেদিনীপুর, ঘাটাল, তমলুক, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, খড়ার ও ক্ষীরপাই। পরে গড়ে ওঠে (১৯১১) খড়্গপুর পৌর সহর। কাঁথি পৌর সহর হিসেবে চিহ্নিত হয় ১৯৩১ সালে। স্বাধীনতার পরে প্রথম পরিসংখ্যানে (১৯৫১) গড়বেতা ও ঝাড়গ্রাম সহর বলে গণ্য হয়। আরও তিনটি সহরাঞ্চল

আমলাগোড়া, বালিচক ও মহিষাদল চিহ্নিত হয় দশ বছর পরে (১৯৬১)। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানে যুক্ত হয়েছে কোলাঘাট ও হলদিয়া। এ ছাড়া খড়্গাপুরের আরও তিনটি সহরও এরই ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছিল।

লোকসংখ্যা, আয়তন ও সমস্যার বৈচিত্র্যে জেলাটি এত বিপুল যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের অভাবে জেলার কেন্দ্র সহর মেদিনীপুর দূরবর্তী গ্রাম্য অঞ্চলগুলির সাথে প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে। ফলে এখানে আসতে হলে অধিবাসীদের অপরিসীম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তাছাড়া হলদিয়া ও খড়্গাপুর নিমপুরায় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে মেদিনীপুর থেকে সারা জেলার প্রশাসন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। বর্তমান অসুবিধা ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে মেদিনীপুর জেলা ভেঙ্গে দুটি পৃথক জেলা গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন।

ভাঙ্গাভাঙ্গি ও জোড়া দেওয়ার কাজ যে একেবারে চলছে না তা নয়। ১৯৬১ সালে সারা জেলায় থানার সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটি। পরে রামনগর থানার অংশ কেটে নিয়ে তৈরি হয় নতুন থানা, দীঘা (১৯৬৩)। উনিশশো একাত্তরে সুতাহাটা থানা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আরও দুটি থানার। দুর্গাচক ও হলদিয়া। সম্প্রতি গড়বেতা থানার অংশ বিশেষ নিয়ে গোয়ালতোড় (১৯৭৫) থানার সৃষ্টি হয়েছে ও নারায়ণগড় থানা থেকে তৈরি হয়েছে বেলদা (১৯৭৬)।

বর্তমানে এ জেলার মোট আয়তন ১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৫৫,০৯,২৪৭।

পরিশিষ্ট
ও
পরিসংখ্যান

পরিচিতি ও প্রশাসন

অবস্থান—উত্তর অক্ষাংশ ২১°৩৬'৩৫"—২২°৫৭'১০"

পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১২'৪০"—৮৬°৩৩'৫০"

আয়তন—১৩,৭২৪ বর্গ কিলোমিটার

মহকুমা—৫

মেদিনীপুর সদর (উত্তর ও দক্ষিণ), তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম।

সদর দক্ষিণ মহকুমা, সদর মহকুমার অন্তর্গত। অফিস মেদিনীপুর জেলা সহরে। আধিকারিক, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক।

তমলুক মহকুমায় আর একজন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আছেন। অফিস হলদিয়ায় তিনি তমলুক মহকুমা শাসকের অধীন।

থানা—৩৯

সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা—৫২

ভূমি সংস্কার চক্র—৫৩

(এল. আর সার্কেল)

জিলা পরিষদ—১ অঞ্চল পঞ্চায়েত—৫৭০

গ্রাম পঞ্চায়েত—৩২৭৯ জন বসতিপূর্ণ গ্রাম—১০,৩৮০

জন বিহীন গ্রাম—১,৫২১

জনসংখ্যা—৫৫,০৯,২৪৭

পুরুষ—২৮,৩১,৮৬৩ নারী—২৬,৭৭,৩৮৪

তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়—৭,৫৭,৫৯৭ আদিবাসী—৪,৭২,৯৬৩

মুসলমান—৪,২৬,৪৬৩ সহরের জনসংখ্যা—৪,২০,১৪৮

গ্রামীন জনসংখ্যা—৫০,৮৯,০৯৯

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জন সংখ্যার ঘনত্ব—৪০১

সাক্ষরতার হার—৩২.৯ সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ—৪৫.৬

সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নারী—১৯.৪ জন্মহার, প্রতি হাজারে—১০.৬

মৃত্যু হার, প্রতি হাজারে—৪.৭ সরকারি চাকুরে—২৪,৯৩৯

নথিভুক্ত কারখানায় শ্রমিক('৭২)—১৭,৯৯০ বেকার ('৭২)—১,১৯,২৮৮

গ্রাম্য জনসংখ্যার শতকরা হার—৯২.৩৭ সহরে জনসংখ্যার হার—৭.৬৩

শ্রমিকের হার—২৬.৭০ অ-শ্রমিকের হার—৭৩.৩০

উৎস: Census of India, 1971 Series 22, West Bengal Part II—A & District Statistical Handbook, Midnapore, 1971 & 1972 combined

মহকুমা ও থানা পরিচয়

মহকুমা/থানা	এলাকা (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা	ব্লক	এল. আর সার্কেল
সদর মহকুমা (উত্তর)	৩০৭১'৮	১৮,৩৩,১২৭	১৬	১৭
১. মেদিনীপুর (কোতোয়ালি)	৩৩৭'০	১,৯৫,২৩২	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর সদর
২. ডেবরা	৩৪২'৪	১,৫০,৫৪৪	ডেবরা	শালিচক
৩. কেশপুর	৪৮১'৫	১,৫৩,৫৯৪	কেশপুর	কেশপুর আনন্দপুর
৪. শালবনী	৫৫২'৪	৯৮,৮৬০	শালবনী	শালবনী
৫. গড়বেতা	০৫৭'৮	২,৫৭,৪৪৩	গড়বেতা—১ গড়বেতা—২	চন্দ্রকোণা রোড গড়বেতা
৬. গোয়ালতোড়			গড়বেতা—৩	গোয়ালতোড়

গোয়ালতোড় নতুন থানা (১৯৭৫) গড়বেতা—১ ও ৩ ব্লক গোয়ালতোড় ও গড়বেতা থানার অংশ নিয়ে গঠিত। গড়বেতা—২ ব্লক গোয়ালতোড় থানা সীমানার ভেতরে অবস্থিত।

মহকুমা/থানা	এলাকা (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা	ব্লক	এল. আর সার্কেল
সদর মহকুমা (দক্ষিণ)				
৭. পিংলা	২২৩'৫	৯৫,১৬৯	পিংলা	পিংলা
৮. সবং	৩১১'৮	১,৩২,৩০১	সবং	সবং
৯. কেশিয়াড়ী	২৯৬'৬	৭৬,৩৮৩	কেশিয়াড়ী	কেশিয়াড়ী
১০. মোহনপুর	১৪০'৬	৫৩,৩০১	মোহনপুর	মোহনপুর
১১ খড়্গপুর টাউন	৩৩'৪	১,৬১,২৫৭	খড়্গপুর—১	খড়্গপুর—১
১২. খড়্গপুর লোকাল	৫৫৫'৩	১,৭০,৯৪৫	খড়্গপুর—২	খড়্গপুর—২
১৩. দাঁতন	৪৭১'১	১,৬৯,২১১	দাঁতন—১ দাঁতন—২	দাঁতন
১৪. নারায়ণগড়	৫০৪'০	১,৫৪,৭৮১	নারায়ণগড়	খাকুরদা
১৫. বেলদা				বেলদা

বেলদা নতুন থানা (৭৬) নারায়ণগড় ব্লক নারায়ণগড় থানা ও বেলদা

থানা জুড়ে বিস্তৃত। বেলদা থানার কিছু অংশ দাঁতন—২ ব্লকের ভেতরেও আছে। খড়্গপুর—২ ব্লক খড়্গপুর লোকাল থানার সীমানার অন্তর্গত। খড়্গপুর—১ ব্লক খড়্গপুর টাউন থানার সম্পূর্ণ ও খড়্গপুর লোকাল থানার কিছু নিয়ে গঠিত।

মহকুমা/থানা	এলাকা (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা	ব্লক	এস. আর. সার্কেল
ঘাটাল মহকুমা	৯৫৭·৭	৫,৬৪,১৫৩	৫	৫
১. ঘাটাল	২৩২·৬	১,৪৯,৩৫৮	ঘাটাল	ঘাটাল
২. চন্দ্রকোণা	৩৯০·৮	১,৫৬,৮৫১	চন্দ্রকোণা—১	ক্ষীরপাই
			চন্দ্রকোণা—২	চন্দ্রকোণা
৩. দাসপুর	৩৩১·৩	২,৩৭,৯৬৪	দাসপুর—১	দাসপুর
			দাসপুর—২	গোপগঞ্জ
তমলুক মহকুমা	২,৯৩০·৪	১৩, ৯,৯২৮	১২	১২
১ তমলুক	২৪৩·৪	২,৩৬,৩৮৭	তমলুক—১	তমলুক
			তমলুক—২	মেচেদা
২. পাঁশকুড়া	৬০০·৭	৩,১০,৭৭১	পাঁশকুড়া—১	পাঁশকুড়া
			পাঁশকুড়া—২	বারবরিষা
৩ ময়না	১৭৮·৭	১,১১,৮৮৭	ময়না	ময়না
৪. মহিষাদল	৩২৩·৫	২,২৭,০৫০	মহিষাদল—১	নন্দকুমার
			মহিষাদল—২	মহিষাদল
৫. নন্দীগ্রাম	৫৯৭·৭	২,৬১,৪০৪	নন্দীগ্রাম—১	নন্দীগ্রাম
			নন্দীগ্রাম—২	রিয়াপাড়া
			নন্দীগ্রাম—৩	চণ্ডীপুর
৬ সুতাহাটা	৩২৯·৭	১,৬৫,৬৬২	সুতাহাটা—১	কুকরাহাটি
৭. দুর্গাচক				
৮. হলদিয়া	২১·৫৯	৯,৯৬৮	সুতাহাটা—২	বালুঘাটা

দুর্গাচক ও হলদিয়া নতুন থানা (১৯৭১)। সুতাহাটা—১ ব্লকের ভেতরে দুর্গাচক থানার সমগ্র, সুতাহাটা ও হলদিয়া থানার কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত। সুতাহাটা—২ ব্লক সুতাহাটা ও হলদিয়া থানার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত।

মহকুমা/থানা	এলাকা	জনসংখ্যা	ব্লক	এল. আর. সার্কেল
ঝাড়গ্রাম মহকুমা	৩০৭১'৮	৬,৫৮,১০৫	৮	৮
১ বিনপুর	৯৪৫'৬	১,৯৩,০০০	বিনপুর—১	বিনপুর
			বিনপুর—২	শিলদা
২. জামবনী	৩২৬ ৬	৬৮,৮৮৬	জামবনী	গিধনি
৩. ঝাড়গ্রাম	৫৩৯'৫	১,১৯,৯৫৭	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম
৪. গোপীবল্লভপুর	৪৭৮ ৯	১,২৬,৪৩৭	গোপীবল্লভপুর—১	গোপীবল্লভপুর
			গোপীবল্লভপুর—২	বেলাবেড়িয়া
৫. সাঁকরাইল	২৭৫'৬	৬৭,৬১০	সাঁকরাইল	সাঁকরাইল
৬. নয়াগ্রাম	৫০৫ ৬	৮২,২১৫	নয়াগ্রাম	নয়াগ্রাম
কাঁথি মহকুমা	১৩৬১'০	১১,৬৩,৯৩৪	১১	১১
১. ভগবানপুর	৩৬২'৬	২,১৭,২৮৪	ভগবানপুর—১	ভগবানপুর
			ভগবানপুর—২	মুগবেড়িয়া
২. পটাশপুর	৩৫৭ ৯	১,৭২,৮৫৭	পটাশপুর	পটাশপুর
৩. এগরা	৪০৩'০	১,৮৩,৬৭০	এগরা—১	এগরা
			এগরা—২	বালিঘাই
৪. রামনগর	২৭০'৯	১,৪৯,৯৫৫	রামনগর—১	রামনগর
			রামনগর—২	বালিসাই
৫. দীঘা	৩১'৭	১৫,৩৯১		
৬. কাঁথি	৫০৭ ৯	২,৯০,০৫৩	কাঁথি—১	কাঁথি
			কাঁথি—২	ঢোলমারি
			কাঁথি—৩	মরিশদা
৭. খেজুরী	৪২৬ ৮	১,৩৪,৭১৭	খেজুরী	হেঁড়িয়া

দীঘা থানার (১৯৬৩) সমগ্র অংশ ও রামনগর থানার খণ্ডাংশ নিয়ে রামনগর-১ ব্লক গঠিত।

খরা ও বন্যা পীড়িত অঞ্চল :

(ক) খরা পীড়িত অঞ্চল : ঝাড়গ্রাম ও সদর মহকুমার (উত্তর) কিছু অংশ।

(খ) বন্যা পীড়িত অঞ্চল : ব্লক : দাসপুর—১ ও ২, কেশপুর সবং, ভগবানপুর—১ ও ২, পটাশপুর, এগরা, রামনগর মহিষাদল—১ ও ২, নন্দীগ্রাম—১, ২, ৩।

জনবসতির ঘনত্ব, অঞ্চল পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত ও মৌজা।

মহকুমা	জনবসতির ঘনত্ব প্রতি কিঃ মিঃ	অঞ্চল পঞ্চায়েত	গ্রাম পঞ্চায়েত	মৌজা
মেদিনীপুর সদর	৩৪৭	১৫৬	১০০০	৫০৪১
তমলুক	৬৭৫	১০০	৭৭৯	১২২১
ঝাড়গ্রাম	২১৪	৮০	৪৮৩	৩০০৪
ঘাটাল	৫৭০	৩৮	২৯৫	৬৬৫
কাঁথি	৪৯৩	৯৬	৭২২	৮৭৯

পুলিস প্রশাসন :

১. আরক্ষাধ্যক্ষ বা সুপারিনটেনডেনট্ অব পুলিস—জেলায় পুলিস প্রশাসনের সবময় কর্তা।

২. এ. এস. পি. বা অতিরিক্ত আরক্ষাধ্যক্ষ—(ক) হেড কোয়ার্টার্স বা সদর—পুলিস লাইন ও হিসাব দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক (খ) খড়্গপুর—ঝাড়গ্রাম ও সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক (গ) ঘাটাল, কাঁথি ও তমলুক (হলদিয়া সহ) মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক।

৩. এস. ডি. পি. ও. বা সাব-ডিভিশনাল পুলিস অফিসার—পাঁচজন।

(ক) এস. ডি. পি. ও. খড়্গপুর—সদর (দক্ষিণ) মহকুমা ও ডেবরা থানার

উৎস : Census of India 1971, Series-22 West Bengal Part II-A, District Statistical Handbook, Midnapore 1971 and 1972 combined, Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—U B I

চৌহদ্দি। (খ) এস. ডি. পি. ও ঝাড়গ্রাম—ঝাড়গ্রাম মহকুমা (গ) এস. ডি. পি. ও., কাঁথি—কাঁথি মহকুমা (ঘ) এস. ডি. পি. ও., তমলুক—তমলুক মহকুমা (ঙ) এস. ডি. পি. ও., হলদিয়া—হলদিয়া মহকুমা।

ডেপুটি এস. পি. প্রশাসন—ডেবরা থানা বাদে সদর (উত্তর) মহকুমা চৌহদ্দি। ডেপুটি. এস. পি., ক্রাইম—ঘাটাল।

৪. উল্লিখিত দুজন ডেপুটি এস. পি. বাদে আরও পাঁচজন ডেপুটি এস. পি. আছেন। (ক) ডেপুটি. এস. পি., ডি. আই. বি.—জেলার ইনটেলিজেন্স বা গোয়েন্দা দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক (খ) ডেপুটি. এস. পি., ডি. ই. বি.—এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক (গ) ডেপুটি. এস. পি., করড্‌নিং—করড্‌নিংয়ের তত্ত্বাবধায়ক (ঘ) ডেপুটি. এস. পি., ওয়ারলেস—পুলিস বেতার শাখার তত্ত্বাবধায়ক (ঙ) ডেপুটি এস. পি., ডিসিপ্লিন ও ট্রেনিং—পুলিস কর্মীদের শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক।

৫. জেলার মোট থানার সংখ্যা ৩৯টি। থানাগুলি দশটি সার্কেলে বিভক্ত।

(১) খড়্গপুর সার্কেল—ডেবরা, পিংলা, সবং ও খড়্গপুর লোকাল থানা।

(২) বেলদা সার্কেল—বেলদা, কেশিয়াড়ী, নারায়ণগড়, দাতন ও মোহনপুর থানা।

(৩) ঝাড়গ্রাম সার্কেল—ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, সাঁকরাইল, জামবণী, গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানা।

(৪) সদর সার্কেল—শালবনী, কেশপুর, গড়বেতা ও গোয়ালতোড় থানা।

(৫) এগরা সার্কেল—এগরা, পটাশপুর ও ভগবানপুর থানা।

(৬) কাঁথি সার্কেল—কাঁথি, খেজুরী, রামনগর ও দীঘা থানা।

(৭) তমলুক সার্কেল—তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া থানা।

(৮) ঘাটাল সার্কেল—ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও দাসপুর থানা।

(৯) মহিষাদল সার্কেল—মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা।

(১০) হলদিয়া সার্কেল—হলদিয়া ও দুর্গাচক থানা।

৬. থানা ছাড়া ২টি ইন্‌ভেস্টিগেশন সেন্টার, ৭টি বীট হাউস ও ১৮টি ফাঁড়ি আছে।

উৎস: ১. পুলিস সুপার, মেদিনীপুর ২. District Statistical Handbook, Midnapore 1971 & 1972 combined.

ঐতিহাসিক কালপঞ্জী ও বিশিষ্ট ঘটনা ঃ মেদিনীপুর

প্রাচীন যুগ

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

১৫০০— মহাভারতের যুদ্ধ (আনুমানিক)। তার আগে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তাম্রলিপ্ত রাজের উপস্থিতি।

৩২৭— আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অস্তিত্ব (বর্তমান তমলুক)।

৩১৩— নন্দবংশের পতন। মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

২৬০— অশোকের অভিষেক।

২৫১— অশোকের কলিঙ্গ বিজয়। তাম্রলিপ্ত রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রসিদ্ধ বন্দর ও নগর।

খ্রীষ্টোত্তর অব্দ

(খ্রীষ্টাব্দ)

৩২০— প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহন। গুপ্ত যুগের প্রারম্ভ। তাম্রলিপ্তের অস্তিত্ব।

৪০৫ ৪১১—ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ। কিছুদিন তাম্রলিপ্তে অবস্থিতি।

৬০৫— বাংলায় (গৌড) শশাঙ্কের অভ্যুদয়। তাম্রলিপ্ত রাজ্য। দণ্ডভুক্তি রাজ্য (এখনকার দাতন)।

৬৩০-৬৪৪—হিউয়েন সাঙের ভারত বাস। তাম্রলিপ্তে কিছুকাল অবস্থিতি।

১০২১-১০২৩—রাজেন্দ্র চোল দেবের রাঢ় আক্রমণ। মন্দার বিজয় (মান্দারণ)। দণ্ডভুক্তির রাজা তখন ধর্মপাল (?)। তাম্রলিপ্ত রাজ্য পতনের সূত্রপাত।

১১১৫— দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত (আনুমানিক) করেন।

১১৩৫— অনন্তবর্মা চোডগঙ্গের মিধুনপুর (মেদিনীপুর) অধিকার ও আরম্যদুর্গ (আরামবাগ) ধ্বংস। মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত।

১২০৩— বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত।

তেরো থেকে পনের শতকের শেষার্ধ — বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজা, পঁচেট ও চিতুয়ার রাজা ও দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার জমিদারেরা মুসলমান বিজয় থেকে তাদের অঞ্চল রক্ষা করেন।

১৪৯৭— আলাউদ্দিন হোসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযান। পুরী ও জগন্নাথ দেবের মন্দির লুণ্ঠন।

১৫০৯-১৮—মেদিনীপুরের ভেতর দিয়ে চৈতন্যদেবের পুরী যাত্রা। উড়িষ্যার রাজা তখন প্রতাপরুদ্র। তার সাথে হোসেন শাহের যুদ্ধ চলছিল। যাত্রা উপলক্ষে যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত।
উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় রাজাদের কাছ থেকে মেদিনীপুরের অনেকখানি মুসলমান অধিকারে।

১৫১৪— হিজলী বন্দরের খ্যাতি। উড়িষ্যা থেকে পর্তুগীজদের আগমন।

১৫৭৪-৭৫—তুকারই গ্রামের কাছে মোগল আফগান যুদ্ধ। টোডর মল্লের কাছে আফগানদের পরাজয়। মোগলমারি নাম।

১৫৯০— গোপীবল্লভপুর গোস্বামী বংশে রসিকানন্দের জন্ম।

১৫৯৩— রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর বিজয়। মেদিনীপুরে মোগল অধিকার।

১৬২২— শাহজাদা খুররমের (পরে সম্রাট শাহজাহান) বিদ্রোহ ও অভিযান।

১৬৫২— রসিকানন্দের মৃত্যু।

১৬৮৭— জোব চার্নকের হুগলী ছেড়ে হিজলী আগমন।

১৬৯০-৯৬—চিতুয়া বরদার (বর্তমান ঘাটাল মহকুমায়) জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ।

১৭০১— মুর্শিদকুলি খাঁ মেদিনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদার।

১৭১০— মুর্শিদকুলি বাংলার দেওয়ান। তাছাড়া শাহজাদা আজিমুসশানের এস্টেটের ম্যানেজার ও মেদিনীপুরের ফৌজদার। হুগলী বন্দরেরও ফৌজদার। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণ বা শিব সংকীর্তন রচনা।

১৭৪০— গিরিয়ার যুদ্ধ। আলিবর্দী ও সরফরাজ খাঁ। আলিবর্দী বিজয়ী ও বাংলার মসনদ দখল।

১৭৪২— বাংলায় মারাঠা (বর্গী) অভিযান। নেতা ভাস্কর পণ্ডিত।

১৭৪৩— দ্বিতীয়বার বর্গী আক্রমণ। ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার আগমন। কলকাতায় 'মারাঠা ডিচ' খনন। আলিবর্দী চৌথ দিতে সম্মত।

১৭৪৪— ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে তৃতীয়বার বর্গীর আক্রমণ। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর লুণ্ঠন। আলিবর্দী কর্তৃক ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা।

১৭৫০— বর্গীর হাঙ্গামা প্রতিরোধে আলিবর্দীর মেদিনীপুরে স্থায়ী শিবির স্থাপন।

১৭৫২— মারাঠারা উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মীর হাবিবকে হত্যা করে। উড়িষ্যা সহ মেদিনীপুরের একাংশ মারাঠাদের করতলগত।

১৭৬০— মারাঠা সর্দার শিবভট্টের অভিযান। মেদিনীপুরে নবাবের সেনাপতি খুশীলাল সিংহের পরাজয়।

ক্লাইভের জায়গায় ভান্সিটার্ট বাংলার গভর্নর। মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিম বাংলার নবাব। চুক্তি অনুযায়ী চাকলা মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর। জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে জমিদার ও সর্দারদের বিক্ষোভ সুরু।

১৭৬৩— রেসিডেন্ট বার্ডেট। মেদিনীপুরের বড় বাজারের পত্তন।

১৭৬৫— কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

১৭৬৬— দুর্ভিক্ষ। গ্রাহাম রেসিডেন্ট। বিবি বাজার বা ছোট বাজারের পত্তন।

১৭৬৮— পাটনা বাজার পত্তন। পত্তন করেন ভ্যানসিটার্ট।

১৭৭০— সারা জেলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। জে. পিয়ার্স রেসিডেন্ট।

১৭৭৭— মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের প্রথম কালেকটর পিয়ার্স।

১৭৮৩— ২২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর জেলা হেড কোয়ার্টার্স হিসাবে ঘোষণা।

১৭৯২— দুর্ভিক্ষ।

১৭৯৯-১৮০০—পাইক বিদ্রোহ। নেত্রী কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণি। সহযোগী নাড়াজোলের চুনিলাল খাঁ।

বাগদী সর্দার গোবর্ধন দিকপতি কর্তৃক শিলদায় প্রথম সুরু।

১৮০৬-১৬—বগড়ী পরগণায় নায়েক বিদ্রোহ। নেতা ছিলেন অচল সিংহ। বগড়ার রাজা ছত্র সিংহ প্রথমে বিদ্রোহে যোগ দিলেও পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে অচল সিংহকে ধরিয়ে দেন।

১৮১৪— স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল।

১৮২০— বর্তমান ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২৩— ভয়াবহ বন্যা।

১৮৩১-৩৪—প্রতি বছর বন্যা।

১৮৩৫— মেদিনীপুর আমস্ হাউস যা পরবর্তীকালে মেদিনীপুর চ্যারিটেবল সোসাইটি নামে পরিচিত হয়, প্রতিষ্ঠা।

১৮৩৬— মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল সরকার কর্তৃক গৃহীত। হাইস্কুল হয় ১৮৪০। বঙ্কিমচন্দ্র তখন স্কুলে ভর্তি হন। টাড সাহেব প্রধান শিক্ষক। ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ।

১৮৩৯-৪০—বন্যা।

১৮৪১— শিবচন্দ্র দেব কর্তৃক মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৫১— দুর্ভিক্ষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেদিনীপুরে আগমন।

১৮৫২— নাসের আলি খানের দেওয়া জমিতে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা। বেলী সাহেব সভাপতি। রাজনারায়ণ বসু সম্পাদক। বর্তমানে নাম রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার।

তমলুকে হ্যামিলটন স্কুল প্রতিষ্ঠা। সল্ট এজেন্ট চার্লস হ্যামিলটন প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৫৬— তমলুকে যাদবচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রথম বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৭— সিপাহি বিদ্রোহ। মেদিনীপুরেও শেখাওয়াত ব্যাটালিয়নের পল্টন বিদ্রোহ। কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে বিদ্রোহের নেতা তেওয়ারী ব্রাহ্মণের ফাঁসি।

১৮৬৪— দুর্ভিক্ষ। পটাশপুর থানার বালগোবিন্দপুর গ্রামের মধুসূদন রায় প্রথম বি. এ. পাশ করেন।

১৮৬৫-৬৬—দুর্ভিক্ষ।

১৮৭০— তমলুকে প্রথম মেয়েদের স্কুল সুরু।

১৮৮৬— ডায়মণ্ড হারবার থেকে তমলুক পর্যন্ত স্টীমার সার্ভিসের সূত্রপাত।

১৮৯৩— দাসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম।

১৮৯৭— দুর্ভিক্ষ।

১৯০১— মেদিনীপুরের পোড়া বাংলোর মাঠে (এখনকার বাজ টাউন) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. এন. ঘোষ, বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা থেকে প্রতিনিধি বৃন্দের আগমন। তমলুকে বার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও ছাপাখানা চালু।

১৯০২— শ্রীঅরবিন্দের মেদিনীপুরে আগমন। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এদের নিয়ে বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের টাটা-খড়্গপুর শাখা চালু।

১৯০৩— ভগিনী নিবেদিতার আগমন। ধর্মালোচনায় যোগদান ও মৌলভী আবদুল কাদেরের বাড়িতে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা।

১৯০৪— ঘাটাল মহকুমায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব।

১৯০৫— মেদিনীপুরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া।

১৯০৬— মেদিনীপুর সহরে পুরনো জেলের মাঠে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী। 'সোনার বাংলা' ইস্তাহার বিলির দায়ে ক্ষুদিরাম বোস ধৃত।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো কর্তৃক ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকার রূপ উদ্ভাবন। জার্মানীর স্টুডগার্ডে মাদাম কামা কর্তৃক সেই পতাকা উত্তোলন।

১৯০৭— ঘাটালে বন্যা: ঝাড়গ্রাম থানায় খরা। মেদিনীপুরে নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ছোট লাট এনড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা।

১৯০৮— মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপ। ভুলবশত মিসেস ও মিস কেনেডি নিহত। প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরাম ধৃত।

মেদিনীপুরে হনুমানজীর মন্দিরে পুলিসের তল্লাশী। মেদিনীপুর বোমার মামলা।

১৯০৯— ঘাটাল মহকুমায় বন্যা।

১৯১১— মহরমের মিছিলে পুলিস ইনফরমার আবদুর রহমানের ওপর বোমা নিক্ষেপ।

১৯১৩-১৪—সদর মহকুমায় বন্যা।

১৯১৭— দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আনি বেসান্টের মেদিনীপুর আগমন।

১৯১৯— কাঁসাই নদীতে বন্যা। তমলুক, ঘাটাল ও সদর মহকুমায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। তখনকার বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্‌ডশের বন্যার্ত এলাকা পরিদর্শন।

১৯২০— প্রিন্‌স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরে হরতাল। দাসপুর থানা পুবোভাগে। গান্ধীজীর মেদিনীপুরে আগমন।

১৯২২— ঘাটাল মহকুমায় বন্যা।
সদর মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে ঝাড়গ্রাম মহকুমা গঠন। ঝাড়গ্রাম সহরে মহকুমা হেডকোয়ার্টার্স।

১৯২৩— দীঘা পুনরাবিষ্কার।

১৯২৪— কাজি নজরুল ইসলাম সহ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তমলুক সফর। ঝাড়গ্রামে প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় কে. কে. ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা।

১৯২৫— গান্ধীজীর পুনরায় মেদিনীপুরে আগমন। খড়্গপুর, কণ্টাই, মেদিনীপুর নানা জায়গায় সভা।

১৯২৯— বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে চৌকিদারি ট্যাক্‌স বন্ধ আন্দোলন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরে আগমন।

১৯৩০— গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবন আন্দোলন। দাসপুর থানার চেচুয়া হাটে জনতা কর্তৃক দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও এস. আই অনিরুদ্ধ সামন্তকে হত্যা। নরঘাটে 'নরঘাট লবন সত্যাগ্রহ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩১— জ্যোতি জীবন ঘোষ ও বিমল দাশগুপ্ত কর্তৃক মেদিনীপুরের কালেকটর পেডিকে হত্যা। হিজলী বন্দী শিবিরে গুলি চালনা, সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃত্যু।

১৯৩২— প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল কর্তৃক কালেকটর ডগলাসকে হত্যা। চৌকিদারী ট্যাক্‌স বন্ধ আন্দোলন সদর মহকুমায় প্রবল। পুলিস অত্যাচারে সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি।

১৯৩৩— অনাথ বন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক জেলা শাসক বার্জকে হত্যা।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি। পুলিসের গুলিতে অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যু। ঘাটালে ভূমিকম্প।

১৯৩৪— বার্জ হত্যা মামলায় ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মল জীবন ঘোষের ফাঁসি। স্থান মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল।
সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) মহকুমায় প্রবল ভূমিকম্প। দীঘার উন্নতির জন্য মেদিনীপুর জেলা শাসকের প্রচেষ্টা।

১৯৩৭— নেতাজীর তমলুকে আগমন, তমলুক পৌরসভা কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮— নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে নেতাজীর ঘাটালে আগমন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে উদ্বোধন।

১৯৪২— 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল মেদিনীপুর। মাতঙ্গিনী হাজরা ও আরো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিসের গুলিতে নিহত।
তমলুক, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ভয়াবহ ঝড় ও ঘূর্ণিবাত। জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় ভূমিকম্প। জনসাধারণের ওপর পুলিসের নির্দয় অত্যাচার।

১৯৪৩— সদর, তমলুক ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ। কলেরা, বসন্ত ও ডিসেনট্রির মহামারী আকারে প্রাদুর্ভাব। অনাহারে অজস্র মৃত্যু।

১৯৪৫— ঘাটাল মহকুমায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সদর (উত্তর) মহকুমায় বন্যা।

১৯৪৭— ভারতের স্বাধীনতা। মেদিনীপুরে উল্লাস।

১৯৪৮— খড়্গপুর কলেজ, আশুতোষ হাযার সেকেণ্ডারী স্কুল (দাসপুর থানা) ও রাণী বিনোদ মঞ্জরী গার্লস স্কুল (ঝাড়গ্রাম) প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯— পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুর তমলুকে আগমন, বর্গভীমা মন্দির, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও শ্রীনাথ লাইব্রেরী পরিদর্শন। জনসভায় বক্তৃতা।
ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৯৫১— গড়বেতা ও ঝাড়গ্রাম সহরাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত।

১৯৫৪— হিজলীতে (খড়্গাপুর) ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা।

১৯৫৫— দাসপুরে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার (২০ বেড বিশিষ্ট) স্থাপন। খড়্গাপুরে এথলেটিক এসোসিয়েশনের স্টেডিয়াম নির্মাণ।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তমলুক আগমণ ও তমলুক বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার উদ্বোধন। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বিদ্যুৎ সরববাহ সংস্থা তৈরির ব্যবস্থা।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মেদিনীপুর হোমিও প্যাথি কলেজের শিলান্যাস।

১৯৫৬— কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য অনন্তপ্রসাদ চৌধুরী ও কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি কর্তৃক 'লোক সেবা সমিতি' গঠন

তমলুকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন। পৌর পাঠাগার ও শ্রীনাথ স্মৃতি পাঠাগার একত্রিতভাবে জেলা গ্রন্থাগার গঠন।

১৯৫৭- ঝাড়গ্রামে পলিটেকনিক স্থাপন। নাড়াজোল রাজপরিবারের দানে 'নরেন্দ্রলাল খান গার্লস কলেজ' স্থাপন।

১৯৫৯— দাসপুর ১ নং ব্লক স্থাপন। দাসপুরে ভয়াবহ বন্যা। জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বন্যার্ত এলাকা পরিদর্শন ও খাদ্য বিতরণ।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা বন্দরের সহায়ক একটি বন্দর হবে হলদিয়ায়। এ জন্যে সমীক্ষক দল গঠিত হয় ১৯৬৪। তারা রিপোর্ট দেন ১৯৬৫।

১৯৬০— ঘাটাল-পাশকুড়া রোড নির্মিত।

১৯৬১— ঘাটাল থানায় 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বিদ্যালয়' স্থাপন। বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার উদ্বোধন। গোয়ালতোড়ে ডাকবাংলো নির্মাণ। আমলাগোড়া, বালিচক ও মহিষাদল সহরাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত।

১৯৬২— খড়্গাপুর ১ ও ২ ব্লক উদ্বোধন। সাঁকরাইল ব্লক স্থাপন। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক বেলপাহাড়ীতে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার ও সমাজ কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৩- দাসপুর থানায় লিফট ইরিগেশন প্রকল্প চালু। হলদিয়া বন্দর ও তৈল শোধনাগারের নির্মাণকার্য সুরু।

১৯৬৪— মকরমপুরে দুটি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেণ্টার চালু। কংসাবতী ক্যানেল ডিভিশনের আওতায় সদর (উত্তর) মহকুমার ৩৭·০০০ একর জমি আনয়ন।

১৯৭১— হলদিয়া ও কোলাঘাট সহরাঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত।

১৯৭২— কোলাঘাটে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ। কংসাবতীর ওপর বীরেন্দ্র নাথ সেতুটি সাধারণ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

১৯৭৩— কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদন। ঝাড়গ্রাম এ্যাফেয়ার্স ব্রাঞ্চ গঠন। এই বছরেই এটি ঝাড়গ্রাম উন্নয়ণ পর্ষদে রূপায়িত।

১৯৭৫— হলদিয়া তৈল শোধনাগারের পরীক্ষামূলক উৎপাদন সুরু।

১৯৭৬— খড়্গপুর নিমপুরায় স্কুটার কারখানা চালু।

১৯৭৭— খড়্গপুর নিমপুরায় ডেভি এ্যাশমোর ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন[১]।

মেদিনীপুর জেলায় আগষ্ট বিপ্লবে ক্ষয়ক্ষতি (১৯৪২)

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবে ভারতবর্ষের মধ্যে এ জেলার স্থান ছিল পুরোভাগে। ইংরেজ সরকারকে উপেক্ষা করে যে স্থানীয় প্রশাসনিক সরকার খোলা হয়েছিল তার নাম ছিল 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার'

প্রতিষ্ঠা—১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২ : কার্যকাল—৮ আগষ্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়কগণ (১৭.১২ ১৯৪২—৮.৮. ১৯৪৪)

প্রথম সর্বাধিনায়ক : শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত (১৭.১২.৪২—২৬.৫.৪৩)

দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক : শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় (২৭.৫.৪৩—১৯.৯.৪৩)

তৃতীয় সর্বাধিনায়ক : শ্রীসতীশচন্দ্র সাহু (২০.৯.৪৩—১২.৩.৪৪)

চতুর্থ সর্বাধিনায়ক : বরদাকান্ত কুইতি (১৩.৩.৪৪—৮.৮.৪৪)

বিদ্যুৎ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক : শ্রীসুশীল কুমার ধাড়া। শ্রীধাড়া জাতীয় সরকারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১. বলা বাহুল্য এই পঞ্জী অসম্পূর্ণ। সুধী পাঠক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

যে দুটি মহকুমায় বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে উঠেছিল ও অত্যাচার চলেছিল অমানুষিক : সেখানে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান :—

	তমলুক মহকুমা	কাঁথি মহকুমা
গুলিতে নিহত—	৪০	৩৮
গুলিতে আহত—	১৯৯	১৩১
নারী ধর্ষণ/ধর্ষণের প্রচেষ্টা	৭৩/৩১	২০৮ (নির্যাতন সহ)

এক থেকে চারজন পর্যন্ত এক একজনের ওপর ধর্ষণ চালায়। ধর্ষিতা মেয়েদের বয়স ১৪ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত।

	তমলুক মহকুমা	কাঁথি মহকুমা
মেয়েদের শ্লীলতা হানি—	১৫০	
ঘর পোড়ান—	১১৭	৯৬৫
ঘর পোড়ানোর ফলে ক্ষযক্ষতি—	১,৩৯,৫০০০ (টাকায়)	৫,৪১,৪৩৪ (টাকায়)
বাড়ি লুঠ—	১,০৪৪	২০৫৯
লুঠের ফলে ক্ষতির পবিমাণ—	২,১২,৭৯৫ (টাকায়)	৩,৫৫,২৪৬ (টাকায়)
গ্রেপ্তার/অবৈধ আটক—	১,৮৬৮/৫,০৭৬ ১২৯ (ডি. আই. আর)	১২,৬৮১
ঘর তল্লাশী/বাড়ি দখল—	১৩,৩৭০/২৭	
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—	৫৯ পরিবারের	
জরিমানা—	১,৯০,০০০ টাকা	৩০,০০০ টাকা
লাঠির আঘাতে নির্যাতিত—	৪,২২৬	৬,৬৭৫
সংগঠন বেআইনী ঘোষিত—	১৭	
বিশেষ পুলিস নিয়োগ—	৪০১	৪৩৮

উৎস : August Revolution. Two Years' National Government, Midnapur Part I—Satish Chandra Samanta Kothers (1946)

শ্রীবসন্ত কুমাব দাসেব সৌজন্যে প্রাপ্ত শ্রী সুধীবচন্দ্র দাসেব দেওযা তথ্যেব ভিত্তিতে কাঁথিব তথ্য প্রস্তুত।

ভগবানপুর থানাব ইতিবৃত্ত—প্রবোধচন্দ্র বসু।

বাংলাব হলদিঘাট তমলুক—গোপীনন্দন গোস্বামী (১৯৭৩)।

মেদিনীপুরের প্রাচীন রাজা ও জমিদার বংশ

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশ শালা বন্দোবস্ত মেদিনীপুরের উনত্রিশটি জমিদারী মহালের সাথে সাধিত হয়েছিল। কয়েকটি জমিদারী মহাল তখনও পযন্ত সরাসরি ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে আসেনি। হিন্দু রাজত্ব, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে যেসব রাজা ও জমিদারেরা এখানে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

১ **বগড়ী রাজবংশ**—সদর (উত্তর) মহকুমার গড়বেতা থানায় অবস্থিত ছিল বগড়ী। টোডরমল্লের রাজস্ব বিভাগে বগড়ীর নাম আছে। কিছুটা অংশ ছিল চন্দ্রকোণা থানার ভেতরেও। ১৮৭২-৭৮ রেভেনিউ সার্ভের সময় বগড়ীর আয়তন ছিল ৭৪২'৮৩ বর্গ মাইল। অনেকে মনে করেন 'বকডিহি' নামের অপভ্রংশ বগড়ী। এখানকার অধিবাসীদের ভেতর বাগদীদের সংখ্যা বেশী। মহাভারতোক্ত বক রাজার রাজ্য ছিল বগড়ীতে। সমুদ্রগুপ্তের সময় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য ছিল এই অঞ্চলেই। অবশ্য এসবই অনুমান।

বিষ্ণুপুরের অষ্টম মল্লরাজা শূরমল্ল (৭৭৫ খ্রীঃ-৭৯৫ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের বগড়ী রাজ্য অধিকার করেছিলেন। সে সময় কোন্ রাজবংশ এখানে রাজত্ব করতেন জানা যায় না। চোদ্দ শতকের শেষে কিংবা পনের শতকের প্রথম দিকে[১] বগড়ীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গজপতি সিংহ। গজপতির দুই পুত্র, ধনপতি ও ঘনপতি বা গণপতি। মৃত্যুর আগে গজপতি রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করে দুই পুত্রকে দিয়ে যান। ধনপতির রাজধানী ছিল গড়বেতা, ঘনপতির গোয়ালতোড়। ধনপতির পুত্র হামির সিংহ (১৪৭০-১৫০০ খ্রীঃ) দুই রাজ্যেরই রাজা হন। হামিরের পুত্র রঘুনাথ রাজ্যের সীমানা চন্দ্রকোণা পর্যন্ত বাড়িয়ে ছিলেন। রঘুনাথের পুত্র চিত্র সিংহের সময় বিষ্ণুপুরের রাজা বগড়ী জয় করে নেন। এবং তার প্রতিনিধি এই রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

চৌহান সিংহ নামে এক রাজপুত পরে বগড়ী অধিকার করেন (আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রীঃ)। চৌহানের পুত্র আউচ সিংহের কাছ থেকে চন্দ্রকোণার শাসক ছত্রসিংহ বগড়ী কেড়ে নেন। ছত্রসিংহের পর যথাক্রমে তিলকচন্দ্র (১৬৪৩) ও

---

১. মেদিনীপুরের ইতিহাস (২য় সং)—যোগেশ চন্দ্র বসু।

Harrison's Archaeological Report of the District of Midnapore, No. 207, 1873.

তেজচন্দ্র (১৬৭৬) বগড়ীর রাজা হন। পরে আবার বিষ্ণুপুরের রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় বগড়ী। পরিশেষে শামসের সিংহ বগড়ী অধিকার করেন (১৭২০)। তিনি মঙ্গলাপোতা রাজবংশের প্রথম রাজা।

শামসেরের পৌত্র যাদবচন্দ্রের সময় মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদবচন্দ্রের পুত্র ছত্র সিংহের সময় বিখ্যাত'নাএক বিদ্রোহ সুরু হয়। যদিও অচল সিংহ ছিলেন সেই বিদ্রোহের নেতা প্রথম দিকে ছত্র সিংহও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি অচল সিংহকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজরা ছত্র সিংহকে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। পরে বগড়ীর সমগ্র অংশ 'মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর' অধিকারে যায়।

২. **চন্দ্রকোণা রাজবংশ**—ভানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল, চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার। এদের ভেতর মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে চন্দ্রকোণা এখনও বিদ্যমান। সুজার সময় চন্দ্রকোণা সরকার পেস্কোসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তার আগে আইন-ই-আকবরীতে চন্দ্রকোণা সরকার মান্দারণের ভেতরে ছিল বলে উল্লিখিত আছে।

চন্দ্রকোণার প্রাচীন নাম ছিল মানা। বগড়ীর মত চন্দ্রকোণাও বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। পনের শতকের প্রথম দিকে ইন্দ্রকেতু মতান্তরে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত এই ভূখণ্ড অধিকার করেন। ইন্দ্রকেতু ও তার পুত্র নরেন্দ্রকেতুর সময় চন্দ্রকোণার রাজধানী ছিল সম্ভবত আনন্দপুর। নরেন্দ্রকেতুর পুত্র চন্দ্রকেতু আনন্দপুর থেকে উঠিয়ে চন্দ্রকোণায় রাজধানী স্থাপন করেন। বগড়ীর রাজা গজপতি সিংহ চন্দ্রকোণা অধিকার করেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি বীরভানু সিংহ নামে একজন চৌহান বংশীয় রাজাকে চন্দ্রকোণা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। বীরভানু ক্ষীরপাইয়ের দুই মাইল উত্তরে বীরভানুপুর গ্রাম স্থাপন করেছিলেন। বীরভানুর পুত্র হরিনারায়ণ সিংহ বা হরিভানু সিংহ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন (১৬১৭ খ্রীঃ, তোজক-ই-জাহাঙ্গীরি)। পরে মোগল সম্রাটের পাঁচ হাজারী মনসবদারে পরিণত হয়েছিলেন। হরিভানুর পুত্র মিত্রসেনের পুত্রসন্তান না থাকায় মাতুল বংশের রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রকোণার রাজা হন। শোভা সিংহের সাথে তিনি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র চন্দ্রকোণা রাজ্য অধিকার করেন পরবর্তীকালে।

৩. **তমলুক রাজবংশ**—মহাভারতের কালে তাম্রলিপ্তে ধ্বজ রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তাম্রলিপ্ত রাজ উপস্থিত ছিলেন। ভীমের দ্বিগ্বিজয়ে বিজিত হন তাম্রলিপ্তের রাজা। দশকুমার চরিতে স্মস্নের রাজধানী ছিল দামোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত। ধ্বজবংশের কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায় যথা, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, ময়ূরধ্বজ।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একখানা পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন তাতে তাম্রলিপ্তের রাজা গোপীচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। এরপর সম্ভবত তেরো শতকে জনৈক কৈবর্ত কালু ভুঁইয়া এখানকার রাজা ছিলেন। কালু ভুঁইয়ার পরে যথাক্রমে ধান্দড়, মুরারি, হরবার ও ভান্দড় ভুঁইয়া এখানকার রাজা হয়েছিলেন।

গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন[২]। তিনি এখান থেকে গিয়ে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করেন। সম্ভবত এটি কালু ভুঁইয়ার আগেকার ঘটনা।

ভুঁইয়াদের আরও কয়েকজন পর পর রাজত্ব করেন। রাজা রাম ভুঁইযার দুই পুত্র ছিল, শ্রীমন্ত রায় ও ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকাল ১৫৬৬ থেকে ১৬১৭ সাল পর্যন্ত ছিল। সে সময় টোডরমল্ল সুবা বাংলার রাজস্ব খতিয়ান তৈরি করেন। মোগল সরকার ভুঁইয়াদের রায় উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শ্রীমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর জমিদারী তার ভাই ও ছেলেদের ভেতর ভাগ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পরে (১৭৩৭ খ্রী:) রাজা নরনারায়ণ রায় আবার একা সমস্ত জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর ছোট ভাই কমল নারায়ণ জমিদারী দখল করেন। ১৭৫৭ সালে খাজনা বাকি পড়ায় সম্পত্তি নবাবের খাস দখলে যায়। হিজলীর ফৌজদার নবাব মসনদী মহম্মদ খাঁর খোজা, মির্জা দেদার আলি বেগ এর পরিচালনা করেন।

দেদার আলির যখন মৃত্যু হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার মালিক (১৭৬৭)। মহারাজা নন্দকুমার ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মধ্যস্থতায় কোম্পানী নরনারায়ণের স্ত্রী রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও রূপনারায়ণের স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়াকে জমিদারী ফিরিয়ে দেন। নন্দকুমারকে ছয়খানি ও গঙ্গাগোবিন্দকে আটখানি গ্রাম এই কাজের জন্য যৌতুক দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অন্তর্কলহ

---

২. Introduction to Mackenzie Collection—CXXXVIII—H. H. Wilson.

ও মামলায় তমলুক জমিদারী ক্রমশ বিনষ্ট হতে থাকে। আরও পরে এই জমিদারীর অধিকাংশই মহিষাদল রাজবংশের অধিকৃত হয়েছিল। তমলুক জমিদারীর প্রাচীন রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা এখন তমলুক ও বৈঁচবেড়েতে বসবাস করেন।

৪. **সবং ও ময়না রাজবংশ**—যোগেশচন্দ্র বসু অনুমান করেছেন বর্তমান সবং থানার এলাকা নিয়ে সেকালে জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। কালিন্দীরাম ছিলেন এখানকার প্রথম সামন্ত। জাতিতে মাহিষ্য, তিনি ছিলেন উৎকল রাজের অধীন। বালিসীতা গড়ে ছিল এদের বসবাস। ষোল শতকের মাঝামাঝি যখন ময়নাগড়ের রাজবংশের সূচনা হয় তখন রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ছিলেন এই বংশের মুখ্য পুরুষ। তিনিই বালিসীতা গড় থেকে ময়নায় বাসস্থান উঠিয়ে নেন। রাজা ও বাহুবলীন্দ্র উপাধিও এই সময় থেকে। সঙ্গীত ও মল্লবিদ্যায় দক্ষতা ছিল এই বংশের। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে উৎকল রাজ উভয় উপাধি দান করেছিলেন।

কালিন্দীরামের পর যথাক্রমে সামন্ত হন মুরলীধর, বৈষ্ণবচরণ, চৈতন্যচরণ ও নন্দীরাম সামন্ত। নন্দীরামের পুত্র গোবর্ধনানন্দ। গোবর্ধনের আগে ময়নার শাসনকর্তা ছিলেন শ্রীধর হুই। খাজনা বাকি পড়ায় উৎকল রাজের আদেশে গোবর্ধন এই রাজ্য প্রাপ্ত হন।

গোবর্ধনান্দের বংশধরগণ বেশ কিছুদিন এখানে রাজত্ব করেন। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮০৫ সালের ভেতর ময়না জমিদারীর অধিকাংশই খণ্ড খণ্ড ভাবে নীলাম হয়ে যায়।

৫. **কাশীজোড়া রাজবংশ**—পাঁশকুড়া ও ডেবরা থানা জুড়ে কাশীজোড়া একটি বড় পরগণা ছিল। এখান থেকে দুশো অশ্বারোহী, আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মশালধারী সৈন্য রাজসরকারে সরবরাহ করা হত। গঙ্গানারায়ণ রায় ছিলেন কাশীজোড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। উৎকল রাজার অধীনে তিনি সেনা বিভাগে কাজ করতেন। উৎকল রাজ সন্তুষ্ট হয়ে কাশীজোড়া প্রদেশের অধিকার প্রদান করেন। ১৫৭৩ থেকে ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

গঙ্গানারায়ণের মৃত্যুর পরে তার ভ্রাতুষ্পুত্র জামিনীভানু রায় রাজা হন। তিনি শুরা নামক গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। 'যামিনী দীঘি বা জানু দীঘি' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে পুত্র প্রতাপ নারায়ণ প্রতাপপুর নামে

গ্রাম স্থাপন করেন। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন হরশঙ্কর গ্রামে। ১৬৬০ সালে পরলোক গমন করলে তার পুত্র হরিনারায়ণ রাজা হন ও কুলদেবতা কৃষ্ণরায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

হরিনারায়ণেব পুত্র লছমী নারায়ণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চাঁচিযাডা গ্রামে গডবাডি ও মসজিদ তৈরি করেন। তার মৃত্যুর পর (১৬৯২) পুত্র দর্পনারায়ণও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। দর্পনারায়ণের পুত্র জিত নারায়ণ 'জিত সাগব' নামে সরোবর খনন করিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র নরনারায়ণ রাজা হবার পর জয় পাটনা গ্রামে জয়চণ্ডী, প্রতাপ-পুরের অনন্ত বাসুদেব, দেড়াচক গ্রামের গোবর্ধনধারী ও খসরচক গ্রামে গোপাল জীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পুত্র রাজনারায়ণের রাজত্ব কালেই রাজবল্লভপুর ও রঘুনাথ বাড়ী নামে দুটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ কেদারকুণ্ড পরগণায় জমিদার মুকুট নারায়ণকে পরাজিত করে তার রাজ্য অধিকার করেছিলেন। রাজনাবায়ণের মৃত্যুর পর (১৭৭০) ছোট ভাই সুন্দর নারায়ণ রাজা হন। এই সময় মামলা মোকদ্দমায় রাজ পরিবার ঐশ্বর্যে হীন হতে থাকে। সুন্দর নারায়ণের সাথে সাথে এই জমিদারীরও শেষ হয়। তের ভাগে নীলাম হয়ে বিক্রি হয়ে যায় জমিদারী। এই রাজবংশ ছিল জাতিতে কায়স্থ।

৬. **নারায়ণগড় রাজবংশ**—নারায়ণগড রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধব পাল ছিলেন জাতিতে সদগোপ। উৎকলরাজের অধীনে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা কবেন ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। মোগলমারীর পুরনো নাম অমরাবতীপুব ছিল বলে অনেকে মনে করেন[২ক]। এখানেই তার জন্ম। উৎকল রাজ 'চন্দন' উপাধিতে তাকে ভূষিত করেছিলেন।

এই বংশের কুলাখ্যান পত্রিকায় ছাব্বিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এখানকার ধলেশ্বর শিবেব মন্দিরটি প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেব পুরী যাবার পথে মেদিনীপুর থেকে নারায়ণগডে ধলেশ্বর শিব দর্শন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন পুরী যাবার পথ ছিল নারায়ণগডের ভেতর দিয়ে। রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্লভ পাল তিনশো বিঘা জমির ওপর রাজভবন ও দুর্গ তৈরি করেছিলেন। নারায়ণগডের চারদিকে সেকালে চারটি দরজা ছিল। পুরী

২ক। শ্রীবিনয় ঘোষ মনে কবেন গড় অমবাবতী ছিল বর্ধমান জেলায়। —পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, ১৯৭৮।

যেতে হলে 'ছাড়পত্র' নিতে হত নারায়ণগড়ের রাজার কাছ থেকে। চারটি দরজার নাম ছিল যথাক্রমে যম দুয়ার, সিদ্ধেশ্বর দরজা, মেটে দুয়ার বা মৃণ্ময় দুয়ার, চতুর্থ দরজাটি সম্ভবত ছিল কেলেঘাই নদীর তীরে যা পরবর্তীকালে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।

শাহজাদা খুরম (পরে সম্রাট সাহজাহান) যখন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নারায়ণগড়ের রাজা ছিলেন তখন শ্যাম বল্লভ। জাহাঙ্গীরের সেনাদল যখন শাহজাদাকে অনুসরণ করেন, খুরম মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মেদিনীপুর বিশেষত নারায়ণগড় অঞ্চল তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এক রাত্তিরের ভেতর শ্যামবল্লভ জঙ্গল কেটে শাহজাদার জন্য পথ তৈরী করে দেন। পরবর্তীকালে সম্রাট হবার পর এ কাজ স্মরণ রাখেন সাজাহান এবং শ্যামবল্লভকে মাড়-ঈ-সুলতান বা পথের রাজা উপাধি দান করেন।

১৭৫০ সালে মারাঠাদের দমন করতে আলীবর্দী নিজেই মেদিনীপুরে হাজির হয়েছিলেন। আলীবর্দীর আগমন সংবাদ পেয়ে মারাঠারা উড়িষ্যায় পলায়ন করেছিলেন। তাদের ধাওয়া করেন সিরাজদ্দৌলা, নবাবের দৌহিত্র। পথে আলীবর্দীর সাথে সিরাজের নারায়ণগড়েই সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ইংরেজ আমলে ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল নারায়ণগড়ের কাছেই।

গন্ধর্বপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রায় সাড়ে ছশো বছর নারায়ণগড়ে রাজত্ব করেছিলেন। শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পালের সময় এই জমিদারী হস্তান্তরিত হয়। তিনি মারা যান ১৮৮৩ সালে।

৭. **মেদিনীপুর জমিদারী ও কর্ণগড় রাজবংশ**—মেদিনীপুর সহর থেকে নয় কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কর্ণগড়। ষোল শতক থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কর্ণগড় রাজবংশ নামে এক রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্য তার আগেও সম্ভবত এক রাজবংশের এখানে অস্তিত্ব ছিল।[৩] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শিখরভূমির রাজা রামচন্দ্রের একখানা পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন। তাতে দেখা যায় পুত্র 'মেদিনীকোষ' রচয়িতা মেদিনীকর মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ২য় ভাগ।

ষোল শতকের মাঝামাঝি বীরসিংহের বংশের এক রাজা সুরথ সিংহ এখানে রাজত্ব করতেন। বেলী সাহেব[8] সুরথ সিংহকে খয়রা জাতীয় রাজা বলেছেন। খয়রা জঙ্গলের উপজাতি, নিচু শ্রেণীর হিন্দু। লক্ষ্মণ সিংহ ও ভীম মহাপাত্র নামে সুরথ সিংহের দুই কর্মচারী ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেন। লক্ষ্মণ সিংহ কর্ণগড় (১৫৬৮) ও ভীম মহাপাত্র বলরামপুর রাজ্যের রাজা হয়ে বসেন। লক্ষ্মণ সিংহ সম্ভবত জাতিতে ছিলেন সদগোপ।

লক্ষ্মণ সিংহকে হত্যা করে তার ভাই শ্যাম সিংহ পরে রাজা হন। লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র পুরুষোত্তম সিংহ পরে পিতৃব্যের কাছ থেকে রাজ্যাধিকার কেড়ে নেন। পুরুষোত্তমের মৃত্যুর পর পুত্র সংগ্রাম সিংহ, তার পুত্র ছটু রায় পর পর রাজা হন। ছটু রায়ের পর রাজা হয়েছিলেন তার ভাই রঘুনাথ রায় (১৬৭১—১৬৯৩)। মাঝে কিছুদিনের জন্য ছটু রায়ের পুত্র বীরসিংহ রাজা হয়েছিলেন। বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় নবাব সরকার রঘুনাথ রায়ের পুত্র রাম সিংহকে (১৬৯৩—১৭১১) কর্ণগড় রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। অনেকে মনে করেন মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম সিংহ ও কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহ একই ব্যক্তি। রাম সিংহ পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

রাম সিংহের পুত্রই খ্যাতনামা যশোবন্ত সিংহ, যার রাজত্বকালে রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়ণ রচনা (১৭১২) করেছিলেন[5] কর্ণগড়ের রাজা হন। এ প্রসঙ্গে রামেশ্বরের উক্তি স্মরণীয়—

রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণবীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোবন্ত সিংহ সর্বগুণমন্ত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥

৪. Memoranda of Midnapore—H. V. Bayley.

৫. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন।

যশোবন্ত সিংহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে তার রাজকার্যে হাতে খড়ি। সরফরাজ খাঁ যখন ঢাকায় নায়েব-নাজিম ছিলেন, যশোবন্ত ছিলেন তার দেওয়ান। সায়েস্তা খাঁ ঢাকার যে তোরণের ওপর লিখেছিলেন, 'যে রাজার সময়ে শস্য এমন সুলভ না হইবে, তিনি যেন এ তোরণ না খোলেন।' যশোবন্ত সর্ত পালন করে তোরণ উন্মুক্ত করেছিলেন।

যশোবন্তের মৃত্যুর পর (১৭৩৮) তার পুত্র অজিত সিংহ কর্ণগড়ের রাজা হন। তার সৈন্য ছিল পনের হাজার। জঙ্গল মহালের সব রাজা তার অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। তিনিই কর্ণগড়ের শেষ রাজা। তার মৃত্যুর (১৭৫৫) পর দুই রাণী ভবানী ও শিরোমণি জমিদারীর অধিকারিনী হন। জমিদারী দেখাশুনা করতেন নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খাঁন। রাণী ভবানীর মৃত্যুর বছরেই (১৭৬০) মেদিনীপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হয়।

রাণী শিরোমণি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী রমনী ছিলেন। ১৭৯৯—১৮০০ সালে যে চুয়াড় বিদ্রোহ মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল, রাণী শিরোমণি তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে ইংরাজেরা সন্দেহ করে। এ জন্যে রাণী ও তার সহযোগী চুনিলাল খাঁনকে বন্দী করে (৬ এপরিল, ১৭৯৯) কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। শেষে নাড়াজোলের জমিদার সীতারাম খাঁনের পুত্র আনন্দলাল খাঁনের মধ্যস্থতায় কোম্পানীর সাথে রাণীর মিটমাট হয়। বিদ্রোহের পর থেকে শেষ দিন পর্যন্ত (১৮১৩) শিরোমণি আবাস গড়ে বসবাস করেছিলেন।

৮. **বলরামপুর রাজবংশ**—সুরথ সিংহকে হত্যা করে লক্ষণ সিংহ যেমন কর্ণগড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ভীম মহাপাত্রও তেমনি বলরামপুর রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খড়্গপুর মহালের সীমানা জুড়েই ছিল প্রায় বলরামপুর রাজ্যের বিস্তার। ভীমের পর তার পুত্র ও পৌত্র হরিচন্দন ও মুকুন্দরাম যথাক্রমে রাজা হন। মুকুন্দরামের পর পীতাম্বর ও শত্রুঘ্ন রাজা হয়েছিলেন। শত্রুঘ্নের সময় ঘড়ুই নামে একদল দস্যুর অত্যাচারে বলরামপুরের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শত্রুঘ্ন একদিকে যেমন তাদের বশীভূত করেন অন্যদিকে জঙ্গল কেটে আবাদও পত্তন করেছিলেন। এই সময় শত শত তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে বলরামপুরের ভেতর দিয়ে পুরী যেতেন। রাত্রি যাপনের জন্য একটি সদাব্রতও স্থাপন করেছিলেন তি'নে।

শত্রুঘ্নের পর (১৭৬৮)তার পুত্র নরহরি 'চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেন। এর আগেই মেদিনীপুর ইংরেজদের অধিকৃত হয়েছিল। নরহরি ইংরেজদের বশ্যতা অস্বীকার করে মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ করতেন। তার সময় কেদারকুণ্ড পরগণার ওপরও বলরামপুর রাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল।

সম্ভবত কেদারকুণ্ডেও এক প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। জনশ্রুতি, যুগল কিশোর রায় সেই বংশের প্রথম রাজা। এর পর হংস নারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ নামে দুইরাজার নাম পাওয়া যায়। মুকুট নারায়ণ এই বংশের শেষ রাজা। কাশীজোড়া রাজবংশের রাজা রাজনারায়ণ মুকুট নারায়ণকে পরাজিত করে কেদারকুণ্ড দখল করেছিলেন।

নরহরির মৃত্যুর পর (১৭৮৫) বলরামপুরের রাজা হন তার পুত্র বীরপ্রসাদ চৌধুরী। তার মৃত্যুর পর (১৮২৮) জমিদারী নিয়ে চার স্ত্রীর মধ্যে দুই স্ত্রীর গোলমাল বাধে। শেষ পর্যন্ত খাজনা বাকি পড়ায় নীলাম হয় (১৮৩৮)।

গোয়াল-আড়ার ভীমসাগর, আড়াসিনী গড়ের ও মেদিনীপুর সহরের বক্সীবাজার পল্লীর মুকুন্দ সাগর পুকুর তিনটি এই বংশের কীর্তি।

৯. ব্রাহ্মণভূম রাজবংশ—১৮০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণভূম ছিল বর্ধমান জেলার ভেতর। পরে মেদিনীপুরে আসে। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় ব্রাহ্মণভূম সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত।

খ্রীষ্টীয় বারো ও তেরো শতকে মেদিনীপুরের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলিতে নানা উপজাতি সর্দারেরা রাজত্ব করতেন। ব্রাহ্মণভূম পরগণায় মাঝি-জাতীয় এক উপজাতি সর্দার ছিলেন রাজা। তাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে পাথরের তৈরি দুর্গের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সম্ভবত তা উপজাতি রাজাদেরই তৈরি। পরবর্তীকালে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই অঞ্চল অধিকার করেন। রাঢ় দেশ থেকে আলাদা ছিল বলে এর নাম ছিল আরাঢ়া বা আড়ড়া ব্রাহ্মণভূম[৬]।

কুলাখ্যান পত্র থেকে জানা যায় উমাপতি ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসে প্রথম বসবাস সুরু করেন। তার আদি নিবাস ছিল

৬. ব্রাহ্মণভূম পরগণার উত্তর সীমায় নেড়া দেউল নামে একটি পুরনো মন্দির আছে। অনেকে মনে করেন 'নেড়া', বাঢ়া শব্দের অপভ্রংশ ও মন্দিরটি ছিল রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তসীমা। "West of Boroda a monument is drawn to make the frontier between Bengal and Orissa"—(Blockman's notes in Hunter's A Statistical Account of Bengal-Vol—1) যোগেশচন্দ্রের মতে নেড়া দেউল প্রকৃতপক্ষে বাঢ়া দেউল

গঙ্গার কাছে ঋষিঘাটা। এই বংশের ত্রিলোচনদেব মাঝি রাজাকে পরাজিত করে রাজা হন ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মতান্তরে এরা ছিলেন চন্দ্রকোণার প্রাচীন রাজবংশের কুলগুরু। চন্দ্রকোণার রাজা মাঝি রাজাকে পরাজিত করে কুলগুরুকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজবংশ দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করার পর ১৭৬১ সালে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

ব্রাহ্মণভূমির অন্যতম রাজা রঘুনাথদেবের অধ্যাপক ছিলেন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তখন রাজা ছিলেন তার পিতা বাঁকুড়া রায়। এই সময় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। প্রাচীন রাজবংশের উত্তরপুরুষদের বসবাস এখনও আছে চন্দ্রকোণার কাছাকাছি সেনাপতিগ্রামে।

১০. **চিতুয়া-বরদার জমিদার**—আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল লিখেছেন চিতুয়া মহাল বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মাঝামাঝি অবস্থিত। স্টুয়ার্ট বলেছেন জেতোয়া, মার্শমান লিখেছেন চিতুয়ান। যাহোক, চিতুয়া-বরদার জমিদার বংশের আদি পুরুষ রঘুনাথ সিংহ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে তিনি এখানে প্রথম বসবাস সুরু করেন। তার ছেলে কানাইলাল সিংহ চিতুয়া পরগণা কিনে নিয়ে জমিদার বংশের পত্তন করেন। কিছুদিন পরে দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায় জমিদারী। ক্রেতা ফতে সিংহ ছিলেন বরদার জমিদার। কানাইয়ের পুত্র দুর্জন সিংহ মতান্তরে দুর্লভ সিংহ উদ্ধার করেন জমিদারী। তার পুত্র শোভা সিংহের সময় বরদার জমিদারীও এ বংশের অধিকারে আসে।

মোগল শাসনের বিরুদ্ধে শোভাসিংহ বিদ্রোহ করেন ১৬৯৫—৯৬ সালে। তার সহযোগী ছিলেন উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁ। বর্ধমানের রাজকুমারীর হাতে শোভা সিংহের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর চিতুয়ার জমিদার হন হিম্মৎ সিংহ। শোভাসিংহের ভাই। রামেশ্বরকে তিনিই যদুপুর থেকে উৎখাত করেছিলেন। রামেশ্বরের ভাষায়—

পূর্ববাস যদুপুরে, হেম্মৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
বাজারাম সিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

হিম্মৎ সিংহ অল্পদিন জমিদার ছিলেন। খাজনা দিতে না পারায় নবাব কার্তলব খাঁ সৈন্য পাঠালে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। জমিদারী হস্তান্তরিত হয় বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কাছে।

১১. নয়াগ্রাম রাজবংশ—বর্তমানে নয়াগ্রাম ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। ময়ূরভঞ্জের সামন্ত রাজারা যখন এখানে রাজত্ব করতেন এই অঞ্চল তখন নয়াগ্রাম ও জামিরাপাল দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। নয়াগ্রামের জমিদারেরা 'মঙ্গরাজ ভুঁইয়া' ও জামিরা পালের জমিদারেরা 'পাইকারী ভুঁইয়া' নামে অভিহিত হতেন। খেলার গ্রামে যে গড়টি আছে নয়াগ্রামের দ্বিতীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ পত্তন করেন (১৪৯০)। পুত্র বলভদ্রের সময় এটি শেষ হয়। এখন সেটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

এই বংশের অন্যতম রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ ষোল শতকে আর একটি গড় নির্মাণ করেছিলেন। খেলার গড়ের ভেতরে নীল পাথরে তৈরি ঘোড়ায় চড়া একটি পুরুষ ও নারী যুগল মূর্তি আছে। মানভূম জেলায় কোন কোন মন্দিরের সামনে এ ধরণের মূর্তি দেখা যায়। তবে সেগুলি প্রায়ই অর্বাচীন। অনেকে মনে করেন এর গঠনপ্রণালী অনেকাংশে আবরের বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভেতর পাওয়া মূর্তিগুলির অনুরূপ। এই বংশের শেষ রাজা পৃথ্বীনাথ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার দুই রাণী কুঙ্বমণি সিংহ মান্ধাতা ও গোলোকমণি সিংহ মান্ধাতা জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। শেষে এটি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে চলে যায় (১৮৮৬)। পরে নীলামে বিক্রি হলে মুর্শিদাবাদের নবাব এটি কিনে নেন (১৮৯০)। নয়াগ্রাম রাজাদের রাজধানী ছিল কুলটিকরী গ্রামে।

১২. ঝাটিবনী বা শিলদার রাজবংশ—১৭৮৭ সালে শিলদার জমিদার ছিলেন মানগোবিন্দ মল্লরায়। মেদিনীপুরের কালেক্টরকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ১৫২৪ সালে তার প্রপিতামহ মেদিনীমল্লরায় সসৈন্যে এসে এখানকার রাজাকে পরাজিত করে এদেশ অধিকার করেন। তখন রাজা ছিলেন বিজয় সিংহ। তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত আগে এখানে ডোম জাতীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। ডোমগড়ে এখনও যে গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তা তাদেরই কীর্তি। বিজয় সিংহ সেই ডোমদের পরাজিত করে এখানে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমান।

মেদিনীমল্ল কোথা থেকে এসেছিলেন ঠিক জানা যায় না। তিনি ৪১ বছর রাজত্ব করেছিলেন। পরে পুত্র মঙ্গলরাজ ও পৌত্র গৌরহরি যথাক্রমে ৫৭ ও ৬৭ বছর রাজত্ব করেন। গৌরহরির তিন ছেলে ছিল। বলরাম, হরিশ্চন্দ্র ও মানগোবিন্দ। মানগোবিন্দই এই বংশের শেষ রাজা। তার সাত রাণী ছিল।

মৃত্যুর পর অন্যতম রাণী কিশোরমণি জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। শ্রীনাথচন্দ্র পাত্রকে দত্তকও নিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে দেনার দায়ে নীলাম হয়ে যায় জমিদারী। ১৭৯৮ সালের এপরিলে শিলদাতেই চুয়াড বিদ্রোহের আগুন প্রথম জলে উঠেছিল। দুটি গ্রাম জালিয়ে দিয়ে ঘোষিত হয়েছিল বিদ্রোহ। নেতা ছিলেন বাগদী সর্দার গোবর্ধন দিকপতি।

১৩. **কলাইকুণ্ডা বা ধারেন্দা রাজবংশ**—ধারেন্দা বা তপ্পে ধারেন্দা কংসাবতী নদীর অপর পারে মেদিনীপুর সহর থেকে পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ধারেন্দা রাজবংশের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে। সেখানে এরা 'সেঙ্গাই বেঙ্গাইর জমিদার' নামে পরিচিত ছিলেন।

মুসলমানের অত্যাচারে এই বংশের নারায়ণ পাল বাস উঠিয়ে ধারেন্দা পরগণায় আসেন। এই প্রদেশের জমিদারী সনন্দও নবাব সরকার থেকে প্রাপ্ত হন। তার মৃত্যুর পর পুত্র শিবনারায়ণ ও পৌত্র খড়গ সিংহ যথাক্রমে জমিদারীর অধিকারী হন। খড়গ সিংহ কলাইকুণ্ডায় গড়বাড়ি তৈরি করে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। পুত্র না থাকায় মৃত্যুর পর জমিদার হন তার ভাই বাবুরাম পাল। পরে যথাক্রমে বাবুরামের পুত্র শিবরাম, পৌত্র প্রতাপনারায়ণ ও প্রপৌত্র উদয়নারায়ণ জমিদার হয়েছিলেন। উদয় নারায়ণের পুত্র না থাকায় কার্তিক রাম পাল জমিদার হন। ঘড়ুই ও চুয়াড়দের দমন করতে সাহায্য করায় নবাব সরকার তাকে হারওয়াল (যে সৈন্যদের আগে থাকে) উপাধি দিয়েছিলেন।

শ্রীনারায়ণ পাল এই বংশের শেষ জমিদার। এই সময় জমিদারী হস্তান্তরিত হয় ও এক মাড়োয়ারী কিনে নেন। শ্রীনারায়ণ পাল মেদিনীপুর সহরে 'রাজাবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৪. **বীরকুল রাজবংশ ও মীরগোদা, কাকরা জমিদারী**—কাঁথি মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঁথি সহর থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে বীরকুল পরগণা অবস্থিত। আগে রায় উপাধিধারী এক রাজবংশ ময়ূরভঞ্জের রাজার অধীনে থেকে বীরকুল ও মীরগোদা শাসন করতেন। সম্ভবত সাগর রায় (১৫০০ খ্রীঃ) এই বংশের প্রথম রাজা। তিনি সাগরেশ্বর গ্রাম ও একটি মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই মহাদেব এখন বৃদ্ধেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত। সাগরের পর পুত্র যদুনাথ, পৌত্র পুরুষোত্তম ও প্রপৌত্র নরহরি যথাক্রমে রাজা হয়েছিলেন।

নরহরির তিন পুত্র ছিল। বড়কে বীরকুল জমিদারী, মেজোকে মীরগোদা ও ছোটকে কাকরা পরগণার অধিকার দিয়ে তিনি মারা যান। বীরকুলের খাজনা বাকি পড়ায় বেশীর ভাগ অংশ নীলাম হয় (১৭৫০) ও সর্বেশ্বর রায় নামে এক ব্যক্তি কিনে নেন।

মীরগোদায় উদয়ানন্দ চৌধুরী ১৭০১ সালেও জমিদার ছিলেন। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারী খণ্ডরুইয়ের জমিদার লালবিহারী গজেন্দ্র মহাপাত্রের হস্তে অর্পণ করা হয়।

১৫. মাজনামুঠা জমিদারী বা কিশোরনগর রাজবংশ—এই বংশের আদি পুরুষ ঈশ্বরী পট্টনায়েক কাঁথি সহরের কাছাকাছি কিশোরনগর গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যশ্রেণীর কায়স্থ। মৃত্যুর পর (১৬১৩) তার পুত্র জগমোহন পট্টনায়েক নবাব সরকার থেকে চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন। তার দুই স্ত্রীর চার পুত্র ছিল। জগমোহনের মৃত্যুর পরে (১৬৩৩) দ্বারিকানাথ জমিদার হয়েছিলেন। দ্বারিকার পরে (১৬৩৩) বৈমাত্রেয় ভাই রায়কিশোর ভাইপোকে ছলনা করে জমিদারী অধিকার করেন। ১৬৯৩ সালে তিনি মারা গেলে জমিদার হন তার ছেলে ভূপতিচরণ। ভূপতিচরণ অপুত্রক থাকায় মৃত্যুর পরে (১৭৪৫) কৃপানিধির পুত্র যাদবরাম জমিদার হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের যাদবরাম খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। তার দানশীলতা ও বদান্যতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি কিছুকাল হিজলীর লবন মহালের ইজারাদারও ছিলেন। যাদবরামের মৃত্যুর (১৭৮০) কিছুদিন পরেই তার একমাত্র পুত্র কুমার নারায়ণ ও পৌত্র জয়নারায়ণ (১৭৮২ ও ১৭৮৪) মারা যান। মূল বংশধারাও এই সঙ্গে লোপ পায়।

জয়নারায়ণের স্ত্রী পরে পোষ্য হিসাবে সুন্দরনারায়ণকে গ্রহণ করেছিলেন। জয়নারায়ণের বিমাতা রাণী সুগন্ধা জমিদারী কেড়ে নিয়েছিলেন। সুগন্ধা প্রতিষ্ঠিত 'সাঁউতানীর পুকুর (সামন্ত রাজার পত্নী অর্থে সাঁউতানী কথাটি ব্যবহৃত হয়) এখনও আছে।

হিজলী এক সময় খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। বানজা নামক গ্রামে পর্তুগীজদের একটি গির্জাও ছিল। মহেন্দ্রলাল করণ[৭] প্রমাণাদি সহ স্থির করেন, কাঁথি সহরের চার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মাজনা গ্রামই পর্তুগীজদের উল্লিখিত বানজা গ্রাম।

৭. হিজলীর মসনদ-ই-আলা—মহেন্দ্রলাল করণ

১৬. সুজামুঠা রাজবংশ—গোবর্ধন রণঝাঁপ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত হিজলীর নবাব সরকারে উঁচু পদে তিনি কাজ করতেন। হিজলী রাজ্যের যখন অবসান হয় তিনি এই রাজ্য স্থাপন করেন। সুজামুঠার রাজধানী ছিল বর্তমান ভগবানপুর থানার কাজলাগড়ে। গোবর্ধনের পরে ক্রমান্বয়ে মাধবচন্দ্র, শ্রীধরনারায়ণ, গোপালনারায়ণ ও গোরাচাঁদ জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। এই রাজবংশ ছিলেন জাতিতে মাহিষ্য।

গোরাচাঁদের পর জমিদারী পান নরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যখন মারা যান ছেলেরা ছিলেন নাবালক। তার স্ত্রী জমিদারীর কাজ দেখাশুনা করতেন। পরে বড় হয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ ও পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ জমিদার হন। তার সময়েই সুবিখ্যাত নবরত্ন মন্দির ও রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। মহেন্দ্রনারায়ণের পর দেবেন্দ্রনারায়ণ, পরে (১৮০৭) গোপালেন্দ্র নারায়ণ জমিদার হন। পুত্রসন্তান না থাকায় তার মৃত্যুর পরে (১৮৩৭) জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে চলে যায়। গোলকেন্দ্রনারায়ণের সময়েই এটি নীলাম হয় ও বর্ধমানের রাণী কিনে নেন।

১৭. জকপুর মহাশয় বংশ—এই বংশ জাতিতে দক্ষিণ রাঢী কায়স্থ। বালিগ্রাম থেকে এসে তারা এখানে বসবাস স্থাপন করেন। ঘোষ এদের লৌকিক উপাধি। নবাব সরকার থেকে পাওয়া 'রায় ও মহাশয়' উপাধিতেই এরা পরিচিত। জকপুর খড়গপুর থানার অন্তর্গত। প্রবাদ অনুসারে সুবুদ্ধি রায় এই বংশে প্রথম মহাশয় উপাধি পান। টোডরমল্লের রাজস্ব বিভাগ অনুসারে মহাশয় বংশ 'সদর কানুনগো' ছিলেন সরকার জলেশ্বরের। চাকলা হিজলী, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা জলেশ্বর নিয়ে ছিল সদর কানুনগোর পদ। সুবুদ্ধি রায়ের দুই ছেলে ছিল, রামচন্দ্র ও কানুকৃষ্ণ। মেদিনীপুর সহরের বল্লভপুরে মহাশয় বংশের সদর কাছারী ছিল। এ জন্যে তাদের অধিকৃত সম্পত্তি 'নানকর বল্লভপুর' আখ্যা পেয়েছিল।

এই বংশ উদারতা, পাণ্ডিত্য ও কার্যদক্ষতায় প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। লোকের মুখে মুখে ছড়ায় যে নামগুলি উচ্চারিত হত—

দানে চন্দু, অন্নে মানু, রঙ্গে রাজনারায়ণ।
বিত্তে ছকু, কীর্তে নরু, রাজা যাদবরাম ॥

তাদের ছ জনই মেদিনীপুরের লোক। 'চন্দু' অর্থাৎ চন্দ্রশেখর ঘোষ ছিলেন রাজবল্লভ গ্রামের অধিবাসী। 'মানু', মানগোবিন্দ ভঞ্জ, বাড়ি পুঁয়াপাটে,

প্রতিদিন প্রচুর অতিথিকে আপ্যায়ন করতেন। রাজনারায়ণ রায় মহাশয় বংশের শেষ কানুনগো, সৌখিনতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদের বাসভবনই মেদিনীপুর সহরের টাউন স্কুল। ছকু বা মলিঘাটি চৌধুরী পরিবারের ছকুরাম কোম্পানীর আমলে বিত্তবান হয়েছিলেন। 'নরু' অর্থাৎ নরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি ছিল এগরায়, ইনি বহু ব্রহ্মোত্তর জমি দান করেছিলেন[৮]। কিশোরনগর রাজবংশের যাদবরামও কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন।

মহাশয় বংশের দুই শাখা এখন বালেশ্বর জেলার লক্ষণনাথ ও দেহুড়দা গ্রামে বসবাস করেন।

১৮. মহিষাদল রাজবংশ—মহিষাদল জমিদারী এক সময় এ জেলার ভেতর সব চেয়ে বড় জমিদারী ছিল। জনার্দন উপাধ্যায় ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। জাতিতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, আনুমানিক ষোল শতকে জনার্দন ব্যবসার জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এদিকে এসেছিলেন। সে সময় কল্যাণ রায় চৌধুরী ছিলেন এখানকার জমিদার। খাজনা আদায় করতে না পেরে তিনি জনার্দনের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। শেষে জনার্দনই এখানকার জমিদার হন।

রায় চৌধুরীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনশ্রুতি, বীরনারায়ণ রায় চৌধুরী মতান্তরে বড়িয়া এই বংশের আদি জমিদার। কল্যাণ তাঁর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। কংসাবতীর সাথে হলদীর নদীর সংযোগ সাধন করে যে খাল 'রায়খালী' নামে পরিচিত, সেটি কল্যাণ রায় চৌধুরীই কাটিয়েছিলেন। হৃদয়রাম ও উদয়রাম নামে এই বংশের আরও দুজন জমিদারের নাম শোনা যায়। 'হৃদয়রামের পুকুর', হৃদয়রামের ও 'উদয়রামের গড়' উদয়রামের স্মৃতিবহ।

জনার্দনের পর যথাক্রমে দুর্যোধন, রামনারায়ণ, রাজারাম ও শুকলাল উপাধ্যায় জমিদারীর অধিকারী হন। শুকলাল শুকলালপুর, শুকলালচক গ্রাম ও দীঘি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুর্শীদকুলি খাঁর সময় জলামুঠা, সুজামুঠা, মাজনামুঠা ও তমলুক জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ভার তার ওপর অর্পিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে (১৭৩৮), আনন্দলাল উপাধ্যায় জমিদার হন। সে সময় পার্শ্ববর্তী গুমগড়ের জমিদারীও তার অধিকারে আসে। গুমগড় চৌধুরী বংশের নারায়ণ চৌধুরী আরও এগারজন চৌধুরীর সাথে ষড়যন্ত্র করে স্থানীয় এক ব্যক্তির বহু সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন। ধরা পড়ার পর বারোটি গাধার

৮. ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত—প্রবোধচন্দ্র বসু

পিঠে চড়িয়ে তাদের প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল[৯]। সে ঘটনা 'বার চৌধুরীর বারোয়ারী' নামে সুপরিচিত। আনন্দপুর গ্রাম ও আনন্দলাল খাল আনন্দলালের কীর্তি। তিনি মারা যাবার পর (১৭৭০) স্ত্রী জানকী দেবী জমিদার হন। জানকীর মৃত্যু হয় ১৮০৪ সালে। মহিষাদলের নবরত্ন মন্দির (১৭৭৮), রামবাগের রামজীউ মন্দির ও দেউলপোতা গ্রামের গোপীনাথের মন্দির (১৭৮৮) জানকী দেবীর কীর্তি। সতেরোটি চূড়াবিশিষ্ট কাঠের রথটি রাজা মতিলালের অবদান। আনন্দলাল অপুত্রক ছিলেন।

পরবর্তীকালে গর্গেরা এই জমিদারীর অধিকারী হন। রঘুমোহন, ভবানীপ্রসাদ ও কাশীপ্রসাদ গর্গের পর জমিদার হন জগন্নাথ গর্গ (১৮০৭)। পুত্র রমানাথ গর্গ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিপ্রসাদ গর্গের সময় এরা রাজা উপাধিতে ভূষিত হন (১৮৯০)। তিনি অনেক স্কুল, টোল ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে গিয়েছিল।

১৯. নাড়াজোল রাজবংশ—উদয়নারায়ণ ঘোষ এই বংশের আদি পুরুষ। জাতিতে সদ্গোপ। আনুমানিক ষোল শতকে এই বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। উদয়নারায়ণের পর ক্রমান্বয়ে প্রতাপনারায়ণ, যোগেন্দ্রনারায়ণ, ভরতনারায়ণ, কার্তিকরাম, জয়মণি, শ্যামসিংহ, বলবন্ত, গুণবন্ত, মহেশচন্দ্র ও অভিরাম নাড়াজোল জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। নবাব সরকার থেকে কার্তিকরাম 'রায়' ও বলবন্ত 'খাঁন' উপাধি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এরা 'খাঁন' উপাধিই ব্যবহার করে আসছেন।

অভিরামের তিন পুত্র, যদুনাথ, সভারাম ও ত্রিলোচন। কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর তার দুই রাণী ত্রিলোচনের হাতে জমিদারী দেখাশুন করার ভার দেন। পরবর্তীকালে যদুনাথের পুত্র মতিরাম, সভারামের পুত্র সীতারাম ও ত্রিলোচনের পুত্র চুনীলাল কর্ণগড়ের জমিদারী দেখাশুনার ভার পেয়েছিলেন। সীতারামের পুত্র আনন্দলাল। রাণী শিরোমণি তাকে খুবই স্নেহ করতেন ও সমস্ত জমিদারীর এক দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন (১৮০০ খ্রী)।

আনন্দলালের সন্তান ছিল না। মৃত্যুর পর ছোটভাই মোহনলাল খাঁন

৯. Memoranda of Midnapore –H. V. Bayley.

জমিদার হন। মোহনলালের চার স্ত্রী ও ছটি পুত্র ছিল। মৃত্যুর পরে (১৮০৩) এক পুত্র অযোধ্যারাম জমিদার হন। অযোধ্যারামের সময় অনেক মামলা মোকদ্দমা বাধে। শেষ পর্যন্ত সব সামলে তিনি জমিদারী রক্ষা করতে সমর্থ হন।

অযোধ্যারামের পুত্র মহেন্দ্রলাল খাঁনের জন্ম ১৮৪৩ সালে। অনেকগুলি ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি ছিল। নিজেও কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন (১৮৮৭)। মৃত্যুর পরে (১৮৯২) নরেন্দ্রলাল জমিদার হন। রাজা উপাধি পান তিন বছর পরে (১৮৯৫)। নরেন্দ্রলালের পুত্র দেবেন্দ্রলাল খাঁন এ জেলার একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। দেবেন্দ্রলালের পুত্র অমরেন্দ্রলালের স্ত্রী শ্রীমতি অঞ্জলি খাঁন এক সময় বিধানসভার সদস্যা ছিলেন। বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা।

২০. জলামুঠা জমিদারী ও বাসুদেবপুর রাজবংশ—কৃষ্ণ পণ্ডা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫৮৪ থেকে ১৬০৮ সাল পর্যন্ত তিনি জমিদার ছিলেন। মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ চৌধুরী (১৬০৫—১৬৪৫) কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল (১৬৪৫-৮৫), হরিনারায়ণের পুত্র দিবাকর (১৬৮৫-৯৪), জমিদারী ভোগ করেন। এই বংশে যিনি জমিদার হতেন তিনি 'চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার করতেন। অন্য ভাইদের উপাধি থাকত বায।

দিবাকরের দুই পুত্র ছিল, রামচন্দ্র ও বিক্রমকিশোর। রামচন্দ্রের (১৬৯৪-১৭৩১) পুত্র না থাকায় ছোট ভাই বিক্রমকিশোরের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ জমিদার হন। তার সময় (১৭৬৭) মারাঠারা জলামুঠা অধিকার করে। পরে ইংরেজ অধিকারে আসে। ইংরেজরা এই বংশের সাথে জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। জমিদার হন বীরনারায়ণ। চৌধুরীর বদলে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। বীরনারায়ণের পর (১৭৯৭) তার পুত্র নরনারায়ণ রাজা হন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তার দুই স্ত্রীর এক স্ত্রী ও এক পুত্রকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর মামলা উপস্থিত হয়। পরবর্তীকালে এই জমিদারীও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

২১. ঝাড়গ্রাম রাজবংশ—ঝাড়গ্রাম রাজ্য প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের ভেতরে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মল্ল বংশীয় রাজাদের আধিপত্য কমে গেলে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ঝাড়গ্রাম এদের ভেতর একটি।

বীরবিক্রম মল্লদেব১ক এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঝাড়গ্রাম রাজধানী। তিনি কুলদেবী সাবিত্রীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ও পরবর্তী রাজারা ছিলেন বীর ও দানশীল। ফলে এরা 'উগালষণ্ডদেব' ও 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

ঝাড়গ্রাম ও চিয়াড়া পরগণা নিয়ে প্রধানত ছিল এই রাজ্য। ঝাড়গ্রাম পরগণা ছিল ১৭২ বর্গ মাইল ও চিয়াড়া ছিল প্রায় ২২ বর্গ মাইল। এ ছাড়া কংসাবতী, সুবর্ণরেখা ও বুড়াবলং নদীর তীরে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলি এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বংশের রাজা রঘুনাথ মল্ল, চণ্ডীচরণ মল্ল ও নরসিংহ মল্ল খ্যাতনামা। এদের দানধ্যানও প্রসিদ্ধ।

২২. জামবনী রাজবংশ ও ধলভূম জমিদারী—জামবনী রাজবংশ সিংহভূম জেলার ঘাটশীলার পুরনো রাজবংশের একটি শাখা। উত্তরাধিকার সূত্রে এরা ধলভূমের জমিদারীরও অধিকারী হয়েছিলেন। সিংহভূম জেলার পূব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে ধলভূম পরগণা গঠিত। ধলভূম রাজবংশের আদি পুরুষ জগদ্দেউ ধল রাজাকে পরাজিত করে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জাতিতে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। ধবলদেব উপাধি গ্রহণ করে ধলভূমের পাহাড়গুলির ভেতর সব থেকে উঁচু শিখরটির নাম রেখেছিলেন ধারাগিরি। সেখানে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজের নাম পরিবর্তিত করে রাখেন রাজা জগন্নাথ ধবলদেব। ধলভূমে আগে ধল বা ধোপা জাতীয় রাজারা রাজত্ব করতেন।

জগন্নাথ প্রবর্তিত বংশের রাজারা ক্রমান্বয়ে জগন্নাথ, রামচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ নাম গ্রহণ করতেন। কোন রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে অন্য বংশের সন্তান রাজ্যাধিকার পেলে এই প্রথার ব্যত্যয় ঘটত। ইংরেজ আমলে ঘাটশীলার রাজাদের সাথে ইংরেজদের বহুদিন ধরে সংগ্রাম চলেছিল।

ঘাটশীলার বিংশ রাজা জগন্নাথ ধবলদেবের ছয় ছেলে ছিল। এদের ভেতর জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র ধলভূমে প্রতিষ্ঠিত হন। চতুর্থ পুত্র কমলাকান্ত জামবনী রাজ্যের অধিকার লাভ করেছিলেন। এর আগে জামবনীর রাজা ছিলেন গোপীনাথ সিংহ মক্তাজ। গোপীনাথের কন্যা জগন্নাথ ধবলদেবের অন্যতম পত্নী ছিলেন।

১ ক. শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন সর্বেশ্বর মল্লদেব। সময় ১৫১৯ খ্রীঃ। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ২য় খণ্ড, ১৯৭৮।

এই রাজবংশ দীর্ঘকাল এ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে এসেছেন। এদের রাজধানী ছিল চিল্‌কিগড। এখনও পর্যন্ত রাজবংশধারা অবলুপ্ত হয়নি।

২৩. **রামগড় ও লালগড় রাজবংশ**—এই দুই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা একই বংশ সম্ভূত। জাতিতে ব্রহ্মভট্ট (ভাট)। গুণচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র দুই ভাই ছিলেন। আদি নিবাস মধ্যপ্রদেশের এটোয়া জেলা। জাতীয় ব্যবসা ছিল সংবাদ বহন ও দৌত্য কার্য। জনশ্রুতি, মেদিনীপুরের রাজবংশের কোন রাজকুমারের জন্ম সংবাদ রাজাকে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে রামগড় ও লালগড়ের জমিদারী এঁদের দান করেন[১০]। নবাবী আমলে আলিবর্দী রামগড় ও লালগড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে মারাঠা প্রতিরোধ শিবির স্থাপন করেছিলেন। সে সময়ে এখানে বাঘের উৎপাত ছিল। গুণচন্দ্র বাঘটিকে বধ করায় আলিবর্দী তাকে 'সিংহ সাহস রায়' ও উদয়চন্দ্রকে 'সাহস রায়' উপাধি দান করেছিলেন।

লালগড়ের অপর নাম শাঁকাকুলিয়া। উদয়চন্দ্রের পুত্র না থাকায় গুণচন্দ্রের দুই পুত্র দুই জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদারেরা যে বিদ্রোহ করেছিলেন তাতে এই দুই জমিদারও যোগ দিয়েছিলেন। পরে বশ্যতা স্বীকার করলে রামগড়ের জমিদার নন্দলাল সিংহ সাহস রায় ও লালগড়ের জমিদার রসিকনারায়ণ সাহস রায়ের সাথে কোম্পানীর বন্দোবস্ত হয়। এই জমিদার বংশের উত্তর পুরুষরা এখনও বর্তমান।

২৪. **খণ্ডরুই রাজবংশ ও তুর্কা জমিদারী**—খণ্ডরুই দাঁতন থানার অন্তর্গত তুর্কাচৌর পরগণায় অবস্থিত। একে তরকোল মহালও বলা হয় (আইন-ই-আকবরী)। কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্র এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জাতিতে মাহিষ্য। পুরী জেলার খুরদা মহকুমার রথীপুরে তার আদি নিবাস ছিল। বৃত্তিতে ছিলেন সৈনিক। ষোল শতকে কৃষ্ণদাস এখানকার রাজাকে পরাজিত করে রাজবংশের পত্তন করেন। পুরনো রাজবংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কৃষ্ণদাসের কিছুদিন পরে পর পর লালবিহারী, লোলবিহারী, যশোদানন্দন ও গঙ্গানারায়ণ জমিদার হন। গঙ্গানারায়ণ বহু টাকা ব্যয়ে বিরাট একটি দীঘি কাটিয়েছিলেন। পুত্র পঞ্চানন গজেন্দ্র মহাপাত্র সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজ কোম্পানীকে সাহায্য করেছিলেন। এই বংশের জমিদার কালীপ্রসন্ন ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর সমসাময়িক।

১০. Memoranda of Midnapore—H V. Bayley.

তুর্কাচৌর পরগণার ভেতর খণ্ডরুই জমিদার বংশের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়া কোতাইগড়ের চৌধুরী বংশেরও অধিকার ছিল। উভয় বংশের উত্তর পুরুষেরা এখনও জীবিত।

২৫. দাঁতন রাজবংশ—মোগলমারী যুদ্ধের সময় লছ্‌মীকান্ত সিংহ উত্তর রায় এদেশে আসেন। জাতিতে রাজপুত, মোগলবাহিনীর একজন সেনানায়ক ছিলেন তিনি। মোগলমারীর যুদ্ধেই বীরত্বের জন্য মোগল সরকার তাকে বীরবর উপাধি দিয়েছিলেন। এখানেই তিনি বসবাস সুরু করেন। বাসস্থানের নাম হয় উত্তর রায়বাড়। তিনিই দাঁতন জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা।

তার মৃত্যুর পর যথাক্রমে বসন্ত সিংহ, চাঁদরাম, ভগবান, মহেশ, কিশোর (১ম) ও রুদ্রনারায়ণ সিংহ জমিদার হন। এই বংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সুরেশচন্দ্র সিংহ সুপণ্ডিত ছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাকে 'সাহিত্যভূষণ' উপাধি দান করা হয়েছিল। এই বংশের উত্তর পুরুষেরা এখনও জীবিত।

২৬. পটাশপুর জমিদারী ও পঁচেটের চৌধুরী বংশ—চৌধুরী বংশ দেহাৎ গোকুলপুর মহালের জমিদার ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। ২য় মারাঠা যুদ্ধের পর (১৮০৩) যখন এই জমিদারী ইংরেজদের অধিকারে আসে, রেণুকা দেবী চৌধুরানীর সাথে কোম্পানীর বন্দোবস্ত হয়। এই বংশ জাতিতে ছিলেন করণ। এখন ও এই বংশের উত্তরপুরুষেরা জীবিত।

২৭ মলিঘাটির চৌধুরী বংশ—কুতুবপুর ও মহাকালঘাট আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত দুটি মহাল। কুতুবপুরের প্রাচীন জমিদারদের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই পরগণার মলিঘাটির চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ ঘাটাল মহকুমার রাধানগর গ্রাম থেকে এসে মলিঘাটিতে (ডেবরা থানা) বসবাস সুরু করেন। মীরকাশিম যখন চাকলা মেদিনীপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করেন তখন মলিঘাটির জমিদার ছিলেন ছকুরাম চৌধুরী। মারাঠা দমনে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 'বিত্তে ছকু' প্রবাদটি এই কারণে চালু হয়েছিল। সম্পত্তি নিয়ে এই বংশের দুই সন্তান গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণমোহন চৌধুরীর ভেতর যে মামলা বাধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় তা মিটে জমিদারী দুই ভাগে ভাগ হয়।

২৮ বালিসাহীর ভুঁইয়া বংশ—আইন-ই-আকবরীতে বালিসাহী মহালের নাম আছে। পরবর্তীকালে এই মহাল কালিন্দী বালিসাহী ও উড়িয়া

বালিসাহী দুটি পরগণায় ভাগ হয়ে যায়। উড়িষ্যা বালিসাহীই প্রধানত বালিসাহী নামে পরিচিত। এখানকার সর্দারেরা ছিলেন খণ্ডুইত জাতীয়। বিশ্বনাথ দাস সেই সর্দারদের তাড়িয়ে এখানে জমিদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তার আদি নিবাস ছিল কটকের বালিবিশু। উড়িষ্যার রাজা তাকে চৌধুরী উপাধি দান করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এরা ছিলেন সদর কানুনগোর সহকারী। পদের নাম ছিল বিলায়তি কানুনগো। নবাবী আমলে সৃষ্টি হয় পদটির[১১]। এদের অধস্তন যারা থাকতেন তাদের বলা হত কানুনগো।

বিশ্বনাথের[১২] পর থেকে অধস্তন অষ্টমপুরুষ পদ্মনাভ পর্যন্ত প্রত্যেকের জ্যেষ্ঠপুত্র জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। পদ্মনাভের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্রের ভেতর জমিদারী নিয়ে গোলমাল বাধে। পরে সম্পত্তি দুভাগে ভাগ হয়। আরও পরে যখন জমিদারী নিয়ে গোলমাল আদালত পর্যন্ত গড়ায় তখন শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠাধিকার সাব্যস্ত হয়। এই বংশের কুড়িজন জমিদারের নাম ১৮০৮ সালের পূর্ব থেকে পাওয়া যায়। মোগলমারীর যুদ্ধের সময় ভুঁইয়া জগদীশচন্দ্র মোগলদের সাহায্য করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। মারাঠা অধিকারের পর তাদের বশ্যতা স্বীকার করলে তারা এই বংশকে 'বলিয়ার সিংহ' উপাধি দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে গিয়েছিল।

২৯. বেলেবেড়িয়ার প্রহরাজ বংশ—বেলেবেড়িয়া জমিদারী এ জেলার জঙ্গলখণ্ডে অবস্থিত ছিল। নিমাইচাঁদ প্রহরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উড়িষ্যা থেকে এসে এখানে বসবাস সুরু করেছিলেন। তখন ঝাড়গ্রামের রাজা ছিলেন সংসার মল্ল। নিমাইচাঁদ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। জনশ্রুতি, রাজা তাকে বলেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে এক প্রহরের ভেতর তিনি যতখানি ঘুরতে পারবেন, সেই সমস্ত অঞ্চল তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। নিমাইচাঁদ পাথরা গ্রাম থেকে সুরু করে জহরপুর পর্যন্ত ঘুরে এলে রাজা তাকে প্রহরাজ উপাধি ও ওই সমস্ত অঞ্চলের অধিকার ছেড়ে দেন। চুয়াড় বিদ্রোহের সময়

১১. A. Statistical Account of Cuttuck – Vol-XVIII – W. W. Hunter

১২. ভুঁইয়া বংশের আদি পুরুষের নাম বেলী সাহেব লিখেছেন হাজুলী দেখর (Memoranda of Midnapore), হান্টার সাহেব লিখেছেন হাজুলী বৃঠিশক (A. S. A. of B Vol—III)। যোগেশচন্দ্র মনে করেন ওড়িয়া ভাষায় লেখা বিলায়তি বিশ্বনাথ লিপি প্রমাদে উক্ত নামে লিখিত হয়েছে।

এই বংশ জমিদারীর সীমানা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই বংশের নবম প্রহরাজ গোবর্ধন, চতুর্দশ গোবিন্দরাম ও অষ্টাদশ জগন্নাথ প্রহরাজ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের কৃষ্ণচন্দ্র দাস 'রায় বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন।

৩০. বনপাটনার সৎপথী বংশ—দিগপারুই, কিসমৎ নারায়ণ গড, তপ্পে কেশিয়াড়ী প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে বনপাটনার সৎপথী বংশের জমিদারী গঠিত ছিল। এই বংশের আদিপুরুষ উড়িষ্যার শ্রীরামচন্দ্রপুর (বিরামপুর শাসন) থেকে এসে ডেবরা থানার ধামতোড়ে বসবাস সুরু করেছিলেন। এই বংশের নারায়ণ সৎপথী ধামতোড় থেকে বনপাটনায় বাসস্থান স্থাপন করেন। জাতিতে এরা উৎকল ব্রাহ্মণ। ১৯১৭ সালে এই বংশের জমিদার ছিলেন গজেন্দ্রনারায়ণ। ইংরেজ সরকার তাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল সৎপথী বংশ এখানে জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন।

৩১. গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশ—রোহিনী রাজবংশ এ জেলার একটি প্রাচীন রাজবংশ। হিন্দু রাজত্বের সময় থেকেই এই বংশ এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন রাজা অচ্যুতানন্দ, মাতা রাণী ভবানী। রসিকানন্দ সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোপীবল্লভ রায়কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর (১৬৫২) এই বংশ রোহিনী রাজবংশের পরিবর্তে গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশ রূপেই পরিচিত হয়।

যদিও জাতিতে করণ, এই বংশের অসংখ্য শিষ্যের ভেতর অনেক ব্রাহ্মণও আছেন। এই বংশের উত্তর পুরুষেরা এখনও গোস্বামী পদে অধিষ্ঠিত।

৩২ হিজলীর তাঁজ খাঁ মসনদ-ই-আলার বংশ—তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা নামে জনৈক আফগান মুসলমান হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত ১৫০৫ থেকে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ভেতর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[১৩]। হুসেন শাহ যখন বাংলার নবাব উড়িষ্যার সীমায় লবন সমুদ্রের ধারে চণ্ডীভেটীতে মনসুর ভুঁইয়া নামে একজন ক্ষমতাশালী মুসলমান বাস করতেন। জমাল ও রহমত নামে তার দুই ছেলে ছিল। রহমতকে হত্যা করে জমাল সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করতে উদ্যত জেনে রহমত হিজলীতে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

১৩. Crommelin's letter dated 13.10.1812
মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছেন, তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ১৬২৮—১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।—(হিজলীর মসনদ-ই-আলা, পৃঃ ৭৬)

সে সময় চাঁদ খাঁ নামে জনৈক বণিকের সাথে তার পরিচয় হয়। চাঁদ খাঁ রহমতকে কিছু টাকাকড়ি দিলে তিনি হিজলীর বনজঙ্গল কেটে জনপদে পরিণত করেন। দুর্গও তৈরি করান। কটকে গিয়ে এ অঞ্চলের জমিদারী সনদ লাভ করার পর ইখতিয়ার খাঁ নাম নিয়ে জমিদার হন। ইখতিয়ারের পুত্র দাউদ খাঁ ছিলেন তাজ খাঁর পিতা। ইখতিয়ারের জীবিত কালেই দাউদের মৃত্যু হয়। ইখতিয়ারের মৃত্যুর পর জমিদার হন তাঁজ খাঁ। ভীমসেন মহাপাত্র ছিলেন তাঁর কর্মচারী।

সিকান্দর নামে তাজ খাঁর এক বিক্রমশালী ভাই ছিলেন। ষড়যন্ত্রের ফলে তার মৃত্যু হলে তাঁজ খাঁর সংসার বৈরাগ্য দেখা দেয়। অমশী—কশবার হজরত মখদুম শাহ চিশতির কাছে তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। পরে হিজলী মসজিদের সামনে হুজরার ভেতর তপস্যামগ্ন হয়ে সমাধি প্রাপ্ত হন। মতান্তরে বালিয়াড়ির উপর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বাহাদুর খাঁ হিজলী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁজ খাঁর জামাই জইল খাঁর ষড়যন্ত্রে শেষে তিনি রাজ্যচ্যুত (১৫৬৪) ও বন্দী হন। রাজ্য জইল খাঁর অধিকারে যায়। পরে আবার বাহাদুর খাঁ রাজ্য ফিরে পান (১৫৭৪)। বাহাদুরের মৃত্যুর পর তার দুই কর্মচারী ঈশ্বরী পট্টনায়েক ও কৃষ্ণ পণ্ডা হিজলী রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর অধিকারী হন।

তাজ খাঁ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাকে পীর বলে মনে করেন। হিজলীর মসজিদটি তাজ খাঁর স্মৃতি বিজড়িত থাকায় আজও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে তীর্থক্ষেত্র।

৩৩. **মল্লিক বাগ ও নন্দী বংশ**—ইংরেজ আমলে কিছু পরিবার ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। প্রাচীন জমিদারদের অনেকেরই তখন লুপ্ত ঐশ্বর্য। ফলে এইসব জমিদারী তারা কিনে নিয়ে নতুন জমিদার বংশের পত্তন করেন। এই জমিদার এবং অর্থশালী পরিবারগুলির ভেতর মাজনামুঠার কার্তিকচন্দ্র মিত্র, ভুবনেশ্বর মিত্র ও ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর সহরের শিববাজার নিবাসী জন্মেজয় মল্লিক, ডেবরা থানার পলাশী গ্রামের নন্দী বংশ এবং আনন্দপুরের বাগ বংশ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী তিনটি বংশ জাতিতে ছিলেন যথাক্রমে তাম্বুলী, তিলী ও তাঁতী।

৩৪. **তালুকদার বংশ**—জমিদার ছাড়াও কয়েকটি তালুকদার বংশ এ জেলায় বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এদের ভেতর কোন কোন বংশ খুবই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিলেন, কোন কোন বংশ দরিদ্র বা বিলুপ্ত হয়েছেন। যেসব স্থানে বংশগুলি অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য—জাড়া, ক্ষীরপাই, গোয়ালতোড, পাথরা, ভদ্রকালী, মুকুন্দপুর, রাধানগর, রাজবল্লভ, পিংলা, রামজীবনপুর, রাজগড, ঝাট্‌লা, সাউরী, সবং, বেলকী, ভেমুয়া, সারতা. গড়মোহনপুর, মাণিককুণ্ড, গড়কৃষ্ণপুর, নৈপুর, পাঁচরোল, বেতা মহেশপুর, হাসিমপুর, ধুমর্ধা, অমর্শী, কুড়াই, কেলোমাল, কলাগ্রাম, ও ইড়াপালা।

৩৫. প্রাচীন জমিদারীগুলি বিলুপ্ত ও বিক্রী হবার পর এ জেলার বাইরে যে সব অধিবাসী সেগুলি কিনে নেন বা স্বত্বভোগী হন, তাদের ভেতর মুর্শিদাবাদের নবাব, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কলকাতার লাহা, শীল ও ঠাকুর পরিবার, উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের গোস্বামী ও তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়, বালেশ্বরের বৈকুণ্ঠ দেব, ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, বর্ধমানের বনবিহারী কপূরের বংশধর এবং ইউরোপীয়ানদের নিয়ে গঠিত মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী প্রধান।

উৎস—১. মেদিনীপুরের ইতিহাস (১ম ও ২য় ভাগ)—যোগেশচন্দ্র বসু

২. Memoranda of Midnapore (1852)—H V, Bayley.

৩. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী (২য় ভাগ)

৪. District Gazetteer, Midnapore (1911)—L. S. S. O' Malley.

৫. District Handbooks—Midnapore (1951)—A. Mitra I C. S.

৬. লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

শিক্ষা

ক. প্রাথমিক শিক্ষা—জেলা পরিদর্শক (প্রাথমিক স্কুল), দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। প্রাথমিক শিক্ষা জেলায় ৮৬টি সার্কেলে বিভক্ত। ডেপুটি এসিস্টাণ্ট ইনস্পেকটর ও সাব ইনস্পেকটর অব স্কুলস সার্কেলগুলি তত্ত্বাবধান করেন। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা—৬,৫৭৯ ; সহরাঞ্চলে—২২৭ ছাত্রসংখ্যা ; গ্রামাঞ্চলে—৭,০১,৭৫৪ সহরাঞ্চলে—৪২,৫২৭। শিক্ষকের সংখ্যা ; গ্রামাঞ্চলে—১৯,৭০০ সহরাঞ্চলে—১০৬৫।

জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান—৫ ; শরীর শিক্ষা স্কুল—১।

খ. মাধ্যমিক শিক্ষা—জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক স্কুল), দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। ছেলেদের মাধ্যমিক স্কুল জেলায়—১০৯৭, মেয়েদের—১২৩।

মোট ছাত্র—৩,৭৭,৭৪৯। ছেলে—২,৮১,২৬৭, মেয়ে—৯৩,৬৮২। হাইস্কুল ছেলে—৫৮৬, মেয়েদের—৯০ ; হাই মাদ্রাসা—৮ ; ৪—শ্রেণী জুনিয়ার স্কুল, ছেলে—৩১৩, মেয়েদের—১১০, মাদ্রাসা—৫ ; ২—ক্লাস জুনিয়ার স্কুল, ছেলে—১৮০, মেয়েদের—২৩, মাদ্রাসা—২। মোট শিক্ষকের সংখ্যা—১৩.৪০০।

গ. কলেজ শিক্ষা—জেলায় কলেজ—৪০ ; শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ—৫ আই. আই. টি—১

ঘ. সমাজ শিক্ষা—জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক, দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র—১৬০ (পুরুষ নারী সহ), কৃষকদের কার্যকরী সাক্ষরতা কেন্দ্র—৬০, বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়—৪ (মেদিনীপুর, ঘাটাল, তমলুক ও খড়্গপুর)।

জেলা গ্রন্থাগার—১, মহকুমা গ্রন্থাগার—৩, সহর গ্রন্থাগার—১, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—১ গ্রামীণ গ্রন্থাগার—৬৮

ঙ. জেলা আধিকারিক শারীর শিক্ষা ও যুব কল্যাণ দপ্তর, মেদিনীপুর সহর।

চ. নেহরু যুবক কেন্দ্র—সংগঠক ; দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। স্বয়ং নিয়োগ সংস্থা—২৩ কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র—১০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র—৩৮ ছাত্র সমবায় বিপনী—৪ ক্লাব—৩১০ পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার—১৩।

উৎস—জেলা শাসক, মেদিনীপুর (১৬.১২.১৯৭৭

কৃষি ও সেচ

ক. কৃষি জমির প্রকৃতি—ভূপ্রকৃতি অনুসারে দুভাগে বিভক্ত হলেও মাটির উপাদান অনুসারে কৃষি জমি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। (১) ল্যাটারাইট বা পাথুরে অঞ্চল—সদর (উত্তর) মহকুমার ডেবরা ও কেশপুর থানা বাদে সমগ্র অঞ্চল, সদর (দক্ষিণ) মহকুমার কিছু অঞ্চল ও সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমা। (২) পলি গঠিত মধ্যাঞ্চল—ঘাটাল মহকুমা, কাঁথি মহকুমার কিছু অংশ, তমলুক মহকুমার কিছু অংশ, সদর (দক্ষিণ) মহকুমার ডেবরা ও কেশপুর থানা। (৩) দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রোপকূল।

খ. মোট কৃষি এলাকা—২০·৭ লক্ষ একর। দোফসলী এলাকা—৪·২৭ লক্ষ একর। সেচ প্রাপ্ত এলাকা—৩·৬০ লক্ষ একর।

গ কৃষি প্রশাসন—(১) যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা বা জয়েণ্ট ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার—সমগ্র জেলার কৃষি কাজের তত্ত্বাবধায়ক। দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। (২) কৃষি জেলা দুটি—(ক) মেদিনীপুর পশ্চিম কৃষি জেলা—সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা নিয়ে গঠিত। দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। (খ) মেদিনীপুর পূর্ব কৃষি জেলা—তমলুক, ঘাটাল ও কাঁথি মহকুমা নিয়ে গঠিত। দপ্তর, তমলুক সহর।

কৃষি জেলার সর্বময় কর্তা—মুখ্য কৃষি আধিকারিক বা প্রিন্সিপাল এগ্রিকালচারাল অফিসার। প্রতিটি মহকুমায় একজন করে মহকুমা কৃষি আধিকারিক এবং ব্লক পর্যায়ে একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক।

ঘ. কৃষি গবেষণা কেন্দ্র—(১) ভূমি সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র—ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় নির্ধারণ মূল কাজ। অবস্থান, মেদিনীপুর সহর। (২) মাটি পরীক্ষা গবেষণাগার বা সয়েল টেস্‌টিং সার্ভিস—পঁচিশ হাজার নমুনা নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন। এলাকা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা। অবস্থান, মেদিনীপুর সহর।

ঙ. কৃষি প্রকল্প—(১) ড্রট প্রোন এরিয়া প্রোগ্রাম (ডি. পি. এ. পি.) —খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের মাধ্যমে চাষযোগ্য করা মূল কাজ। দপ্তর ঝাড়গ্রাম সহর। (২) কম্‌প্রিহেন্‌সিভ্ এরিয়া ডেভলপ্‌মেণ্ট প্রোগ্রাম (সি. এ. ডি. পি) নির্দিষ্ট এলাকায় দরিদ্র শ্রেণীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। দপ্তর, তমলুক ও ডেবরা। (৩) কমাণ্ড এরিয়া ডেভলপ্‌মেণ্ট প্রোগ্রাম—

বৃহত্তর পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা। এ জেলায় কংসাবতী প্রকল্প। দপ্তর, বাঁকুড়ায় (৪) স্পেশাল এগ্রিকালচারাল স্কীম, গোপীবল্লভপুর—গোপীবল্লভপুর—১ ব্লক ও নয়াগ্রাম থানা এলাকা জেলার অন্যান্য অঞ্চলের সাথে দুরধিগম্য হওয়ায় উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প। (৫) ইন্দো জারমান ফার্টিলাইজার এডুকেশনাল প্রজেক্ট (আই. জি. এফ. ই. পি.)—২৭০ টি গ্রাম বেছে নিয়ে সার প্রয়োগে কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলা।

উৎস—১. মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মেদিনীপুর পশ্চিম ও পূর্ব জেলা

২. জেলা শাসক, মেদিনীপুর (১৬, ১২, ১৯৭৭)

কৃষি ও সেচ

জেলায় বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্প

	প্রকল্পের নাম	বড/মাঝারি	অবস্থান	সেচ এলাকা	ভবিষ্যত সেচ এলাকা
১.	মেদিনীপুর ক্যানেল সিস্টেম (১৮৮৪)	বড	মেদিনীপুর	৯৫ হাজার একব	—
২.	কংসাবতী প্রজেক্ট	বড	মেদিনীপুর	৪০ হাজার একর	১.১৭ লক্ষ একর
৩.	ঝাডগ্রাম সেচ প্রকল্প (১৮৪৯)	ছোট	ঝাডগ্রাম	১৫ হাজার একর	—
৪.	পুতরজি ক্যানেল প্রজেক্ট	ছোট	ঝাডগ্রাম	১৫ হাজার একর	—
৫.	হিজলী ক্যানেল প্রজেক্ট	ছোট	কাঁথি	১০ হাজার একর	—

উৎস—Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—Department of Economic studies, U. B. I. (1971)

জেলার প্রধান ফসলের ভেতর জমির ভাগাভাগি

(হাজার একর)

১. আউশ— ১৪৩·৩২	৪. গম— ৮০·০৫
২. আমন—১৮৬৭·৩৬	৫, আলু—৩৭·৭২
৩. বোরো— ১৩৫·৭৮	৬· পাট—১৮·৮৮

উৎস—জেলা শাসক, মেদিনীপুর (১৬, ১২, ১৯৭৭)

মেদিনীপুরে বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির গঠন ও উপাদান

	কোথাকার মাটি	জলের ভাগ	জৈব পদার্থ	দ্রবণের ফলে ক্ষয়ক্ষতি	মোটাবালি
১.	উপকূল ভাগে	২·০৬	২·৮৩	৫·৭২	১৭·৮২
২.	বিরামপুট	২·০১	১·২৯	২·৭৮	·৭২
৩	ফরিদপুর (মেদিনীপুর)	১ ২০	২ ৮২	১·৯৮	·৫২
৪.	কাঁথি	১ ৮১	১·০১	১·২৮	৩৬·৮২

	কোথাকার মাটি	সরু বালি	পলি	কাদার ভাগ	পি. এইচ	প্রকৃতি
১.	উপকূলভাগে	১৬·৭৮	৪৯·৫০	৩·৬১	৪·৬৩	বেলে (Sandy)
২.	বিরামপুট	৪৭·০৮	২৪·১২	২০·০২	৬·০২	বেলে দোঁয়াশ (Sandy Loam)
৩.	ফরিদপুর (মেদিনীপুর)	২৫·৮০	৪২·৫২	২৩·৪১	৭·০২	দোঁয়াশ (Loam)
৪.	কাঁথি	২৩·৭২	২৫·৮০	৮·৬৮	৫ ৭২	বেলে (Sandy)

উৎস—District Handbook, Midnapore. 1951—Ed, A Mitra. I. C. S. (1953)

চাষ জমির পরিমাণ ও দখলকারী গৃহস্থ

	সব জমি মিলিয়ে পরিমাণ	১ একরের কম	১-২ একর	২ ৪-৪'৯ একর	৫-৭'৫ একর	৭'৫-৯'৯ একর
মোট গৃহস্থ	১০৫,১৫৩	২২,৯৭০	৩৭,১৭১	২৫,১৩৮	১০,৫১৪	৬,৫৫৭
পুরুষ	১৪৪,০১২	২৩,৮৮৬	৪৬,৫৫৭	৩৮,০১১	১৮,২৮২	৬,৮০১
নারী	২৭,৩৬৫	৪,৯৬০	১০,৫৭৫	৭,২২৬	২,৬৮৯	৮৩০
ভাড়া করা মজুর	৬৫,৫৮৯	৭৩০	৪,২১০	৮,০৬৫	৭,৪৬২	৪,১০২

	১০-১২'৪	১২'৫-১৪'৯	১৫-২৯'৯	৩০-৪৯'৯	৫০ ঊর্ধ্ব	অন্যান্য
মোট গৃহস্থ	২,৪২৮	৮৫৬	১,৭৭৫	৭৩	৩৬	৬৩৫
পুরুষ	৪,৫৭৪	১,৭৬৫	৩,৩২৪	১২০	৪৯	৭৪৩
নারী	৫৫০	১৮৭	৩৯৩	১২	১১	২২২
ভাড়া করা মজুর	৩,৯৯১	১,৬৭৩	৫,০৩৬	১২৪	৫৭	৪২

উৎস—District Census Handbook, 1961

কৃষি ও সেচ

সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) মহকুমা

	ব্লক	এলাকা (বর্গমাইল একর)	প্রধান ফসলের উৎপাদন (কুইন্টাল)	এক ফসল (একর)	একাধিক ফসল (একর)	সেচপ্রাপ্ত এলাকা (একর)	বনাঞ্চল (একর)	গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)
১.	মেদিনীপুর	১৩০·১	২,১৭,০৮১	৬২,৫১৯	২,২৮৭	১,৭৬৪	১৫,০০০	৬৬·০০
২.	খড়্গাপুর-১	১২০·৯	২,৫৪,৫২০	৪৭,৮৩০	৩,৬২২	১,৯৪৫	৭,৪১৫	৬৬·১৫
৩.	খড়্গাপুর-২	১০৬·০	১,৭৪,০৫০	৫২,৮২১	৬,৮১৬	৩৫,৪৬০	—	৬৭·৫০
৪.	সবং	১২৫ ৪	১,৭৪,৯২৭	৬৩,৪৫৬	৮,৬৫৩	৪,৪৭০	২,০৮৩	৬৭·০০
৫.	পিংলা	৮৬·৩	৩,২৯,৩৮১	৪১,৮০০	৩,০০০	১৬,১৪০	—	৬৭·১৫
৬.	নারায়ণগড়	১৯৪·৬	৫,৫৭,৭৬০	৮৭,০৫০	২,০৫০	১,৯০০	—	৬৬·১২
৭.	কেশিয়াড়ী	১১৪ ৫	৩,৭২,৮৫২	৫০,৮০০	১,৫০০	৯৭৬	৫,৮৪৪	৬৫·০০
৮.	দাঁতন-১	৯৮·৫	৩,০৫,৫০৫	৫০,৪২০	১,৫৫০	৪০০	—	৬৬·১৭
৯.	দাঁতন-২	৭২·২	২,৬১,৫৫৫	৩৬,৬১৩	৩৫	২৩৫	—	৬৬·০০
১০.	মোহনপুর	৫৪·৩	১,০৬,৬২৩	২৫,৪০০	৩৫	৮৫	—	৬৫·১৫
১১.	শালবনী	২১৩·৩	৪,৬৭,৬৭৯	৪৬,৬৫৬	৩,০০০	৭,১৬০	৫২,৯৭০	৬৫·১৭
১২.	কেশপুর	১৮৫·৯	৪,৫৫,৩৭২	৮৬,৯১৫	২,০০০	১,০০০	৭৪৬	৬৭·১৫
১৩.	ডেবরা	১৩২·২	৪,৬২,৭০৬	৭০,৩০০	১,৫৯১	৮২,৮২০	—	৬৭·০০

	ব্লক	এলাকা (বর্গমাইল একর)	প্রধান ফসলের উৎপাদন (কুইন্টাল)	এক ফসল (একর)	একাধিক ফসল (একর)	সেচপ্রাপ্ত এলাকা (একর)	বনাঞ্চল (একর)	গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)
১৪.	গড়বেতা-১	১৪৩'৫	৪,২৯,১৬৫	৪৭,৫০৩	৩,৩১০	৩,০০০	—	৬৬'৭৫
১৫.	গড়বেতা-২	১৩৩'৫	২,৫০,৫০০	৪৪,৫০৩	৩,৩১০	—	—	৬৬'৭৫
১৬.	গড়বেতা-৩	১২২'৭	২,৩৯,১৮৫	২৬,১০৯	৭৮৯	—	১৫,৩৪১	৬৬'৭৪
	ঝাড়গ্রাম মহকুমা							
১৭.	ঝাড়গ্রাম	২০৮'৩	৪,০৬,০১৬	৪২,২৯৩	৬,৭৫০	১০,৫০০	৩৪,২০০	৭২'১৫
১৮.	নয়াগ্রাম	১৯৫'২	৪,০৫,৮০৯	৭৫,৭৫৭	১,০০০	৫০০	৩৯,৯২৫	৭২'১৫
১৯.	সাঁকরাইল	১০৬'৪	১,৭৬,৩৮০	৪০,৮৫০	৫,০০০	৭১২	৫,৫০০	৭২'১৭
২০.	জামবনী	১২৬'১	৩,২৯,০৭৩	৫৩,১২৮	৭৯৭	৮৮২	২৪,৩৬৫	৭১'৯৫
২১.	বিনপুর-১	১৪০'১	১,৭৪,০৫৮	৪৭,৪৭৫	৪,৪৭৪	৭,৩৬১	২৩,৬৭১	৭১'৮৫
২২.	বিনপুর-২	২২৪'৯	২,৮৮,৭৭৫	৩১,৮০০	১২,৫০০	৮৬৫	৪৫,৬০০	৭১'১৩
২৩.	গোপীবল্লভপুর-১	১০৭'০	১,৩২,৮৫০	৩৯,৩২২	১০,২০০	১,০৬০	১৪,৪৩৬	৭২'৬১
২৪.	গোপীবল্লভপুর-২	৭৭'৯	২,১৬,৮৭৭	২৯,৪৫৫	৫,৪৯৮	১,৫৫৬	১,০৩১	৭২'০৯
	ঘাটাল মহকুমা							
২৫.	ঘাটাল	৮৯'০	৪,৫৬,০০১	৪০,৭৮৯	১৬,৯২০	৮,৭০০	অ.	৫৮.০০

	ব্লক	এলাকা (বর্গমাইল একর)	প্রধান ফসলের উৎপাদন (কুইন্টাল)	এক ফসল (একর)	একাধিক ফসল (একর)	সেচপ্রাপ্ত এলাকা (একর)	বনাঞ্চল (একর)	গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)
২৬.	চন্দ্রকোণা-১	৮২·৭	৯,৩০,০৭৯	৪১,০৫৮	২,৫৪৫	২,৯৬১	অ.	৫৮·০১
২৭.	চন্দ্রকোণা-২	৬১·৮	১,৪৫,২৯৮	৩৭,২৫৯	২,২৪৯	১,৯০৫	অ.	৫৭·০২
২৮.	দাসপুর-১	৬৪·৩	১,৭৩,৭৯৮	২৮,১৯৪	১১,৪৮৫	২,৮৯৩	অ.	৫৭·০২
২৯.	দাসপুর-২	৬৩ ০	২,০৫,৪৬৬	২৮,৮০১	৯,৭৮৩	১১,৭৯৫	অ.	৫৭·০০
	কাঁথি মহকুমা							
৩০.	কাঁথি-১	৬৪·৩	১,৯৮,৩২৭	৩৩,২১৫	৭,৯৩১	৩,০০০	৪	৭২·১৭
৩১.	কাঁথি-২	৭১·৭	১,২২,০১০	৩৫,৫০৩	১০,০৪৫	২.৭০৯	—	৭২·১৭
৩২.	কাঁথি-৩	৬০·০	১,০৭,৫৪২	৩৬,২৬০	১,৭২৯	৪০০	—	৭২·১৭
৩৩.	রামনগর-১	৫১·৪	১,৪৯,০০০	৩১,৫০০	৯৫৫	১,১৫০	২,৪৬০	৭৩ ০০
৩৪.	রামনগর-২	৬২·৮	১,৩১,৩২১	৩৮,৯৬২	৮১৪	২,৫৩৫	—	৭৩·০০
৩৫,	ভগবানপুর-১	৬৯·৫	১,৩৪,৫০১	৩৬,৮১৯	৬,৩০৫	২,৯১৫	—	৭২·১৫
৩৬.	ভগবানপুর-২	৬৯·২	১,৪৬,৩০২	৩৭,০০৬	৩,৮২৯	—	—	৭২·১৪
৩৭.	এগরা-১	৮৩ ০	১,৩৫,২৫০	৭০,৯৫৬	১২,৪৬৭	১৯২	৫৫০	৭২·০৫
৩৮.	এগরা-২	৭২·৬	১,৫২,৬০৯	৪২,০৫৩	১,২৪০	৪,০২৫	৬৭২	৭২·০৬
৩৯.	খেজুরী	১৬৪·৮	১,২৫,০৬৮	৯৯,৯৮৬	২,৯২৬	৩,৫৮৭	৫,২১৬	৭২·০০
৪০.	পটাশপুর	১৩৮·২	১৭,৬৮,৭২৯	৬৫,২০৪	১২,৪৫৬	২,৩৪৫	২,৫০০	৭২·৫০

ব্লক	এলাকা (বর্গমাইল একর)	প্রধান ফসলের উৎপাদন (কুইণ্টাল)	এক ফসল (একর)	একাধিক ফসল (একর)	সেচপ্রাপ্ত এলাকা (একর)	বনাঞ্চল (একর)	গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি)
তমলুক মহকুমা							
৪১. তমলুক-১	৪৮·১	১,৫৯,২৬০	২৮,৫৫৪	৩,২৫৪	—	অ.	৮৪·২৪
৪২. তমলুক ২	৫৬০	২,১৬,২০০	১৬০১১	৪,০৮০	—	অ	৮৪·০০
৪৩. পাঁশকুড়া-১	৯৫·০	১,৭০,৪০০	৪৬,১৬০	৮,৩৬৯	১২,০৮৮	অ.	৮৪·০১
৪৪. পাঁশকুড়া-২	৫৯০	২ ৫৭,৬৬৭	২৭,১০২	৮,২৭১	১৬,৮৩৮	অ.	৮৩·৯৯
৪৫. মহিষাদল-১	৬৪·১	১ ৫৭,৩৫০	৩৬,৯০০	২,১৬০	১৫,০০০	অ.	৮৩·৯৭
৪৬. মহিষাদল-২	৫৪ ৭	১,৭৩,১০০	৩০,০৩৯	২,৪৩৭	৬,১৪৪	অ	৮৪ ০০
৪৭. সুতাহাটা ১	৫২·৫	১,৩৮,২৭৫	২৩,৫৩৯	১,৭৩৭	—	অ.	৮৪·২৪
৪৮. সুতাহাটা-২	৭৪ -	—	২৩,০৬০	৩,৯২৪	২ ০	অ.	৮৪·২১
৪৯. নন্দীগ্রাম-১	৬৯ ১	১,৪৬,৩৫২	৩৪,১৬০	২,৩৩২	৭০০	অ.	৮৩·৯৮
৫০. নন্দীগ্রাম-২	৭২·০	১,৪৫,১৪২	২৭,৭৮৩	২,১৭০	২,৩৮২	অ	৮৪·২০
৫১. নন্দীগ্রাম-৩	৫৩ ০	১,৬৩,০৭৯	৩২,০৯৫	১ ০৫৭	১,৮০০	অ.	৮৩·৯১
৫২ ময়না	৫৭ ৩	১,৭২,৫২৪	২৭,৭৫৪	৯,০৫৪	৪৭৭	অ.	৮৪ ২০

উৎস : Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—Department of Economic Studies, UBI

(১৯৬৯-৭০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত)

অ—তথ্য অজ্ঞাত।

বনাঞ্চল

মেদিনীপুর জেলার মোট বনাঞ্চল ৬৫১ বর্গ মাইল। দুটি বিভাগে বিভক্ত ;

(১) পশ্চিম মেদিনীপুর বিভাগ—ঝাড়গ্রাম মহকুমার সমগ্র বনাঞ্চল ও সদর মহকুমার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এলাকা, ৩৫০ বর্গ মাইল। সদর দপ্তর, ঝাড়গ্রাম সহর।

(২) পূর্ব মেদিনীপুর বিভাগ—জেলার অবশিষ্ট বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এলাকা, ৩০১ বর্গ মাইল। সদর দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। এ ছাড়া আরও দুটি বিভাগ আছে ; (১) সিলভিকালচার বিভাগ (দক্ষিণ)—মূল কাজ গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা। দপ্তর, মেদিনীপুর সহর। (২) ওয়ার্কিং প্ল্যান বিভাগ (দক্ষিণ—১) মেদিনীপুর সহ দক্ষিণ বঙ্গের বনাঞ্চল সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও পরিচালনা মূল কাজ। দপ্তর, মেদিনীপুর সহর।

জেলার বনাঞ্চল (হেক্টরে)

সাল	ভৌগোলিক ক্ষেত্র	মোট কৃষি জমি (বনাঞ্চলে)	ভৌগোলিক ক্ষেত্রের সাথে ৩-এর সম্বন্ধ	বন ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা	অন্যান্য জমি ও জল এলাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯০১	১৩৪৩'২	৮০৯'৬	৬০'২৮	১৫৯'০	২৭৪ ৬
১৯১১	১৩৪৩ ২	৮০৭'০	৬০'০৮	২৫৫'৬	২৮০'৬
১৯২১	২৩৯২'২	৬৯৮'৫	৫৩'৩৫	২৯১'১	৩১৯'৬
১৯৩১	১৩৫৯'৪	৭৮৩'৪	৫৭'৬৭	২১৬'৩	৩৫৮'৭
১৯৪১	৩১৬৬'০	৮০৯'৬	৫৯'২৯	২০২'৮	৩৫৩'৬
১৯৫১	১৩৬০'৫	৯৩২ ৬	৬৮ ৮১	২০২'৮	২২৫'১
১৯৬১	১৩৬০'৫	৮৭৪'৪	৬৪'২৭	১৬৮'৪	৩১৭'৭
১৯৭১	১৩৬০'৫	৮৫১'৪	৬২'৫৮	১৪২'৬	৩৬৬'৬

উৎস—(১) জেলা শাসক, মেদিনীপুর (১৬, ১২, ১৯৭৭) (২) West Bengal Forests : Centenary Commemoration Volume, 1964 (৩) Integrated Tribal Development Plan for Four I. T. D. P areas in Midnapore District, Bidhan Chandra Krishi Vidyalaya (A I C) 1976.

উৎপাদন	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২
কাঠ (সি. এফ. টি) হাজারে	৪২.০	৭৭.৪	৮০.৫
জ্বালানি কাঠ (")	২২৩.৯	৯৫.১	১৯৩.৫
আয়ব্যয়			
আয় (হাজার টাকায়)	৪০১২	২৯৯৬	৬০২৭
ব্যয় (")	১৫৬৭	২৪০৩	২৫৬৫

উৎস—District Statistical Hand Book, Midnapore 1971 & 1972 Combined. Bureau of Applied Economics & Statistics.

শিল্প

(ক) **ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প**—১৯৭৩ সালে মেদিনীপুরে জেলা শিল্প আধিকারিকের দপ্তর সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালে তমলুক ও পাঁশকুড়া থানা নিয়ে সৃষ্টি হয় গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প। দপ্তর, তমলুক সহর। ১৯৭৩-এর আওতায় সমগ্র জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। দুটি সংস্থা মিলিয়ে ২৫টি প্রকল্প কর্তৃত্বাধীন।

(খ) **ডেবরা সেরিকালচার নার্সারি**—প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। এক সময় রেশম গুটি চাষ ও বয়ন উন্নত থাকলেও, বর্তমানে দীনাবস্থা। জলচক, ইটাই, ডেবরা প্রভৃতি অঞ্চল বেছে নিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে উন্নয়নের কাজ সুরু হয়েছে।

(গ) **তাঁত শিল্প**—১৯৭৩ সালের সার্ভে অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা—৪৭,০৪৪, বিদ্যুৎচালিত তাঁত—১৬৮, প্রতি মাসের সুতা লাগে—১০,৭৬,০০০ কেজি; কাপড় তৈরি হয় ৪,৫৪,০০০ মিটার (প্রতি মাসে); মোট নিযুক্ত লোক সংখ্যা—১,১০,০০০ সমবায় ভিত্তিতে তাঁত সংখ্যা—৩১৪।

তাঁত শিল্পের তদারকি জেলায় তিনটি জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত; (১) মেদিনীপুর অঞ্চল—সদর (উত্তর ও দক্ষিণ) মহকুমা, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা নিয়ে গঠিত। দপ্তর, মেদিনীপুর সহর।

(২) তমলুক অঞ্চল—তমলুক মহকুমা। দপ্তর, তমলুক সহর।

(৩) কাঁথি অঞ্চল—কাঁথি মহকুমা। দপ্তর, কাঁথি সহর।

হাট ও দৈনন্দিন বাজার

১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে মেদিনীপুর জেলায় হাট ও বাজারের তালিকা দেওয়া হয়েছে ৪৩৭। এদের ভেতর যে সব হাট ও বাজারে চার হাজার বা তার বেশী লোক জমায়েত হন, তাদের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

হাট বা বাজারের নাম (পাইকারী/খুচরা)	কবে থেকে স্বরু	কি কি বারে বসে	ইউনিয়ন/থানা/মহকুমা	বেচাকেনার প্রধান জিনিষ	গড় জমায়েত (লোক/হাজারে)
১. কাকুরদা হাট (খুচরা)	১৮৫৯	রবিবার	গুড়দোলা/নারায়ণগড় সদর	সব্জি, মাছ, মাংস গুড় ও সরিষা	৪—৫
২. রামতারক হাট (খুচরা)	১৮৮৭	সোম, বৃহঃ	বালু—তমলুক/তমলুক	পানপাতা ও চাল	২—৬
৩. সামরা হাট (খুচরা)	১৮০০	মঙ্গল, শনি	পরমানন্দপুর—ময়না/তমলুক	চাল, মাছ ও সব্জি	২—৪
৪. ঢোরা হাট (খুচরা)	১৭৮৫	সোম, শুক্র	রাণীচক—ময়না/তমলুক	চাল, মাছ ও সব্জি	২—৪
৫. পাঁচখালি হাট (খুচরা)	১৮৯৫	রবি, বৃহঃ	নরঘাট—নন্দীগ্রাম/তমলুক	সব্জি	৫—৬
৬. হাঁসচর হাট (খুচরা)	১৯৩০	রবি, বৃহঃ	নন্দীগ্রাম—নন্দীগ্রাম/তমলুক	সব্জি	৪—৬
৭. কুলটিকরি হাট (খুচরা)	১৯০৪	সোম	কুলটিকরি—সাঁকরাইল,ঝাড়গ্রাম	পান, চাল ও সব্জি	৪
৮. বালিগেড়িয়া হাট (খুচরা)	১৮৮০	শুক্র	বালিগেড়িয়া—নয়াগ্রাম/ঝাড়গ্রাম	ঐ	৫
৯. ভাণ্ডারচণ্ডী হাট (খুচরা)	১৮৯০	রবি	গড়ময়না—ময়না/তমলুক	চাল, মাছ ও সব্জি	২—৬
১০. রাধামণি হাট রাধাস্বামী (খুচরা)	১৯১৭	রবি, বুধ	বিষ্ণুবার—তমলুক/তমলুক	সব্জি, চাল, পানপাতা	২—৪
১১. দশগ্রাম হাট (খুচরা)	১৯৪৩	রবি	দশগ্রাম—সবং/সদর	চাল, সব্জি, মাছ, মাংস	২—৪

এ ছাড়া পরবর্তীকালে (১৯৬৯) কৃষিজাত দ্রব্য বেচাকেনার যেসব কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তাদের বিবরণ।

বাজার	যে ব্লকের অন্তর্গত	যে যে দ্রব্য আমদানী হয়	পরিমাণ (মণ)	মূল্য (লক্ষ টা)
ঘাটাল	ঘাটাল	ধান/চাল	১ লক্ষ/৩০ হাজার	৬৩.০০
		আলু/পাট	২৫ হাজার/২০ হাজার	
দুধকুমি	—	পাট/আলু/খেসারি	২ লক্ষ ৫০ হাজার (পাট) ১ লক্ষ ৫০ হাজার (আলু)	১২০.৫০
ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	চাল	৫০ হাজার	৩০.০০
বিনপুর	বিনপুর-১	ধান/চাল	৫০ হাজার/৫ হাজার	১৮.০০
মেদিনীপুর	মেদিনীপুর	আলু/চাল	১৫ হাজার/৫ হাজার	৭.৫০
বালিচক	ডেবরা	ধান/চাল/আলু	৩ লক্ষ/৪০ হাজার/৩ হাজার	১২০.০০
আমলাগোড়া	গড়বেতা	ধান/চাল/আলু	১২ লক্ষ/৮ লক্ষ/২ লক্ষ	৯০০.০০
সি.কে.রোড	চন্দ্রকোণা-২	আলু	১০ হাজার	৩.০০
বেলদা	নারায়ণগড়	ধান/চাল/নারিকেল	১০ হাজার (ধান) ১০ হাজার (চাল)	১০.০০

উৎস : ১. District census Handbook, Midnapore : Vol —I (1966)
২. Report of the Fact-Finding Survey on Midnapore District —U. B. I (1971)

বিবিধ

মাছ চাষ

ক. **প্রশাসন**—(১) সার্কেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব ফিসারিজ (সোরিন)—মেদিনী পশ্চিম, পূর্ব ও পুরুলিয়া জেলার তত্ত্বাবধায়ক। দপ্তর, বার্জটাউন, মেদিনীপুর সহর। (২) জেলা ফিসারি অফিসার, মেদিনীপুর (পশ্চিম)—এলাকা, মেদিনীপুর (পশ্চিম), মেদিনীপুর (সদর), ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা। দপ্তর, লাইব্রেরী রোড, মেদিনীপুর সহর। (৩) জেলা ফিসারি অফিসার, মেদিনীপুর (পূর্ব)—এলাকা, কাঁথি ও তমলুক মহকুমা। দপ্তর, মনোহরচক, কাঁথি। (৪) ফিসারি অফিসার (ব্রিডিং)—এলাকা, মেদিনীপুর জেলা। দপ্তর, লাইব্রেরী রোড, মেদিনীপুর সহর। (৫) ফিস টেকনোলজিকাল স্টেশন—মূল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ। দপ্তর, জুনপুট, কাঁথি।

উৎস—জেলা শাসক, মেদিনীপুর (১৬, ১২, ১৯৭৭)।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেণ্ট, মেদিনীপুর জেলায়

(১) বিদ্যুতের ব্যবহার (৩১.৫.৭০)—৯১, ২২৮, ৯৪০ কে. ডব্লু. এইচ

(২) বিদ্যুৎ-প্রাপ্ত সহরের সংখ্যা (৩১.৫.৭০)— ১১

(৩) বিদ্যুৎ-প্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা (৩১.৫.৭০)— ৩৬

(৪) বিদ্যুৎ-প্রাপ্ত রেল স্টেশন (১৯৭০)— ৩২

(৫) প্রতি মাসে গড়ে ওয়াগণ বোঝাইয়ের সংখ্যা (১৯৬৯) ২,৯৫০

(৬) সারা বছর যেসব গ্রাম ও সহরে যাতায়াত করা যায় (১৯৭০) ১,৮৫৬

(৭) চলাচল করে এমন যানবাহনের সংখ্যা (১৯৬৯)—৪,৮২৫

(৮) পেট্রল পাম্প স্টেশনের সংখ্যা (রেজিষ্টার্ড) (৩২.৫.১৯৭০)—৯০

(৯) পোস্ট অফিসের সংখ্যা (৩১. ৫. ৭০)—৮৪৩

(১০) টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা (৩১,৫·৭০)—৪৫

(১১) যে সব গ্রাম পোস্ট অফিসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত (১৯৭০) ১৩,১১২

(১২) জলযান—নৌকা ও লন্চে কৃষিজাত দ্রব্য ঘাটাল, কোলাঘাট ও তমলুক থেকে কলকাতার বাজারে যায়।

উৎস– Report of the Fact Finding Survey etc —UBI

খনিজ সম্পদ

খনিজ	প্রকার	যেসব জায়গায় পাওয়া যায় তাদের নাম
ল্যাটারাইট	মাইনর	মেদিনীপুর (উঃ ও দঃ) ও ঘাটাল।
মোরাম	মাইনর	মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ, চন্দ্রকোণা, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর।
ম্যাঙ্গানিজ আকর	মেজর	ঝাড়গ্রাম।
লৌহ আকর	মাইনর	ঝাড়গ্রাম (যৎসামান্য)।

উৎস—Report of the Fact Finding Survey etc.—U. B. I.

নৃতাত্ত্বিক বিভাগ
(একশো বছর আগে)

জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়

১. এশিয়াবাসী নয়

ইংরেজ—	৮২
আইরিশ—	২৫
স্কচ—	১২
ওয়েল্‌শ—	১
ডেন—	১
জারমান—	১
মোট—	১২২

২. মিশ্র জাতি

ইউরেশিয়ান—	৯৩

৩. এশিয়াবাসী
(ভারতীয় ও বর্মী ছাড়া)

আফগান —	১৭
আর্মেনিয়ান—	২
মোট—	১৯

৪. ভারতীয় ও বর্মী

(ক) উপজাতি

ভড়—	৭৫৮
ভূমিজ—	৩৫,৩৪৪
গোণ্ড—	১১০
খেড়িয়া—	২,৩৯৯
খারওয়ার—	৮০
কোল—	৪২৭
নাট—	২০৫
পুরাঁও—	৩৮৫
শবর—	১,৯৫১
সাঁওতাল—	৯৬,৯২১
ওঁরাও—	৫২৮
মোট—	১,৩৯,১০৮

(খ) আধা-হিন্দু উপজাতি

বাগদী—	৭৬,২৮৫
বাহেলিয়া—	৩৮
বাউরি—	১৪,৯৪৬
বেদে—	১২৮
ভুঁইয়া—	১১,৩৩৬
বিন্দ—	৪১
বুনা—	৬
চাঁই—	৫০১
চামার বা মুচি—	৮,৫৭৪
চণ্ডাল—	২৪,৭১৩
আবাসন—	১০,০৯২
ডোম—	১৮,৬১০
তুরি—	৪
দোসাদ—	৫৮
ঘাসি—	৬৬
হাড়ি—	২১,৯৬৩
কেওড়া—	৪,০৭৮
করঙ্গ—	৫,৬৬২
কোড়মাল—	২০,০৩১
মাহেলী—	৩,৪৯৭
মাল—	৫,৭২৬
মেথর—	৩,৯০৪
মুসাহার—	৫৮
পান—	৯,৭০৯
পাসি—	৬৪৩
রাজবংশী (কোচ)—	১৭
রাজওয়ার—	১,৫২৫
শিকারি—	১৪৩
মোট—	২,৪৪,৭০৫

৫. (ক) হিন্দু (উচ্চ বর্ণ)

ব্রাহ্মণ—	১,১৮,৭০০
রাজপুত—	১৭,০০৩
ঘাটোয়াল—	১৬
খণ্ডাইৎ—	৭৮১
মোট—	১,৩৬,৫০০

(খ) মধ্য বর্ণ

বৈদ্য—	২,৪৯০
ভাট—	১,৪৮৪
কায়স্থ—	১,০১,৬৬৩
মোট—	১,০৫,৬৩৭

(গ) বণিক শ্রেণী

আগরওয়ালা মাড়োয়ারী—	১৩
বেনিয়া—	৬০০
গন্ধবণিক—	১০,১৪০
খত্রী—	১,২৬৮
সুবর্ণবণিক—	১১,৪৯৯
মোট—	২৩,৫২০

(ঘ) পশু চরায় যে সব সম্প্রদায়

গারেরি—	২৩৬
গোয়ালা—	৪৪,১৬৩
মোট—	৪৪,৩৯৯

(ঙ) রসুয়ে শ্রেণী

সংরবর—	৩২৮
মোদক—	৬,০১০
মোট—	৬,৩৩৮

(চ) কৃষক সম্প্রদায়

আগুরি—	২৫১
বাগই—	৬,৮১০
বারুই—	৭,০০১
ভামলি—	৯,৮৬৯
চাষা ধোপা—	৬৭
দলুই—	১,৪২৫
ঘড়ুই—	১৪,৮৬৮
গোলা—	২,৫৩২
কৈবর্ত্ত—	৬,৯২,১৪০
কোয়েরি—	২,১৪০
কৃষাণ—	২৫,০৮২
কুর্মী—	৪০,৪১০
মালি—	৬,১৫৬
মাহাত—	৪,৪৮১
রাজু—	৪৭,০৮২
সদগোপ—	১,৫৭,৯৯৮
সারক—	৩৫১
সুদ—	২৩
মোট—	১০,১৮,৬৮৬

(ছ) ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত সম্প্রদায়

বেহারা ও তুলিয়া—	৮,১৭৫
ধানুক—	২৬
ধাওয়া—	৮২
ধোপা—	৩৪,৮৯৬
নাপিত—	৪২,২৪৯
কাহার—	১,১৯৩
লোধা—	৩,৫৭৪
মোট—	৯০,১৯৫

(জ) শিল্পী গোষ্ঠী

চিত্রকর—	২০
দর্জি—	৪৩৭
কামার—	৩২,৩৪৮
কাঁসারি	২,২২৪
কুমোর—	২৯,১২২
লাহেরি—	২০৬
শাঁখারি—	১,৫১৩
শিয়ালগির—	১৯৮
সোনার—	৫,৭৪৮
শুঁড়ি—	৭,৪১৮
সূত্রধর—	১০,৫৮৫
তেলি—	৭০,৩৩৯
কালু—	৪,৯০১
মোট—	১,৬৫,০৫৯

(ঝ) তন্তুবায় শ্রেণী

হাঁসি—	২০৮
যুগি বা পটুয়া—	৪,৫৭৬
জোলা—	১৯১
কাপালি—	১৩০
কোটাল—	১২১
রজিনি—	৮৭৪
শুকলি—	২৯,৩৫৩
তাঁতি—	১,০৬,৩১৭
মোট—	১,৪১,৭৭০

(ঞ) মজুর শ্রেণী

বেলদার—	১০২
চুনারি—	৬৪৫
কোড়া—	৬,১৮১
কান্থা—	৯,২৭০
নায়েক—	৭,৮৬০
সামন্ত—	৭৭৫
মোট—	২৪,৮৩৩

(ট) মাছ ও সব্জি বিক্রেতা সম্প্রদায়

কুঞ্জর—	৩৮
মাটিয়া—	১,০৫৯
মোট—	১,০৯৭

(ঠ) মাছ ধরা ও নৌকা চালনায় নিযুক্ত সম্প্রদায়

জালিয়া—	২৯,৪৫০
কেওট—	২,৫৫৩
মহাদণ্ড—	২,০৬৪
মালো—	১,৮৯৫
মাঝি—	৩৭,৯০৯
পাটনি—	১৯৫
পোদ—	৪
তিওড়—	১৬,৩০৪
মোট—	৯০,৩৭৪

(ড) নট, গায়ক, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সম্প্রদায়

বইতি—	১,৯৮২
অন্যান্য—	৪৬২
মোট—	২,৪৪৪

(ঢ) জাতিগত বিচারে নির্ণীত

বাঙ্গালী—	৫,৭৭৩
হিন্দুস্থানী—	৭০
মাদ্রাজী (তেলিঙ্গা)—	৫৬৬
শিখ—	১৯৪
ওড়িয়া—	১৯,৯৫৮
মোট—	২৬,৫৬১

(ণ) অনির্ণীত সম্প্রদায়— ২৫,৩৪৬

হিন্দু মোট সংখ্যা—১৯,০২,৭৫৯

৬. হিন্দু বর্ণভুক্ত না হলেও হিন্দু ধর্মানুগ

আঘোরি –	৭২
বৈষ্ণব—	৯৬,১৭৮
নানকশাহী—	৪৩
সন্ন্যাসী—	৪৩৬
দেশী খৃষ্টান—	৩৯৬
মোট—	৯৭,১২৫

৭. মুসলমান

জোলা—	৮৯৯
মোগল—	১৩
পাঠান—	৬০০
সৈয়দ—	৩৩
শেখ—	৪,৯০৭
অন্যান্য—	১,৫০,০৩০
মোট—	১,৫৭,০৬০

৮. বর্মী

মগ—	২

মোট লোকসংখ্যা—২৫,৪০,৯৬৩

(১৮৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)

উৎস : A Statistical Account of Bengal, Vol—III—W. W. Hunter.

মেদিনীপুর জেলায় যেসব সম্প্রদায় উৎপাদন ও ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের কাজে নিযুক্ত (১৮৭২ সাল):

নীল উৎপাদক—৬	কাচের কাজ—১	শঙ্খকার—৬৮৮
রাজমিস্ত্রী—১৩৯৪	চিরুনি তৈরি—৭৪	বেতের কাজ—৪১
ইঁট তৈরির কাজ—৭৯	মাদুর তৈরি—৬১৮	তাঁত তৈরি—২
কাঠ চেরাই—৭০৪	ঝুড়ি তৈরি—২১২২	তন্তুবায়—২৬,২৭৬
সূত্রধর—১৬২১	চাবুক তৈরি—১	পশম বয়নকার—৩৪
ঘরামী—২৩১	খেলনা তৈরি—৫	নারকেল দড়ি তৈরি—১৬
নৌকা তৈরি—১৭৩	হুঁকা তৈরি—৭৭	ছাতা তৈরি—২
কামার—৩২৩৫	যাঁতা তৈরি—২০৭	বস্তা তৈরি—১৯২
তাম্রকার—২৯২৭	বাদ্যযন্ত্র তৈরি—৮	জাল তৈরি—৪৪
টিনের কাজ—২	পালিশকার—৮৭	কম্বল তৈরি—৮৭৯
স্বর্ণকার—২৮৮৩	মালাকার—২৭৫	মুচি—৮৮৬
সোনা ধোয়ার কাজ—২১	খোদাইকার—২	মুদ্রক—১
কুম্ভকার—৪৯৫৬	মীনার কাজ—৭	দপ্তরী—৩৫

উৎস: A Statistical Account of Bengal, Vol III—W. W. Hunter.

নৃতাত্ত্বিক বিভাগ

(পরবর্তীকালে)

ক. তফসিলভুক্ত সম্প্রদায় (গ্রামাঞ্চলে)

		পুরুষ	নারী			পুরুষ	নারী
	মোট—	২,৭০,১৪২	২,৬১,১৫৮	৬.	ভুঁইমালি	৬,০৫২	৫,০০৫
১.	বাগ্দী বা দুলে	৫৫,৬২৬	৫৬,৬১২	৭.	ভুঁইয়া	৫,৮১৮	৬,৬০৯
২.	বাহেলিয়া	২	১৩	৮.	চামার, চর্মকার, মুচি, রবিদাস, রুইদাস, ঋষি	৫,৪১৫	৫,১৩৫
৩.	বাইতি	৪৪৯	২৩৪				
৪.	বাউরি	৫,৭৯১	৫,৮৭৩	৯.	বিন্দ	৩৯৮	৮৫
৫.	বেদিয়া বা বেদে	১৮৬	১৯৬	১০.	ধামাই (নেপালী)	৫	১০
				১১.	ধোপা	১৭,০০৫	১৬,২১৪

		পুরুষ	নারী
১২.	দোয়াই	৪০৪	৩২৫
১৩.	ডোম বা ধাঙড	৭,০০৯	৭,৩০২
১৪.	দোসাধ, দুসাধ ধারি সহ	৮৪	১০
১৫.	ঘাসি	১৩	৩৫
১৬.	গনরি	২৫৩	২২৬
১৭.	হাড়ি	১০,৫৬২	৯,৮০০
১৮.	জালিয়া কৈবর্ত	৫,৮২৯	৬,১৫১
১৯.	জালো মালো বা মালো	৩	—
২০.	কাডার	১,৫১৭	১,৫১৫
২১.	কামি (নেপালী)	২০	৫৩
২২.	কাণ্ড্র	১১,০০৫	৯,৩১৭
২৩.	কেওড়া	২,১২৫	১,২০৪
২৪.	কারেঙ্গা বা কোরাঙ্গা	২,৭৭৪	২,৭৪৮
২৫.	কাউর	৫২	৩৬
২৬.	কেওট বা কীওট	২৭০	২৬১
২৭.	খয়রা	৫,৩৭৪	৫,১৭৬
২৮.	খটিক	৩	৬৮
২৯.	কোচ	—	৮
৩০.	কোনাই	৪	২৯
৩১.	কোনওয়ার	৬	৩
৩২.	কোটাট	৮১	১১৫
৩৩.	লোহার	৩,৭৮৬	৩,৩২৭
৩৪.	মাহার	৩৩৫	২৭৮
৩৫.	মাল	৩,৯৮৫	৪,১২৩
৩৬.	মল্ল	৩২	৬
৩৭.	মেথর	২৮৭	২৯২
৩৮.	নমশূদ্র	২৬,৫২০	২৪,৬৪৪
৩৯.	নুনিয়া	৩৪	১৬
৪০.	পান বা সয়াসি	৬১৭	৬০১
৪১.	পাসি	৬১	১৪
৪২.	পাটনি	৫১	৩০
৪৩.	পোদ বা পৌণ্ড্র	২৮,৪৮১	২৫,৫৮৫
৪৪.	রাজবংশী	৩২,৫৯৫	৩১,৫১৫
৪৫.	রাজওয়ার	২,৩৩০	২,৪১৯
৪৬.	সরকি (নেপালী)	—	১
৪৭.	শুঁড়ি, সাহা বাদে	৭,২৮৭	৫,৩৯৯
৪৮.	তিয়র	১৮৯	৩৪৯
৪৯.	টুরি	১৪	৩
৫০.	অনির্দিষ্ট	২২,৭০২	২০,৪৮১

উৎস : ১. District Census Hand Book, 1951.

২. Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.

উল্লিখিত সব ক'টি সম্প্রদায়ই তফসিলভুক্ত।

খ. উপজাতি

	পুরুষ	নারী
মোট—	১,৫৮,২৩০	১,৬৬,৩২৭
১. ভূমিজ	১২,৬০৮	১৪,৪৯০
২. ভূটিয়া, শেরপা ইত্যাদি	১৪	—
৩. চাকমা	১৫১	২১৪
৪. হো	৬৭	২১৪
৫. কোবা	৫,৫৮৭	৫,৮৬২
৬. লোধা, খেড়িয়া বা খাড়িয়া	৫,৭০৪	৫,৭৯৯
৭. মগ	৩	২
৮. মহালি	২,৬৭৬	২,৮১১
৯. মাল পাহাড়িয়া	১৯৩	১,০৮৫
১০. মেচ	১০৮	১০০
মুরু	৭০	৫৮
মুণ্ডা	৭৬৪	৯,১৭১
নাগেসিয়া	১	
৪. ওরাও	২,১৭৫	২,১৯৮
৫. রভ	৮৭	৬৫
৬. সাঁওতাল	১,১৩,৮৬৮	১,১৫,৮৯৬
৭. অনির্দিষ্ট	৬,৫৮৪	৮,৫৬৬

উৎস: ১। District Census Hand-book, 1951
২। Scheduled Castes and Tribes orders (Amendment) Act, 1976.

উল্লিখিত সব ক'টি উপজাতি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত।

গ. ধর্মীয় ভিত্তিতে জনবিন্যাস

	পুরুষ	নারী
১. হিন্দু (গ্রামে)	১৮,৮৩,০৫১	১৮,১৩,৪৫০
(সহরে)	৩,৩৪,২৮৬	১,৫১,৫৯৯
২. মুসলমান (গ্রামে)	১,৫৭,৩৪৫	১,৫২,০৫৬
(সহরে)	১০,৯৬৭	৯,৬৪৭
৩. খ্রীষ্টান (গ্রামে)	৬৭৩	৪৯৪
(সহরে)	১,৩৭০	৭৬১
৪. জৈন (গ্রামে)	১২	১৩
(সহরে)	১৩০	৯১
৫. বৌদ্ধ (গ্রামে)	৭	৭
(সহরে)	৩২২	১৬৪
৬. শিখ (গ্রামে)	১৬	১৭
(সহরে)	১,০১৩	৪৩৪
৭. ব্রাহ্ম (গ্রামে)	১	
(সহরে)	২০	
৮. অন্যান্য ধর্ম (গ্রামে)	১৮	১৯
(সহরে)	১	

ঘ. পেশাভিত্তিক বিন্যাস

	পুরুষ	নারী
১. কৃষি কাজ	৬ ৮৮,২৬৭	৯৩,৫৫৯
২. কৃষি মজুর	২,০৫,৮৮২	৮০,১৯৫
৩. শ্রমিক (১, ২ ও অন্যান্য)	১১,৬৬,৭২৮	২,৭০,৩৬৬
৪. তপসিল ভুক্ত সম্প্রদায় (সহর ও গ্রাম মিলিয়ে)	২,৮৬,৭৯৫	২,৭৬,৬১১
৫. উপজাতি (গ্রাম ও সহর মিলিয়ে)	১,৬০,৭৭৪	১,৬৮,৯৬২
৬. অশ্রমিক	১০,৫৭,৩৪৫	১৮,৭৭,৪১৬

উৎস: District Census Hand-book, 1951.

দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি

সদর (উত্তর) মহকুমা

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
গোপ গড বা গোগৃহ	মেদিনীপুর	পরিখা ও প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। প্রবাদ, এটি বিরাট রাজার প্রাসাদ ছিল।	মেদিনীপুর সহর থেকে দু'মাইল	মেদিনীপুরে ডাকবাংলো/ সার্কিট হাউস
পুরনো জেলখানা কর্নেলগোলা	মেদিনীপুর	সামন্ত রাজা মেদিনীকর কর্তৃক এটি নির্মিত বলে প্রবাদ। পরে মুসলমান, মারাঠা ও ইংরেজদের দুর্গ ছিল। নবাব আলিবর্দী, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ও মীরজাফর এখানে সাময়িকভাবে বসবাস করেন। পরে এটি জেলখানায় রূপান্তরিত হয়। এখন ভবঘুরেদের আস্তানা।	মেদিনীপুর সহরেই	১ দ্রষ্টব্য
হজরত পীর লোহানীর কবর	মেদিনীপুর	পীর লোহানীর কবর ও একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কাঁসাই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। মন্দিরটি রুক্মিনীদেবীর বলে কথিত।	মেদিনীপুর/খড়্গপুর স্টেশনের কাছাকাছি	১ দ্রষ্টব্য

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৪.	জন পিয়ার্সের সমাধি	মেদিনীপুর	মেদিনীপুরের প্রথম কালেকটর ছিলেন জন পিয়ার্স। ইংরাজী ও তখনকার বাংলায় লেখা ফলক।	মেদিনীপুর জেলা আদালত প্রাঙ্গণে	১ দ্রষ্টব্য
৫.	বিদ্যাসাগর স্মৃতিসৌধ	মেদিনীপুর	জেলা শাসক বি. আর. সেনের উদ্যোগে নির্মিত। রাধাকৃষ্ণান কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্বোধন (১৯৩৮)।	মেদিনীপুর সহরে	১ দ্রষ্টব্য
৬.	হবিবপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির	মেদিনীপুর	মন্দিরের ভেতরে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। মন্দিরের সামনে একটি ফলকে ক্ষুদিরাম বোসের জন্মস্থান নির্দেশিত। ক্ষুদিরাম অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ।	মেদিনীপুর সহরে	১ দ্রষ্টব্য
৭.	কর্ণগড়	শালবনী	দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির দু'টি দশ ফুট উঁচু পাথুরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে যোগী মণ্ডপ ৭৫ ফুট উঁচু। মন্দির ও মণ্ডপের গঠন চমৎকার। মন্দির দু'টি থেকে কিছুদূরে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। গড়ের মাঝখানে একটি পুকুর। গড়টির বয়স আনুমানিক ৫০০ বছর। চুয়াড় বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল।	গোদাপিয়াশাল বা মেদিনীপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ ভাদু তলা। সেখান থেকে চার মাইল।	মন্দিরে সাময়িক-ভাবে থাকা যায়।

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
ঝাড়েশ্বর মন্দির কানাসোল	কেশপুর	প্রাচীন মন্দির। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়।	মেদিনীপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ আনন্দপুর।	—
রায়কোটা দুর্গ গড়বেতা	গড়বেত	বগড়ীর রাজাদের রাজধানী ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। দুর্গের চারটি দরজা ছিল, লাল দরজা, বাউতা দরজা, পেশা দরজা ও হনুমান দরজা। দুর্গের উত্তরদিকে সাতটি পুকুর ছিল, জলটুঙ্গী, ইন্দ্র-পুষ্করিণী, পাথুরিয়া, হাতুয়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি ও আম্রপুষ্করিণী। সম্ভবত এগুলি খনন করা হয়েছিল ১৫৫৫ থেকে ১৬১০ সালের ভেতর। বগড়ীর চৌহান রাজাদের কীর্তি।	গড়বেতা সহর থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে	গড়বেতা সহরে রেস্ট হাউস ও হোটেল আছে
সর্বমঙ্গল মন্দির গড়বেত	গড়বেত	মঙ্গলা দীঘির উত্তরদিকে সব থেকে বড় মন্দিরটি সর্বমঙ্গলার। কখন এটি নির্মিত হয়েছিল বলা যায় না। মন্দিরটি উত্তরমুখী, উড়িষ্যা ধাঁচে গঠিত। দেবীর বাঁ দিকে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। মন্দিরের গায়ে কিন্নর ও অপ্সরা	৯ দ্রষ্টব্য	৯ দ্রষ্টব্য

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
			মূর্তিগুলি দর্শনীয়। মন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।		
১১.	কামেশ্বর শিব ও রাধাবল্লভ জীউয়ের মন্দির	গড়বেতা	মন্দির দুটিও প্রসিদ্ধ। অনেকটা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের অনুরূপ। দরজার ওপর শিল্পকাজটি উল্লেখযোগ্য। রাধাবল্লভের মন্দিরটি বাংলা ও উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের সংমিশ্রণ।	৯ দ্রষ্টব্য	৯ দ্রষ্টব্য
১২.	বগড়ীর কৃষ্ণরায় জীউয়ের মন্দির	গড়বেতা	শিলাবতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত মন্দিরটি। পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত এই মন্দিরটির গঠন পুরোপুরি বাঙ্গালী ধাঁচে। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এটির প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণরায়ের মূর্তিটি কালো ব্যাসাল্টে খচিত, স্থাপত্যে চমৎকার। দোল-যাত্রার সময় লক্ষাধিক লোকের মেলা হয়।	মেদিনীপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ আনন্দপুর। সেখান থেকে ছ'মাইল।	গড়বেতায় হোটেল ও রেস্ট হাউস আছে।
১৩.	রঘুনাথজীর মন্দির, রঘুনাথ বাড়ী	গড়বেতা	শিলাবতীর দক্ষিণ তীরে গনগনির ডাঙ্গায় অবস্থিত মন্দিরটি ন'টি স্তম্ভ সমন্বিত (নবরত্ন)। রঘুনাথ বা বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল এটির নির্মাতা	১২ দ্রষ্টব্য	১২ দ্রষ্টব্য

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
			বলে জনশ্রুতি। মন্দিরের গায়ে পশুপাখীর প্রতিকৃতি ও পোড়া মাটির কাজ উল্লেখযোগ্য।		
১৪.	গোয়ালতোড় পঞ্চরত্ন মন্দির	গোয়ালতোড়	পাঁচটি স্তম্ভ বিশিষ্ট মন্দিরটি রাজা যাদবচরণ সিংহ নির্মাণ করেছিলেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। দেয়ালে চমৎকার টেরাকোটার কাজ আছে। যদিও এখন লতাগুল্মে ছাওয়া। এখানকার সনকা বা সনৎকুমারী মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য।	চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন থেকে ১২ মাইল। বাস স্টপ গোয়ালতোড়।	পি. ডব্লু. ডি. বাংলো
১৫.	উড়িয়াসাইর মন্দির	গড়বেতা	পাথরের তৈরি জীর্ণ মন্দির। নির্মাতা চৌহান সিংহ (বাংলা ৯৯৬)। পাথরের ফলকে নির্মাতার নাম খোদিত।	চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন থেকে ছ' মাইল।	চন্দ্রকোণায় ডাক বাংলো আছে।
১৬.	নয়াবসাতে ঝালদার দুর্গ	গড়বেতা	বগড়ীর রাজা গণপতি সিংহের সময় নির্মিত দুর্গ ও প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ।	চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন থেকে ৩ মাইল।	১৫ দ্রষ্টব্য
	সদর (দক্ষিণ) মহকুমা				
১৭.	খড়্গেশ্বরমন্দির, ইন্দা	খড়্গপুর লোকাল	খড়্গপুর-মেদিনীপুর রাস্তার উত্তর-পূর্বে হিড়িম্ব ডাঙ্গায় শিবের প্রাচীন মন্দির। সাধাসিধে গঠন।	খড়্গপুর স্টেশন থেকে এক মাইলেরও কম।	গেস্ট হাউস আছে।

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধ
বীরসিংহের গড, চাঙ্গুয়াল ও ষোলা দীঘি	খড়্গপুর লোকাল	চতুর্দশ শতকে বীরসিংহের তৈরি গড ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। প্রাসাদের পাশে কাল-নাগিনীর মূর্তি ও মন্দির। আধ মাইল দূরে একশো বিঘা জমির ওপর ষোলা দীঘি দেখলে মনে হয় ষোল খণ্ডে বিভক্ত।	খড়্গপুর স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল	দ্রষ্টব্য
নারায়ণগড বা হান্দোল গড	নারায়ণগড	প্রায় আধ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে গড ও প্রাসাদ। ভেতর ও বাহির দুটি অংশে বিভক্ত। নারায়ণগড রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্লভ পাল কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত। ভেতরে অনেকগুলি পুকুর আছে তাদের মধ্যে ২০০ বিঘা জমির ওপর রাণীসাগর উল্লেখযোগ্য। নারায়ণগড়ের ধলেশ্বর শিবের মন্দিরটিও প্রাচীন। চৈতন্যদেব এখানে হরি সংকীর্তন করেছিলেন।	খড়্গপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ নারায়ণগড খড়্গপুর থেকে দূরত্ব ১৪ মাইল।	
কসবা সা-সুজার মসজিদ	নারায়ণগড	তিনটি গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি সাহজাদা সা-সুজা কর্তৃক নির্মিত। পার্শী ভাষায় লেখা প্রস্তর		দ্রষ্ট

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
			ফলক থেকে জানা যায় মসজিদটি ১৮৫৩ খ্রীঃ নির্মিত হয়েছিল।		
২১	কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা মন্দির	কেশিয়াড়ী	ভবানীপুরের মঙ্গল মারে, বসতির মাঝামাঝি মন্দিরটি অবস্থিত। ঢোকার মুখে পাথরের উচু পীঠ, সিঁড় বেয়ে উঠতে হয়। পীঠের মাথায় খিলানটি বাসরঞ্জের। তিনটি পৌধে মন্দিরটি গঠিত। নাটমন্দির বা বারোটি খিলানযুক্ত বারদোরী, জগমোহন ও দেউল বা সর্বমঙ্গলা স্তম্ভ। তিনটি মিলিয়ে মোট দৈর্ঘ্য ৭৫ ফুট, ধূসর বালিপাথরে বিশালকায় সিংহ। বারদোরী বিরাট ঘব (১৬´×১৪´)। জগমোহন জাঁকজমকপূর্ণ। উড়িষ্যার স্থাপত্য-রীতি মনে করিয়ে দেয়। পাথরের গণেশ মূর্তি, খড়্গ ও ত্রিশূল হাতে মহাকাল ও বুদ্ধের অনুরূপ চেহারা ত্রিশূল হাতে কাল ভৈরবী। জগমোহনের ভেতর দিয়েই সর্বমঙ্গলার স্তম্ভে	খড়্গপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ কেশিয়াড়ী। খড়্গপুর থেকে ১৬ মাইল।	

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
		যাবার পথ। পাথরে খচিত সর্বমঙ্গলার মূর্তির দুই পাশে জয় ও বিজয়। জগমোহন ও সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দু'টি পাথর ফলক আছে। ওড়িয়া ভাষায় লেখা ফলকে বলা হয়েছে জমিদার রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর ভুইয়া ১৬০৪ খ্রীঃ মন্দির দু'টি উৎসর্গ করেন। এ দু'টির রাজমিস্ত্রীর নাম রামরায় ও সূত্রধরের নাম রঘুনাথ কার্মিলা (কর্মকার)। রাসবেদীর মন্দিরের ফলকে বলা হয়েছে সুন্দর দাস ১৬১০ খ্রীঃ এটি তৈরি করান, রাজমিস্ত্রীর নাম বনমালি। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সামনে কাশীশ্বর নামে এক শিব আছেন। যে পাথরের ওপর মন্দির উঠেছে, সেটা খোদাই করে শিব ও শক্তি বের করা হয়েছে।		
২২. মোগলপাড়া ও তল-কেশিয়াড়ীর মসজিদ	কেশিয়াড়ী	তল-কেশিয়াড়ী যাবার পথে কেশিয়াড়ী বাজারের কাছে একটি মহাদেবের মন্দির আছে। উড়িষ্যা রীতিতে এটি গঠিত। মন্দিরের স্তম্ভটি		২১ দ্রষ্টব্য

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
		৬০ ফুট উঁচু, ভুবনেশ্বরের গঠনশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। কেশিয়াড়ীর ভেতর তল-কেশিয়াড়ী মুসলমান অধ্যুষিত। এখানে একটি ছোট মসজিদ আছে। গায়ে আঁটা ফলক থেকে জানা যায় সেটি সম্রাট শাহ আলমের সময় নির্মিত হয়েছিল। কেশিয়াড়ী গ্রামের মোগলপাড়ায় এক সময় সম্ভ্রান্ত মোগলদের বসবাস ছিল। ভাঙা বাড়ি ও মসজিদ এখনও বিদ্যমান। এদের ভেতর একটি জীর্ণ মসজিদের আরবী ভাষায় লেখা ফলক থেকে জানা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় সেটি নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের ভেতর একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রস্তর মূর্তি ভূ-লুণ্ঠিত।		
২৩. কুরুমবেড়া দুর্গ, গগনেশ্বর	কেশিয়াড়ী	কেশিয়াড়ী গ্রাম থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাথরের তৈরি একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। দশ ফুট উঁচু প্রাচীরের ভেতর দিকে মন্দির ও যে সব	২১ দ্রষ্টব্য	

স্থানের নাম	থানা	প্রাসঙ্গিক কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুযোগ
		ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ আছে, দেখলে মনে হয় সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথিদের বিশ্রামের স্থান ছিল সে সব। পূর্ব দিকে একটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ওড়িয়া শিলালেখ থেকে জানা যায় কপিলেশ্বর দেবের সময় (১৪৩৪—১৪৬৯) মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের গায়ে শিলালেখ থেকে জানা যায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির (১৬৯১ খ্রীঃ) এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেখলে মনে হয় হিন্দু মন্দিরের উপকরণ নিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছিল।		
২৪. মোগলমারি, দাঁতন	দাঁতন	দাঁতনের দু'মাইল উত্তরে ইটের একটি ভগ্ন স্তূপ আছে। তাকে শশিসেনার পাঠশালা বলে। জনশ্রুতি, রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখিসেনার সাথে অহিমাণিকের এখানে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বর্ধমানের কবি ফকির রামের কাব্যে দু'জনের ভালবাসার কাহিনী বিবৃত।	মেদিনীপুর রেল স্টেশন থেকে ৫৩ মাইল। খড়্গপুর স্টেশন থেকে ২৭ মাইল। বাস স্টপ দাঁতন।	হোটেল ও বাংলো আছে।

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
২৫.	শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির, দাঁতন	দাঁতন	দাঁতনের বাজার থেকে আধ মাইল দূরে শ্যামলেশ্বরের মন্দিরটি। দু'টি সৌধবিশিষ্ট মন্দিরটির প্রবেশদ্বারও দু'টি। দেউল বা স্তম্ভটি দেখতে প্যাগোডার মত ও চমৎকার। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণের দেওয়ালে বাঙ্কায় রিলিফের দু'টি যুগল মূর্তি। মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন।	২৪ দ্রষ্টব্য	২৪ দ্রষ্টব্য
২৬.	বিদ্যাধর পুষ্করিণী, দাঁতন	দাঁতন	পুষ্করিণীটি দৈর্ঘ্যে ১৬০০ ফুট, প্রস্থে ১২০০ ফুট। রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী বিদ্যাধরের আদেশে এটি তৈরি হয়েছিল।	২৪ দ্রষ্টব্য	২৪ দ্রষ্টব্য
২৭.	শরশঙ্ক দীঘি	দাঁতন	দাঁতন বাজার থেকে ২½ মাইল দূরে শরশঙ্ক দীঘি মেদিনীপুর জেলার ভেতর বৃহত্তম ও বাংলার বৃহত্তম দীঘিগুলির অন্যতম। লম্বায় ৫০০০ ফুট চওড়ায় ২৫০০ ফুট, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। ডেবরায় প্রাপ্ত একটি লিপিতে রাজা শশাঙ্ক এটি খনন করিয়েছিলেন বলে কথিত। লিপিটি		

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
		ঐতিহাসিক সত্যে যাচাই হবার অপেক্ষা রাখে। প্রবাদ, বিদ্যাধর দীঘি ও শরশঙ্কের ভেতর পাথরে তৈরি একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। পথটি ৭½ ফুট উঁচু ও ৪½ ফুট চওড়া।		
ঝাড়গ্রাম মহকুমা				
. ঝাড়গ্রাম গড়	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম রাজবংশের গড় বাড়ী উঁচু পাঁচিল ও পরিখা বেষ্টিত। ভেতরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী বা সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে।	ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন ও বাস স্টপ।	ডাক বাংলো ও হোটেল আছে।
. মেল বাঁধ ও করেন্দা বাঁধ	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম গড় থেকে দু'মাইল দূরে দুটি বড় বড় জলাশয় আছে। নাম, মেল বাঁধ ও করেন্দা বাঁধ। ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগালষণ্ড দেব এদের খনন করিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে এ দু'টিই স্থানীয় মানুষদের একমাত্র ভরসা।	২৮ দ্রষ্টব্য	২৮ দ্রষ্টব্য
চিল্‌কিগড়	জামবনী	জামবনী রাজাদের দুর্গ ও গড়বাড়ি। কনকদুর্গার মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।	গিধনি রেল স্টেশন। বাস স্টপ চিল্‌কিগড়।	

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৩১.	কানাইসর পাহাড	বীনপুর	কাছাকাছি পাহাড়গুলির ভেতর সব থেকে উঁচু প্রতি বছর আষাঢ মাসে দু'বার পূজা হয়। এখানে একই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।	ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন। বাস স্টপ বীনপুর।	
৩২.	রামগড়, লালগড ও শিলদা	বীনপুর	রামগড়, লালগড় ও শিলদার রাজাদের দুর্গ ও গড়বাড়ী এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।	মেদিনীপুর রেল স্টেশন। বাস স্টপ লালগড, রামগড, শিলদা।	
৩৩.	দীপা কিয়ার চাঁদের প্রস্তর স্তম্ভ	গোপীবল্লভপুর	কেশিয়াড়ী থেকে কুলটিকরি যাবার পথে কিয়ার চাঁদ প্রান্তরে পাঁচ ছয় শ পাথরের স্তম্ভ ছড়ান ছিটান অবস্থায় চোখে পড়ে। এদের নিয়ে নানা মত। কেউ কেউ বলেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অধিবাসীদের কীর্তি। স্বজন বিয়োগের স্মৃতিস্তম্ভ। কেউ বলেন, শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কেউ বলেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি জগন সিংহ নামে এখানকার রাজা এগুলি সাজিয়েছিলেন যাতে শত্রুরা মনে হয় তার সৈন্য সংখ্যা অগুন্তি।	কেশিয়াড়ী থেকে ৭ মাইল উত্তরে।	

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেলস্টেশন বা বাস স্ট্যাণ্ড	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৩৪.	গোবিন্দজীর মন্দির, গোপীবল্লভপুর	গোপীবল্লভপুর	গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশ এই মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে দণ্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা থেকে বৈষ্ণবেরা সমবেত হন।		
৩৫.	চন্দ্ররেখা গড়	নয়াগ্রাম	চন্দ্ররেখা গড় দৈর্ঘ্যে ১০৫০ গজ, প্রস্থে ৭৮০ গজ। নয়াগ্রাম রাজবংশের চতুর্থ রাজা চন্দ্রকেতু এটি তৈরি করিয়েছিলেন (১৬ শতক)। প্রচুর অর্থ ও শ্রম ব্যয়ে গড়টি নির্মিত হয়েছিল দেখলে বোঝা যায়।	খড়্গপুর রেলস্টেশন। ভসবাহাট বাস স্টপ।	
৩৬	সহস্রলিঙ্গ ও রামেশ্বর নাথের মন্দির	নয়াগ্রাম	চন্দ্ররেখা গড় থেকে ১½ মাইল। সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরে দেউলবাড় গ্রামে রামেশ্বর নাথের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটি পাথরে তৈরি। ৭৫ ফুট উঁচু, উৎকল স্থাপত্য ধাচে গঠিত। মন্দিরের ভেতর সহস্রলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। রাজা চন্দ্রকেতু মন্দিরটি তৈরী করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। চৈত্র সংক্রান্তি ও গঙ্গা বারুণীর সময় এখানে বড় মেলা বসে।	৩৫ দ্রষ্টব্য	

১৬

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৩৭.	খেলাড গড	নয়াগ্রাম	চন্দ্ররেখা গড থেকে ফিরতি পথে ডিহি খেলাড পথেই পড়ে। সেখান থেকে এক মাইল দূরে গডটি। পাথরের তৈরি রাজবাড়ী ঘিরে প্রাচীর ও পরিখা। এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ভেতরে নীল পাথরে তৈরি ঘোড়ায় চড়া নারী-পুরুষের একটি যুগল মূর্তি আছে।	৩৫ দ্রষ্টব্য	
৩৮.	তপোবন	নয়াগ্রাম	রামেশ্বরনাথের মন্দির থেকে দুই মাইল ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে তপোবন নামে একটি জায়গা আছে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এখানেই বাল্মীকির তপোবন ছিল ও লব-কুশের জন্ম হয়েছিল। বলা বাহুল্য বাল্মীকির তপোবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।	৩৫ দ্রষ্টব্য	

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
কাঁথি মহকুমা				
৩৯. বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীর্তি দেউলবাড	কাঁথি	বাহিরী গ্রামটি অত্যন্ত প্রাচীন। গ্রামের ভেতর চারটি বড় বড় মাটির স্তূপ আছে। তাদের নাম: পালটিকুরী, শাপটিকুরী, ধনটিকুরী ও গোধনটিকুরী। জনশ্রুতি, মহাভারতের বিরাট রাজার গো-গৃহ ছিল এগুলি। জনশ্রুতি ভিত্তিহীন। সম্ভবত বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এগুলি। এখানে হয়ত একটি 'বিহার' ছিল, 'বাহিরী' নামটিও যার অপভ্রংশ। বাহিরীর মধ্যে ও কাছাকাছি দেউলবাড, ভিতি বাহিরী, পাইকবাড়ি ও বিধু বাহিরী নামে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি আছে। প্রতিটি গ্রামই প্রাচীন ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে পরিপূর্ণ। বাহিরীতে একটি প্রাচীন মঠ আছে। সেখানে রামচন্দ্রের মূর্তি বিদ্যমান। এ ছাড়া, ভীমসাগর, হেম সাগর, লোহিত সাগর নামে কয়েকটি বড় বড় পুকুরও আছে।	কাঁথি রেল স্টেশন। মরিশদা বাস স্টপ।	মঠে থাকার জায়গা আছে।

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৪০.	হটনগর মহাদেবের মন্দির, এগরা	এগরা	উড়িষ্যা স্থাপত্যরীতিতে গঠিত হটগর শিবের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার রাজা গজপতি মুকুন্দদেব কর্তৃক এটি নির্মিত বলে বলা হয়।	রেল স্টেশন কাঁথি রোড। বাসস্টপ এগরা।	এগরায় হোটেল আছে।
৪১.	কৃষ্ণসাগর ও নেগুয়ার কাছারী	এগরা	হটনগর মন্দিরের কাছে কৃষ্ণসাগর নামে একটি পুকুর আছে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে জেলা পরিষদের ডাক বাংলো আছে, সেখানে আগে কাঁথির মহকুমা কার্যালয় ছিল। নাম ছিল 'নেগুয়া কাছারী'। বঙ্কিমচন্দ্র এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখানে বসেই সম্ভবত 'আনন্দমঠ' লেখা হয়েছিল।	কাঁথি রোড স্টেশন। কুদি বাসস্টপ	৪০ দ্রষ্টব্য
৪২.	কুদি গ্রামের শিব ও আলংগিরির ঠাকুরবাড়ী	এগরা	আলংগিরি গ্রামের গোপাল জীউ-র মন্দিরটি প্রাচীন। কুদি গ্রামের শিবের মন্দিরটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এখানে একটি বড় মেলা বসে।	কাঁথিরোড স্টেশন। বাস স্টপ কুদি ও আলংগিরি।	এগরায় হোটেল আছে।

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৪৩.	দীঘা	রামনগর	সমুদ্র সৈকতে অবকাশ যাপনের স্থান। পশ্চিম বাংলায় অন্যতম। বছরে প্রায় ৫০ থেকে ৭০ হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন।	খড়্গপুর রেল স্টেশন বা কাঁথি রোড রেল স্টেশন। বাস স্টপ দীঘা।	ট্যুরিস্ট বাংলো, হোটেল ইত্যাদি আছে।
৪৪.	জুনপুট	কাঁথি	সমুদ্র সৈকতে স্বাস্থ্যকর স্থান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে মাছ চাষ প্রকল্প আছে।	কাঁথি রোড স্টেশন। জুনপুট বাস স্টপ।	ডাকবাংলো আছে।
৪৫.	দরিয়াপুর ও দৌলতপুর	কাঁথি	বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে স্থান দু'টি স্মরণীয় হয়ে আছে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিমন্দিরও আছে একটি।	কাঁথি রোড স্টেশন। বাস স্টপ পেটুয়া ঘাট।	৪৪ দ্রষ্টব্য
৪৬	খেজুরী বা খাজুরী	খেজুরী	আঠারো শতকের শেষ দিকে ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে বড় বন্দর ছিল খেজুরী। রাজা রামমোহন রায় বিলেত যাবার সময় এখান থেকেই জাহাজে উঠেছিলেন। কলকাতা-খেজুরী টেলিগ্রাফ লাইন ভারতে প্রথম (১৮৫১-৫২)। এখন শ্রীহীন ও পরিত্যক্ত।	কাঁথি রোড স্টেশন থেকে ২১ মাইল।	

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৪৭.	খাজুরীর সমাধি ক্ষেত্র	খেজুরী	সমাধি ক্ষেত্রটি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে মূল্যবান। দেয়ালঘেরা ক্ষেত্রটিতে মোট ৩৩টি সমাধি আছে। এদের ভেতর ২১টির গায়ে উৎকীর্ণ ফলক আঁটা। ১৮০০ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত এই কবরখানা ব্যবহৃত হত। ১৮০০ সালের আগেকারও কয়েকটি কবর আছে।	৪৬ দ্রষ্টব্য	
৪৮.	কাউখালীর আলোক স্তম্ভ	খেজুরী	আশি ফুট উঁচু আলোক স্তম্ভটি ১৮১০ সালে তৈরি হয়েছিল। পাঁচতলা স্তম্ভটির ভেতরে গোল সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চতলা পর্যন্ত ওঠা যায়। ১৯২৩ সাল থেকে এটি ব্যবহার করা হয় না।	খাজুরী থেকে ৫ মাইল।	
৪৯.	হিজলীর মসজিদ ও তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার সমাধি, কসবা-হিজলী	খেজুরী	কাউখালীর ৫ মাইল দক্ষিণে কসবা-হিজলী গ্রাম। তাজ খাঁর রাজধানী ছিল। এখন ধ্বংস-স্তূপে পরিণত। জব চার্ণক বাংলায় এসে এখানেই প্রথম ঘাঁটি পেতেছিলেন। হিজলী নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার (১৫৫৫ খ্রীঃ)		

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
		সমাধি আছে এখানে। এখানকার মসজিদটি প্রসিদ্ধ।		
তমলুক মহকুমা				
৫০. বর্গভীমা মন্দির, তমলুক সহর	তমলুক	রাস্তা থেকে ২২টি সিঁড়ি ভেঙ্গে বর্গভীমার মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন। সম্ভবত এটি বৌদ্ধবিহার ছিল; পরে বিহারটিকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মন্দিরটি চারভাগে বিভক্ত। এক, বড় দেউল বা অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠ—যেখানে মূর্তি আছে। দুই, জগমোহন বা দর্শকদের গৃহ। তিন, নাট মন্দির—যেখান থেকে উপহার বা নৈবেদ্য ইত্যাদি দেওয়া হয়। চার, যজ্ঞ মণ্ডপ বা ভোগ মণ্ডপ। বিগ্রহ উগ্রতারা মূর্তিতে বিধৃত। কালো পাথরে খোদাই করা, চতুর্ভুজ। শিবের দেহের ওপর দণ্ডায়মান। ওপরের হাত দু'টিতে তেফলা বর্শা ও তলোয়ার, নিচের হাত দু'টিতে দৈত্যমুণ্ড ও	মেচেদা রেল স্টেশন। বাস স্টপ তমলুক।	ডাকবাংলো আছে।

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
			মাথার খুলি। মন্দিরটির গঠন শৈলী বাংলা ধাঁচের নয়।		
৫১.	কৃষ্ণার্জুন বা জিষ্ণুহরি মন্দির	তমলুক	তাম্রলিপ্তের রাজা ময়ূরধ্বজ মতান্তরে তাম্রধ্বজ মূর্তিটি তৈরি করিয়েছিলেন বলে প্রবাদ। প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণের গর্ভে বিলুপ্ত। বর্তমান মন্দির পরবর্তীকালে তৈরি। তবু বয়স পাঁচশো বছর।	৫০ দ্রষ্টব্য	৫০ দ্রষ্টব্য
৫২.	গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির	তমলুক	চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর বাসুদেব ঘোষ এটি তৈরি করিয়েছিলেন।	৫০ দ্রষ্টব্য	৫০ দ্রষ্টব্য
৫৩.	শ্মশানেশ্বর মন্দির, মহতপুর	পাঁশকুড়া	মন্দিরটির আকৃতি অনেকটা হুগলীর তারকেশ্বর মন্দিরের মত। কাছে একটি পুকুর আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা হয়।	পাঁশকুড়া রেল স্টেশন। বাস স্টপ, পাঁশকুড়া।	বাংলো আছে।
৫৪.	রঘুনাথ জীউ-র মন্দির, রঘুনাথবাড়ী	পাঁশকুড়া	মন্দিরটি কাশীজোড়া রাজবংশের তৈরি। বিজয়া দশমীর সময় সাতদিন ধরে একটি মেলা বসে।	৫৩ দ্রষ্টব্য	৫৩ দ্রষ্টব্য

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৫৫.	দোরো পরগণার মন্দির ও মূর্তি, দেভোগ	সুতাহাটা	মাধব, সাগর মাধব ও নীলমাধব নামে তিনটি নীল পাথরের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলির গঠন-শৈলী চমৎকার। সম্ভবত এগুলি বৌদ্ধ যুগের মূর্তি। দেভোগের সুন্দর নবরত্ন মন্দির ও দীঘি মাজনামুঠার জমিদার যাদবরামের পুত্রবধূ আঠারো শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।	তমলুক থেকে বাসে মহিষাদল এবং সেখান থেকে দেভোগ। ব. মহিষাদল থেকে চৈতন্যপুর হয়ে দেভোগ।	
৫৬	গড় ময়না	ময়না	ময়না রাজবংশের গড়টি প্রাচীন কীর্তি। গড়টি দুটি ভাগে বিভক্ত, বাহির ও ভিতর। ভিতরের আয়তন ৫, ৬২, ৫০০ বর্গ ফুট। চারদিকে পরিখা। পরিখাটি দেড়শো ফুট চওড়া। গড়ের ভেতরে রাজবাড়ী ছিল। বর্গী আক্রমণের সময় স্থানীয় লোকেরা এখানে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতেন।	তমলুক থেকে নয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাস স্টপ ময়না।	তমলুক দ্রষ্টব্য

স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
ঘাটাল মহকুমা				
৫৭. রামগড ও লালগড	চন্দ্রকোণা	চৌহান বংশীয় রাজারা গড দুটি তৈরি করিয়েছিলেন। রামগড দুর্গে রঘুনাথ জীউ-র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২২ খ্রীঃ। অষ্ট ধাতুর লালগড দুর্গে গিরিধারী জিউকে প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৬৫৫ খ্রীঃ। পরে বিগ্রহের নাম হয় লালজীউ।	চন্দ্রকোণা রোড স্টেশন। বাস স্টপ, রামগড, লালগড।	রেস্ট হাউস আছে।
৫৮. বারদুয়ারী, চন্দ্রকোণা সহর	চন্দ্রকোণা	বারোটি দরজা বিশিষ্ট দুর্গটি রাজা চন্দ্রকেতুর রাজবাড়ী ছিল। এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত।	৫৭ দ্রষ্টব্য	ডাকবাংলো আছে।
৫৯. লালজীউ-র মন্দির	চন্দ্রকোণা	রাজা হরিনারায়ণের পত্নী রাণী লক্ষণাবতী মন্দিরটি তৈরি করান ১৫৭৭ শকে (১৬৫৫ খ্রীঃ)। বাংলা ও ওড়িয়া স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ মন্দিরটি। বাইরের দিকে কামেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন মন্দির, গায়ে একটি ফলক আছে। লালজীর মন্দিরটি বাংলা আটচালা ধাঁচের, ৬০ ফুট উঁচু। নাটমন্দির, যজ্ঞ মণ্ডপ-এ অঞ্চলের প্রায় সব মন্দিরে যা যা দেখা যায়, এখানেও আছে।	৫৮ দ্রষ্টব্য।	৫৮ দ্রষ্টব্য।

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
			চন্দ্রকোণা সহরের নানা জায়গায় নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন নানা সুন্দর সুন্দর মন্দির ছড়িয়ে আছে।	-	-
৬০.	মল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দির	চন্দ্রকোণা	বারো দুয়ারীর কাছেই মল্লেশ্বরের মন্দিরটি। আগেকার মন্দিরটি কালাপাহার বিধ্বস্ত করেছিলেন বলে প্রবাদ। এখানকার মন্দিরটি আঠারো শতকে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র তৈরি করিয়েছিলেন। যাবার পথে ভাঙ্গাচোরা যে মন্দিরটি পথে পড়ে বাংলা ও উড়িয়া স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সমন্বয়। মন্দিরটি স্থপতিবিদ্‌দের গবেষণার দাবী রাখে। এরই দুশো গজ দূরে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলো ধরনের আর একটি মন্দির আছে। ল্যাটারাইট পাথরে তৈরি মন্দিরটির গঠনশৈলী উড়িয়া রীতি অনুসারী।	৫৮ দ্রষ্টব্য	৫৮ দ্রষ্টব্য

	স্থানের নাম	থানা	প্রসিদ্ধির কারণ	কাছাকাছি রেল স্টেশন বা বাস স্টপ	বিশ্রামের সুযোগ সুবিধা
৬১.	ক্ষীরপাইয়ের মন্দির	চন্দ্রকোণা	ক্ষীরপাইয়ের কাছাকাছি টেরাকোটার কাজ-করা কয়েকটি চমৎকার মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলী ও নদীয়ার বীরনগরের মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষীরপাইয়ের কাছাকাছি বেড়াবেড়া গ্রামে সাহেবদের ছটি পুরানো কবর আছে। কিছুকাল আগেও উৎসবের দিনে এগুলিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হত।		
৬২.	শোভাসিংহের গড়		রাজনগর গ্রামে শোভাসিংহের গড় ছিল। এখন শুধু তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।		

উৎস : ১. A Statistical Account of Bengal, Vol III – W-W Hunter. ২. Bengal Dist Gazetteers, L. S. S. O' Malley. ৩. মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু। ৪. District Census Hand Book 1951 ও 1961. লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

মেলা ও উৎসব

মেদিনীপুর জেলায় যে সব মেলা বা উৎসবে দশ হাজার বা তার ওপরে লোক জমায়েত হন, তার বিবরণ।

	মহকুমা/থানা	স্থান	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিনের	কতদিন চলে	জনসমাগম
১.	সদর (উত্তর) মহকুমা—কেশপুর	বেল্যা মহারাজপুর	মাঘ	সরস্বতী পূজা	৭০ বছর	৭ দিন	৩০ হাজার
২.	সদর (উত্তর) মহকুমা—গড়বেতা	সারেঙ্গাগড়	মাঘ	বংগাঠাকুর পূজা (সরগার জাট উৎসব)	২০০ বছর	৭ দিন	১০ থেকে ১২ হাজার
৩.	সদর (উত্তর) মহকুমা—কেশপুর	কানাশোল	চৈত্র	গাজন উৎসব	৩০০ বছর	৮ দিন	২৫—৩০ হাজার
৪.	সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—সবং	কোলঙ্গা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি			৪০ হাজার
৫.	সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—পিংলা	কাঁটাপুকুর	·	রথযাত্রা		১৫ দিন	২০ হাজার
৬.	সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—নারায়ণগড়	কেদার	মাঘ	কেদারনাথ (শিব পূজা)		২০,২২ দিন	১ লক্ষ
৭.	কাঁথি—কাঁথি	বাসন্তীয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা		৫ দিন	২০ হাজার
৮.	কাঁথি—কাঁথি	দারুয়া		মহরম		১ দিন	১০—১৫ হাজার

	মহকুমা/থানা	স্থান	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিনের	কতদিন চলে	জনসমাগম
৯.	কাঁথি—কাঁথি	জুনপুট	পৌষ সংক্রান্তি	মকর স্নান		১ দিন	২০ হাজার
১০.	কাঁথি—ভগবানপুর	পূর্ব মাসুড়িয়া	চৈত্র-বৈশাখ	গাজন	৩০ বছর	৮ দিন	১২—১৩ হাজার
১১.	কাঁথি—ভগবানপুর	এক্তারপুর	ফাল্গুন	দোল যাত্রা	৮০ বছর	৭ দিন	১০—১২ হাজার
১২.	কাঁথি—পটাশপুর	গোকুলপুর	পৌষ-মাঘ	গোকুলানন্দের তিরোধান	৪০০ বছর	৫ দিন	লক্ষাধিক
১৩.	কাঁথি—পটাশপুর	পঁচেট	কার্তিক	রাস যাত্রা	৫০০ বছর	১২ দিন	১ লক্ষ
১৪.	কাঁথি—পটাশপুর	অমর্ষি কসবা	বৈশাখ	মখদুম পীরের উরস	প্রাচীন	৪ দিন	২৫—৩০ হাজার
১৫.	কাঁথি—রামনগর	দীঘা	পৌষ-সংক্রান্তি	মকর স্নান	১২ বছর	১ দিন	৭০—৮০ হাজার
১৬.	কাঁথি—রামনগর	জলধা	পৌষ-সংক্রান্তি	স্নান	১০০ বছর	১ দিন	১৪—১৫ হাজার
১৭.	কাঁথি—এগরা	কুদি	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	৭ দিন	৮—১০ হাজার
১৮.	কাঁথি—এগরা	বাসুদেবপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা		১০—১২ দিন	১৫—১৬ হাজার
১৯.	কাঁথি—এগরা	এগরা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি		৮ দিন	২০ হাজার
২০.	কাঁথি—এগরা	এগরা	চৈত্র	বাসন্তী পূজা		৭ দিন	৮—১০ হাজার
২১.	কাঁথি—এগরা	বালিঘাই	জ্যৈষ্ঠ	বারোয়ারী পূজা		৭ দিন	৮—১০ হাজার
২২.	কাঁথি—এগরা	হটনগর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি		৫ দিন	১০ হাজার
২৩.	কাঁথি—এগরা	আলমগেরিয়া	শ্রাবণ	জন্মাষ্টমী		১০—১২ দিন	১৫—১৬ হাজার
২৪.	তমলুক—তমলুক	টুল্যা	ফাল্গুন	শীতলা পূজা	প্রাচীন	১ দিন	৮—১০ হাজার

	মহকুমা/থানা	স্থান	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিনের	কতদিন চলে	জনসমাগম
২৫.	তমলুক—তমলুক	কুলবেড়্যা	মাঘ	ভীম একাদশী	১০০ বছর	৭ দিন	৮—১০ হাজার
২৬.	তমলুক—পাঁশকুড়া	বেগুনবাড়ী	জৈষ্ঠ	কালীপূজা	২০০ বছর	১০ দিন	১০ হাজার
২৭.	তমলুক—পাঁশকুড়া	কেশিয়াড়ী ভুঁইয়াবাড়	বৈশাখ	গাজন	সম্প্রতি	৭ দিন	১০ হাজার
২৮.	তমলুক—পাঁশকুড়া	দেউলিয়া	ভাদ্র	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	১০—১২ হাজার
২৯.	তমলুক—পাঁশকুড়া	রঘুনাথবাড়ী	আশ্বিন	রঘুনাথজীউর রথযাত্রা	২৫০ বছর	৭ দিন	২৫—৩০ হাজার
৩০.	তমলুক—তমলুক	চকসিমুলিয়া	মাঘ	রথযাত্রা		২ দিন	১২ হাজার
৩১.	তমলুক—মহিষাদল	মহিষাদল	আষাঢ়	রথযাত্রা		১৫ দিন	১ লক্ষ
৩২.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	বামুন আড়া	চৈত্র	শীতলাপূজা	১১৩৭ বঙ্গাব্দ	১৫ দিন	৩০—৪০ হাজার
৩৩.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	হরিচক্	আষাঢ়	রথযাত্রা		৮ দিন	২৫ হাজার
৩৪.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	জলপাই	চৈত্র	বারুণীস্নান		১ দিন	১২ হাজার
৩৫.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	রেয়াপাড়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি		৭ দিন	২০ হাজার
৩৬.	তমলুক—নন্দীগ্রাম *	বাসুলীচক	আশ্বিন	বাসুলীপূজা		৪ দিন	১২ হাজার
৩৭.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	শিমুলকুণ্ডা	ফাল্গুন	শিবরাত্রী		১ দিন	১৬ হাজার
৩৮.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	সকণাবাদ		মহরম		১ দিন	১২ হাজার
৩৯.	তমলুক—নন্দীগ্রাম	বাজাল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা		৪ দিন	২০ হাজার

	মহকুমা/থানা	স্থান	সময়	উপলক্ষ্য	কতদিনের	কতদিন চলে	জনসমাগম
৪০.	তমলুক—সুতাহাটা	শুয়াবেড়িয়া	পৌষ	অন্নপূর্ণাপূজা	৬০ বছর	১৫ দিন	১০ হাজার
৪১.	ঘাটাল—ঘাটাল	বরদা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা		৪ দিন	১৫—২০ হাজার
৪২.	ঘাটাল—ঘাটাল	বরদা	পৌষ	বিশালাক্ষীপূজা	৩০০ বছর	১ দিন	১৫—২০ হাজার
৪৩.	ঘাটাল—ঘাটাল	বরদা	পৌষ	মকরস্নান		১ দিন	১৫—২০ হাজার
৪৪.	ঘাটাল—দাসপুর	গোপালপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	৬ দিন	১০ হাজার
৪৫.	ঝাড়গ্রাম—বিনপুর	ঘাগরা	মাঘ	ঘাগরাসিনীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২০—২৫ হাজার
৪৬.	ঝাড়গ্রাম—বিনপুর	দহিজুড়ি	আষাঢ়	রথযাত্রা	সম্প্রতি	২ দিন	১৪—১৫ হাজার
৪৭.	ঝাড়গ্রাম—বিনপুর	দহিজুড়ি	ফাল্গুন	মহোৎসব	সম্প্রতি	৩ দিন	১৪—১৫ হাজার
৪৮.	ঝাড়গ্রাম—গোপীবল্লভপুর	বালিযাত	চৈত্র	বালিযাত উৎসব	প্রাচীন	১ দিন	১৫—২০ হাজার
৪৯.	ঝাড়গ্রাম—সাঁকরাইল	কুলটিকরি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৫ দিন	১২ হাজার
৫০.	ঝাড়গ্রাম—সাঁকরাইল	রোহিনী	চৈত্র	চড়ক	২০০ বছর	৩ দিন	১০ হাজার

উৎস : (১) পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড : অশোক মিত্র, আই. সী. এস সম্পাদিত।

(২) District Census Hand Book, Vol-I ; Ed, B Roy. W B C. S. (1961).

(৩) গ্রন্থকারের নিজস্ব সংগ্রহের ভিত্তিতে সংকলিত।

সহরাঞ্চল

নাম	এলাকা (বর্গ কি.মি.)	স্বীকৃতি	মিউনিসিপ্যাল/ নন-মিউনিসিপ্যাল	লোক সংখ্যা
১. ঝাড়গ্রাম	১৭·০৭	১৯৫১	নন-মিউ	১৯,২৩৭
২. খড়্গপুর	৩১·৩৮	২৬ ৭ ১৯৫৪	মিউ	৬১,৭৮৩
৩. আই.আই.টি.		১৯৬১	নন-মিউ	৭,৩২১
৪. খড়্গপুর রেলওয়ে সেটেলমেন্ট		১৯৩১	নন-মিউ	৭৩,৭৩৫
৫. খড়্গপুর		১৯৬১	নন-মিউ	১৮,০০৮
৬. বালিচক	৮·৬৬	১৯৬১	নন-মিউ	৭,০৭৬
৭. মেদিনীপুর	১০·৩৬	১৮৬৫	মিউ	৭১,৩২৬
৮. আমলাগোড়া	[illegible]	১৯৬১	নন-মিউ	৮,৩১২
৯. গড়বেতা	৬·৭৬	১৯৫১	নন-মিউ	৭,৫৪২
১০. রামজীবনপুর	১০·৩৬	১.৪ ১৮৭৬	মিউ	১০,৩৬৪
১১. চন্দ্রকোণা	১৬·৫৭	১.৪ ১৮৬৯	মিউ	৯,৮১১
১২. ক্ষীরপাই	১০·৩৬	১৮৭২	মিউ	৭,০৭৫
১৩. খড়ার	১০·৩৬	১৮৮৮	মিউ	৭,২৬২
১৪. ঘাটাল	১০·৩৬	১.৪.১৮৬৯	মিউ	৭,৫৭০
১৫. কোলাঘাট	৬·৩৭	১৯৭১	নন-মিউ	১৩,৩৭১
১৬. তমলুক	১০·১৬	১৮৬৪	মিউ	২২,৭৭৮
১৭. মহিষাদল	৬·২২	১৯৬১	নন-মিউ	৯,৮৫২
১৮. হলদিয়া	২১·৫৯	১৯৭১	নন-মিউ	৯,৯৬৮
১৯. কাঁথি	১৭·২৫	৪.১১ ১৯৫৮	মিউ	২৭,৩৫৫

উৎস : ১. District Statistical Hand Book, Midnapore, 1971 & 1972 Combined.

২. Cansus of India 1971. Series 22, West Bengal, Part II-A

পাবলিক হল ও অডিটোরিয়াম*

	নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠার সময়	কারা তত্ত্বাবধান করেন	বিদ্যুতের ব্যবস্থা	মোট আসন	ভাড়া/বিনা ভাড়া
১.	দুর্গামন্দির	খড়্গপুর	—	কমিটি	বিদ্যুৎ আছে	১৫০০	ভাড়া পাওয়া যায়
২.	বীরেন্দ্র মেমোরিয়াল হল	কাঁথি সহর	১৯৬১	ট্রাস্ট কমিটি	১ দ্রষ্টব্য	১০৫০	১ দ্রষ্টব্য
৩.	কমিউনিটি হল	কাকুড়থানা (হরিদাসপুর)	১৯৬১-৬২	হরিদাসপুর যুবক সংঘ	বিদ্যুৎ নেই	২০০	ফ্রি
৪.	কমিউনিটি হল	শ্রীরামপুর	১৯৬১-৬২	দিপুরেড়িয়া অঞ্চল প্রধান ইং	৩ দ্রষ্টব্য	১০০	ফ্রি
৫.	কমিউনিটি হল	চাঁদ খাঁ (গঙ্গানারায়ণপুর)	৪ দ্রষ্টব্য	ভ্রাতৃ সংঘ	৩ দ্রষ্টব্য	১৫০	ফ্রি
৬.	হিজল দে ভং বাণী পাঠাগার	হিজল বেড়িং	৪ দ্রষ্টব্য	বাণী পাঠাগার	৩ দ্রষ্টব্য	১০০	ফ্রি
৭.	তাম্রলিপ্ত ব্যায়াম সমিতি	তমলুক সহর	৪ দ্রষ্টব্য	ব্যায়াম সমিতি	৩ দ্রষ্টব্য	২০০	ফ্রি

[*উৎস: District Census Hand Book 1961]

	নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠার সময়	কার তত্ত্বাবধান করেন	বিদ্যুতের ব্যবস্থা	মোট আসন	ভাড়া/বিনা ভাড়া
৮.	জেলা গ্রন্থাগার	তমলুক সহর	১৯১০-৫৮	পাঠাগার কমিটি	বিদ্যুৎ আছে	৫০০	ফ্রি
৯.	স্বামী প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতি ভবন	মহিষাদল	১৯৬১	স্বামী প্রজ্ঞানন্দ স্মৃতি রক্ষা কমিটি	বিদ্যুৎ নেই	১২০০	ভাড়া পাওয়া যায়
১০.	দেবেন্দ্র মোহন কালচারাল সেন্টার	রঘুনাথপুর ঝাড়গ্রাম	১৯৫৮	বোর্ড অব কাউন্সিল	বিদ্যুৎ আছে	৭০০	৯ দ্রষ্টব্য
১১.	বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল	মেদিনীপুর সহর	৯৫৮	বোর্ড অব ট্রাস্ট	১০ দ্রষ্টব্য	৬০০	৯ দ্রষ্টব্য
১২.	বীরেন্দ্র নিলয়	মেদিনীপুর সহর	১৯৪২	এক্সিকিউটিভ কমিটি	১০ দ্রষ্টব্য	২৫০	৯ দ্রষ্টব্য

পত্র-পত্রিকা :

ভাষা	সাপ্তাহিক	মাসিক	অন্যান্য
বাংলা	৩০	—	৩২
বাংলা ও ইংরাজী	—	০	৯
হিন্দী	১	—	২
সাঁওতালী	১	—	২
ইংরাজী	১	—	১

উৎস : ১। District Statistical Hand Book, Midnapore, 1971 & 1972 combined

২। লিটল ম্যাগাজিন, সম্পাদক—দীপঙ্কর দে (১৯৭৬)।

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত

১৯৭৮ সালের জুন মাসে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগেকার পঞ্চায়েত কাঠামো বদলে ত্রিস্তর কাঠামো চালু করা হয়। এ বিষয়ে মেদিনীপুর জেলার তথ্যাদি :

সাধারণ তথ্য

গ্রামীণ ভোটদাতার সংখ্যা—২৭,৭৯,৮৮০

ভোট কেন্দ্র (অতিরিক্ত বুথ সহ) ৪,৭৭২

গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	৫১৫
গ্রাম পঞ্চায়েত কনস্টিটিউয়েন্সী	৩,২৫১
আসন সংখ্যা	৭,১২৬ (কনস্টিটিউয়েন্সীগুলি একাধিক আসন বিশিষ্ট)
প্রতিযোগী প্রার্থীদের সংখ্যা	২৩৫৫৯

পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা	৫১
পঞ্চায়েত কনস্টিটিউয়েন্সীর সংখ্যা	১,৩১৯
আসন সংখ্যা	১,৩১৯
প্রতিযোগী প্রার্থীদের সংখ্যা	৪,৫০৫

জিলা পরিষদ

কনস্টিটিউয়েন্সীর সংখ্যা	১০৪
প্রতিযোগী প্রার্থীদের সংখ্যা	৪১৭

দলগত বিভাগে প্রতিযোগী প্রার্থী ও নির্বাচিত সদস্য

দলেব নাম	গ্রাম পঞ্চাযেত প্রতিযোগীব সংখ্যা	নির্বাচিত	পঞ্চাযেত সমিতি প্রতিযোগীব সংখ্যা	নিবাচিত	জিলা পবিষদ প্রতিযোগীর সংখ্যা	নির্বাচিত
কংগ্রেস	১৩২	২০	২৭	২	৩	×
কংগ্রেস (ই)	২,৭৯৬	৫১০	৫১৩	৬৮	৫৯	১
সিপি আই(এম)	৬,৭৯৬	৪,২৬৩	১,২৮২	৮৯৮	১০৭	৮৮
সি পি আই	২,৪৩৭	৫৩৬	৬৫১	৮৯	৬০	৫
ফরওয়ার্ড ব্লক	১১৬	১১	৪২	২	৩	১
আর এস পি	৬১	৭	১৩	.	৩	×
নির্দল	১১,২১৭	১,৭৯২	২,১৯৭	২৫৯	১৮২	১০
মোট	২৩,৫৫৪	৭,১৩৯	৪,৫০৫	১,৩১৯	৪১৪	১০৭

গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭টি আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল

তফসিল সম্প্রদায়	৭৬১	১৭০	৫
তফসিল উপজাতি	২৭৭	৬৯	১১
মহিলা	১১৬	৩৮	৪

উৎস : জেলা পঞ্চাযেত আধিকাবিক, মেদিনীপুব

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই ও পুস্তিকা

১. বাংলার ইতিহাস—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, আধুনিক যুগ (মুক্তি সংগ্রাম)—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল।

২. বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নবভারত পাবলিশার্স।

৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপব—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বুক এমপোরিয়াম।

৪. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন।

৫. পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ৩য় খণ্ড—অশোক মিত্র, আই.সি.এস. সম্পাদিত।

৬. শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য। ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত।

৭. ভীম চরিত—রাম সরস্বতী।

৮. পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা—ডঃ সনৎ কুমার মিত্র

৯. বাংলার অর্থনৈতিক জীবন—নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ।

১০. মেদিনীপুরের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—যোগেশচন্দ্র বসু।

১১. মেদিনীপুরের বোমার মামলা—অতুলচন্দ্র বসু।

১২. স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম ও ২য় খণ্ড)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য।

১৩. তমলুকের ইতিহাস—সেবানন্দ ভারতী।

১৪. বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস—যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো)।

১৫. হিজলীর মসনদ-ই-আলা (২য় সং)—মহেন্দ্রনাথ করণ।

১৬. বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত—সুরেন্দ্রনাথ জানা।

১৭. তমোলুক ইতিহাস—ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত।

১৮. মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত—প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ)।

১৯. বাংলার হলদিঘাট তমলুক—গোপীনন্দন গোস্বামী।

২০. ঘাটালের কথা—পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায়।

২১. সাঁকরাইল থানার কথা—অধ্যাপক সত্যেন ষড়ংগী।

২২. কেশিয়াড়ী—রাধানাথ পতি শর্মা।

২৩. শাক্ততীর্থ কর্ণগড—রাধারমণ চক্রবর্তী।

২৪ দাসপুরের ইতিহাস—পঞ্চানন রায়।

২৫. মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতির প্রকাশিত পুস্তকাবলী: (ক) শহীদ স্মরণে (খ) ক্ষুদিরাম—পুষ্প অধিকারী (গ) মেদিনীপুরের আইন ও শৃঙ্খলা (ঘ) মেদিনীপুরেরকীর্তি ও কাহিনী—পুষ্প অধিকারী (ঙ) শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ—পুষ্প অধিকারী (চ) মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস—চিত্তরঞ্জন দাস (ছ) স্মরণীয় যাঁরা—পুষ্প অধিকারী (জ) শহীদ রক্তে সিক্ত মেদিনীপুর।

২৬. মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ সম্পাদিত: (ক) মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি—১ম সংকলন (খ) মেদিনীপুর জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি—২য় সংকলন, ১৯৭৪।

২৭ বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ—বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ।

২৮. বীক্ষণী - শ্রী আজাহারউদ্দিন খান সম্পাদিত।

২৯ কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি—রাধারমণ চক্রবর্তী।

৩০. স্মারক পুস্তিকা: (ক) মেদিনীপুর প্রদর্শনী ও মেলা '৭৬ (খ) তমলুক প্রদর্শনী ও মেলা '৭৭।

৩১. মহাভারত।

৩২. রচনাবলী—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৩৩ ভূমি রাজস্ব ও জরীপ—টোডরমল (১৩৮২)।

৩৪ বাঙ্গালার রাগসঙ্গীত চর্চা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৫. বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, মেদিনীপুর—আজাহারউদ্দিন খান সম্পাদিত, ১৯৭৩।

৩৬. সঙ্গীতসার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ১৮৬৯।

৩৭. বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৩৮ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন, ১৯৭৮ স্মারকগ্রন্থ।

ইংরাজী বই ও পুস্তিকা

1. The History of Bengal, Vol. I, Hindu Period—Edited by Dr R. C. Majumdar, Published by the University of Dacca (1963).

2. The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period—Edited by Sir Jadunath Sarkar, the University of Dacca (1972).
3. History of Ancient Bengal—Dr. R. C. Majumder, G. Bharadwaj & Co. (1974).
4. History of the Freedom Movement in India, Vol I, Vol.II & Vol.III—Dr. R. C. Majumdar Firma KLM Pvt. Ltd. (1977).
5. On Yuan Chwang's Travels in India—T. Watters, London (1905).
6. A Record of the Budhistic Kingdoms—J. A. Legge, Oxford (1886)
7. The Life of Hiuen-Tsiang—S. Beal, Academica Asiatica, India (1973).
8. Political History of India, vol II—J. Filliozat (Tr. Phillip Spratt). Ind. Ed. (1957).
9. Description of Hindostan—W. Hamilton (1820).
10. Linguistic Survey of India (Introduction)—Dr G A. Grierson (1897).
11. Early Sculpture of Bengal—S. K. Saraswati, Sambodhi (1962).
12. History of Bengali Literature—Dr. Sukumar Sen (1971).
13. The Tribes and Castes in Bengal, Vol. I & Vol. II—H. Risley.
14 Descriptive Ethnology of Bengal—Edward T. Dalton (1872).
15. Fifth Report etc., Vol. II—W. K Firminger
16. Notes on the History of Midnapore—J. C. Price
17. A Statistical Account of Bengal, Vol. III—W. W. Hunter, D. K. Publishing House (1973).
18. Memoranda of Midnapore—H V. Bayley (1852).
19. Report on the District of Midnapore including Hijli, Henry Ricketts, I. C. S. (1858).
20. Report on the Census of Bengal, 1872—H Baverly.
21. The Revision of the Boundary Commissioner's List—Rowland N. L. Chanda (1907).
22. Report on the Survey and Settlement Operations (Midnapore)—A. K. Jameson (1918).
23. Bengal District Gazetteer, Midnapore—L. S. S. O'Malley (1911).

24. District Hand Books (1951). Midnapore—Ed. A. Mitra (I. C. S.).
25. District Census Hand Book (1961), Midnapore—Ed. B. Roy, W. B. C. S
26. Midnapore, Progress & Problems (Monograph)—D. M., Midnapore (1972).
27. Census 1951. The Tribes and Castes of West Bengal—Edited. A. Mitra, I.C S
28 Census of India 1971, Series 22, West Bengal, Part-II.A.
29. District Statistical Hand Book, Midnapore 1971 and 1972 combined.
30. Obscure Religious Cults—Dr. Sashi Bhusan Dasgupta. Firma KLM (Pvt) Ltd. (Repr 1976).
31. Dharma Worship in Bengal—Dr Asutosh Bhattacharya.
32 Sun Worship Amongst the Aboriginal Tribes of Eastern India—T C Das
33. The Artisan Castes of Bengal and their Crafts—S. K. Roy.
34. The Lodhas of West Bengal—Dr. P. K Bhowmick.
35. Social Profiles of the Mahalis—S Sengupta, Firma KLM (P) Ltd (1970)
36. The Portrait of Mahali Economy in Midnapore—S. Sengupta.
37. The Castes System in Bengal —S. N. Sengupta
38. The Naxalite Movement—Sankar Ghose, Firma KLM Pvt Ltd.
39. Memorandum (supplementary) Before States Reorganisation Commission, Government of West Bengal.
40. Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal—J Cumming.
41. Political History of Midnapore, Vol. I, Vol. II & Vol. III—N. Das.
42. August Revolution Two years National Government, Midnapore, Part I, Satish Chandra Samanta & others (1946).

43. West Bengal Forests Centinary Commemoration Volume —Forest Directorate (1964).

44. History of Bagree-Rajya (Garbeta)—Prof. Gouripada Chatterjee (1975)

45. Report of the Fact Finding Survey on Midnapore District—Department of Economic Studies, United Bank of India (1971)

46. An Outline Development Plan for Haldia Industrial Complex—Development & Planning (T & CP) Deptt. 1975.

47 Seminar on the Prospect and Possibilities of Small Scale Chemical Industries at Haldia (1977)

48. Integrated Tribal Development Plan for Four I.T.D P. Areas in Midnapore District—Agricultural Information Centre, Bidhan Chandra Krishi Vishwa Vidyalaya (Monograph, 1976).

49. Catalogue and Hand Book of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Part-II

50. Catalogue Raisonne of the Prehistoric Antiquities in the Indian Museum.

51 Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875.

52 Journal of the Asiatic Society, Vol. LXV Part-I. No.2.

53 The Archaeological Treasures of Tamralipta— P. C. Dasgupta (1975)

54. Acts and Rules :

(a) Private Forest Act, 1945 (b) West Bengal Forest Act, 1948 (c) West Bengal Estate Acquisition Act, 1953 (d) Regulation XII of 1817 (e) West Bengal Land Reforms Act, 1955 (d) Scheduled Castes and Tribes Orders (Amendment) Act, 1976

55. Development Plan for Digha (Monograph)—Town Planning Stream, C. M. P. O (1976)

56. A Study of Lodha (Denotified) Community in Midnapore (A Project Report)—A. K. Sen (Monograph, 1972).

57. Reminiscences of Michael M. S Dutta—Gour Das Bysack.

58. My Brother's Face—Dhanagopal Mukherjee

নির্দেশিকা

ঘ

চ

ছ

জ